

এই গ্রন্থের লেখক ডঃ মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ-র জন্ম—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে, 'বাংলাদেশ'-এর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায়। পিতা রমণীকান্ত গুহ। মাতা ইন্দুবালা গুহ। আদি-নিবাস ঐ দেশেরই টাঙ্গাইলে। বর্তমান নিবাস বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্গত বেলগাছিয়ায়।

শিক্ষা প্রথমে রাজশাহী কলেজে, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে। রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এস্-সি. পাশ করেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিষয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এস্-সি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম মেমোরিঅ্যাল পুরস্কার, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিফিথ মেমোরিঅ্যাল পুরস্কার এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, ফিল্. ডিগ্রী পান। তাঁর গবেষণার বিষয় দেশ-বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে, এবং পাঠ্য-পুস্তকে ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'Wealth of India' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

প্রথম প্রকাশিত রচনা 'সবুজ পাতা', অধুনালুপ্ত 'স্বদেশ' পত্রিকার বড়দিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।

৫২১

৫২৪

৭৮৮

প্রকাশক :
শ্রীবিভূতি ভূষণ কুণ্ডু
বি. বি. কুণ্ডু অ্যাণ্ড সন্স
৬২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

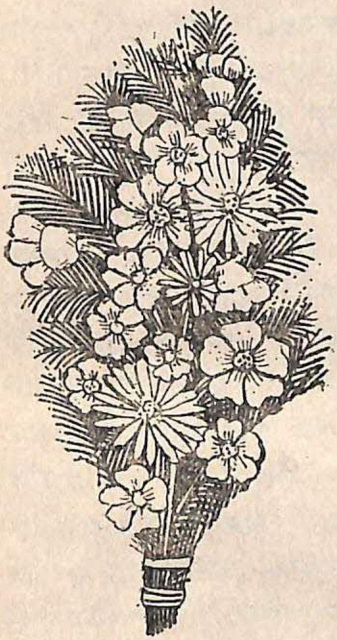
প্রথম সংস্করণ—মে, ১৯৮৮

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

মুদ্রণ (প্রচ্ছদ এবং রঙিন চিত্রসমূহ) :
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :
শ্রীতুলসী চরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩ ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬



উৎসর্গ

শ্রীশৈবাল কুমার গুহ
স্নেহাস্পদেষু

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ, এম্. এস্-সি., ডি. ফিল্.
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ
কলিকাতা

বি. বি. কুণ্ডু অ্যাণ্ড সন্স
৬২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

১। আকাশ ও পৃথিবী (রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত)

২। বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা (ইউনেস্কো-পুরস্কার-প্রাপ্ত)

৩। চল যাই চাঁদের দেশে (শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত)

৪। জ্ঞানের আলো জ্বাললো যারা

৫। পেট্রোলিয়ম

৬। জড় ও শক্তি

৭। বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী

৮। জীবের ক্রমবিকাশ

৯। বরণীয় বিজ্ঞানী, স্মরণীয় আবিষ্কার

১০। দেখে শেখ

১১। সাবধান, জীবাণুরা নিকটেই আছে !

১২। জাতীয় ফুল-ফল, পশু-পাখি ও খাদ্য-শস্য

বন্ধ

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

১৯৭২ সালের ৫ই জুনের প্রস্তাবনা অনুসারে বিশ্বের বেশ কিছু বিদগ্ধজন ১৪ই জুন স্টকহল্‌মে বলেছিলেন, পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনাকে মানবজগতের কল্যাণকামী জনগণের কাছে নিয়ে আসতে। ভাবনাটা অবশ্য বিশ্বপরিবেশের ক্রমবর্ধমান আতঙ্ক-জনক পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। এই দিনটিকে, অর্থাৎ ৫ই জুন, 'বিশ্ব-পরিবেশ দিবস' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সারা পৃথিবী জুড়ে শিল্পের বন্যা বইছে, বিষুব রেখার দু'পাশের অপূর্ব ভেজা চির-হরিত বা ক্রান্তীয় বনভূমির বছরে ১ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার করে ধ্বংসপ্রাপ্তিই এই বিশেষ চেতনার কারণ। প্রাকৃতিক পরিবেশকে যতই মানুষ নষ্ট করছে, ততই নিজের বিপদ ডেকে আনছে। এ ব্যাপারে একটি প্রধান ভূমিকা অবশ্য রয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের বৃক্ষকুলের। গাছ প্রধানতঃ মাটি এবং আশে-পাশের বাতাসের তাপমাত্রাকে সীমিত রাখে, বাতাসের আর্দ্রতা বাড়ায়, অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, বৃষ্টিপাত বাড়ায়, মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করে, বাতাসের ভাসমান ধূলিকণা ছেঁকে ফেলে, বাতাসের সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইডদের 'Detoxication' প্রক্রিয়ায় শুষে নেয়, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শুষে নিয়ে তা থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে এবং বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ায়, এবং জীবাণুনাশক বা Phytocidal ধর্মের সাহায্যে বাতাসকে জীবাণুমুক্ত করে। আবার, শব্দদূষণ এড়াতে, সমুদ্রের ভাঙন এড়াতে কিংবা বন্যা প্রতিরোধ করতে, সারি দেওয়া বৃক্ষের প্রয়োজন হয়। কাজেই অরণ্য এবং আরণ্যকের সংরক্ষণই প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে প্রধান প্রয়োজন।

অবশ্য অনেকেই হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে, পৃথিবীর ইতিহাস তো বিবর্তনেরই ইতিহাস। যুগে যুগে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ বা প্রাণী এসেছে, আবার পরিবেশের পরিবর্তনে সে টিকে থাকতে পারে নি। সাড়ে একত্রিশ কোটি বছর আগে, কার্বনি-ফেরাস (carboniferous) যুগে, যখন বাতাস কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভরপুর ছিল, তখন গ্লসপ্‌টেরিস্ (Glossopteris), গঙ্গামপ্‌টেরিস্ (Gangamopteris)-এর বন অনেক বেড়ে গেলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসে তাদের গণ্ডোয়ানা (Gondwana) শিলাস্তরের কয়লায় পরিণত করেছে। ডাইনোসরদের মেসোজয়িক যুগের রাজত্ব হঠাৎ শেষ হয়েছে, অন্য প্রাণীরা তার স্থান নিয়েছে। তবে কেন পরিবেশ নিয়ে দুর্ভাবনা! Survival of the fittest তো বিশ্বের নিয়ম!

ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেল, মানুষের মতো বুদ্ধিজীবী প্রাণীর সৃষ্টি হওয়াতে। বিধাতার প্রাকৃতিক নিয়মের বাঁধ ভেঙ্গে সে গড়ল শিল্প-বিপ্লব, কৃষি-বিপ্লব। এর ফলে আবহাওয়া হ'ল কলুষিত, প্রাকৃতিক পরিবেশ হারাল তার ভারসাম্য। এই সন্ধিক্ষণে এসে মানুষ বুদ্ধি দিয়ে আবার আপন পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের কথা ভেবেছে। যে বন কেটে বসত বানিয়েছিল, সেই বসতের ফাঁকে ফাঁকে আবার সমাজ ভিত্তিক বন সৃজন করতে শুরু করেছে। যথাসম্ভব প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকরণ করা শুরু করেছে। আরণ্যকদেরও সংরক্ষণের দ্বারা নিজেদের সুস্থভাবে বাঁচার পরিবেশকে ফিরিয়ে আনছে। সবাই একথাও ভাবছে যে,—

"A tree is known by the fruit it bears,
A forest is known by the wild life it rears."

১৯৫২ সালের জাতীয় বননীতি অনুসারে, পাহাড়ী অঞ্চলে দুই-তৃতীয়াংশ এবং সমতল ভূমিতে এক-তৃতীয়াংশ জমি বনাকীর্ণ করার কথা। কার্যতঃ ভারতবর্ষে, ১৯৮০-৮১ সালের হিসেব অনুযায়ী, শতকরা ২২·৩ ভাগ জঙ্গলের বিস্তৃতির কথা জানা যায়। আবার বিমানের সাহায্যে মানচিত্র তৈরি ক'রে, অনেকের ধারণা হয়েছে যে, এদেশে শতকরা ১২ থেকে ১৪ ভাগ মাত্র অরণ্যভূমি রয়েছে। তবে এই পদ্ধতির অনেকটাই নির্ভর করে সম্যক ব্যবহারিক জ্ঞানের ওপর। তাই এখনও বিমান থেকে তোলা ছবি দেখে অরণ্যভূমি নির্ধারণ করার ব্যাপারে অনেক ভ্রান্তিও থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সবদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে ৭৪ ৭৪৩ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি থেকে বছরে ০·১৫ মিলিয়ন হেক্টর করে বন বিভিন্ন সেচ, বিদ্যুৎ, রাস্তা ইত্যাদি প্রকল্পের দরুণ ক্রমশঃ কমে এসেছে। তবে ইদানীং, ১৯৮০ সালে, বন সংরক্ষণ আইন পাশ ক'রে, এই ক্ষয়িষ্ণু বনভূমিকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। কেরালার 'নীরব উপত্যকা' (Silent Valley) প্রকল্পকে সংকুচিত করা এরই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আসামের মানস নদীর বাঁধের ব্যাপারেও অরণ্যের ক্ষতির কথা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এটি একটি শুভ লক্ষণ।

বনভূমি থেকে বহু নিত্য ব্যবহার্য বস্তু, যেমন—কাঠ, রেলের স্লিপার, ভেষজ, মধু, মাছ এবং কাগজ-কল, সেলুলোজ-শিল্প, বোর্ড-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প প্রভৃতির কাঁচামাল, সবই আহরণ করার রেওয়াজ আছে। তাই ভারতবর্ষের শতকরা তিন ভাগ রাজস্ব আসে বন থেকে। এই বনজ সম্পদ যতটা আহরণ করা হবে, ততটাই আবার সৃজন করা দরকার। ১৯৫১ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সারা ভারতে ৩·১৮ মিলিয়ন হেক্টর বন সৃজন করা হয়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ক্রমাগত এসে পড়ছে এই বন-সম্পদের ওপরে। মাথা-পিছু বিশ্বের বন-সম্পদ হ'ল ১·২৫ হেক্টর, আর ভারতের ছিল ০·১৪

হেক্টর, যেটা ১৯৮০ সালে নেমে এসেছে মাত্র ০·১১ হেক্টারে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও খারাপ, এখানে মাথা-পিছু বনভূমির পরিমাণ মাত্র ০·০৩ হেক্টার। এতো কম বন-সম্পদ নিয়ে প্রয়োজনীয় কাঠের এবং জ্বালানির চাহিদা মেটানো অসম্ভব। কাঠের চাহিদা যেখানে বছরে ২৪ মিলিয়ন কিউবিক মিটার, সেখানে পাওয়া যায় মাত্র ১০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। তাই বর্তমানে বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় সমাজভিত্তিক বন-সৃজনের প্রকল্প এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তার ধারে, রেল-লাইনের ধারে, নদী-নালা বা খালের পাড়ে, পুকুরের পাড়ে, কৃষির অনুপযোগী পোড়ো জমিতে, গাছ লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছে। গুজরাট প্রথম এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়, তারপরই পশ্চিমবঙ্গ।

ভারতবর্ষে বিশ্বের শতকরা দু'ভাগ মাত্র বনভূমি রয়েছে, কিন্তু প্রাণীকুলের পরিমাণ সে তুলনায় অনেক বেশী। প্রাণীকুলের শতকরা পাঁচভাগ রয়েছে এখানকার আরণ্যক হিসেবে। ভারতের ৩৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী এবং ১২০০ প্রজাতির পাখির মধ্যে ৬৬ রকম স্তন্যপায়ী এবং ৩৮ রকম পাখি আজ বিলুপ্তির পথে। তাই এদের সংরক্ষণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৯৭২ সালে এজন্য বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান (National Park), মৃগদাব, ব্যাঘ্র-প্রকল্প এবং পক্ষিনিবাস।

বন্য-প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শুধু একটি বিশেষ প্রজাতির প্রাণীকে বাঁচানোর জন্যই নয়, ভারসাম্যের গোটা প্রাসাদকে অটুট রাখতেই এর প্রয়োজন। যেমন ধরা যাক, ব্যাঘ্র-প্রকল্প চালু করতে গিয়ে দেখা গেল, সুন্দরবনে বাঘের খাদ্য হ'ল হরিণ, শূয়োর, বানর, মাছ, কাঁকড়া, জলজ গোসাপ, এমনকি সামুদ্রিক কচ্ছপ পর্যন্ত। সুতরাং, বাঘকে বাঁচাতে হলে, এই খাদ্য-তালিকাকেও ঠিক রাখতে হবে। হরিণ, শূয়োরের প্রধান খাদ্য হ'ল বাদাবনের গাছপাতা ও শিকড়। জলজ গোসাপের খাবার হ'ল মাছ, সাপ, পাখির ডিম, কচ্ছপের ডিম ইত্যাদি। আর মাছের খাবার হ'ল পচাপাতার প্রোটিন। কাজেই বাঘের প্রয়োজন থেকেই চলে আসতে হচ্ছে পাখির বা সামুদ্রিক কচ্ছপের সংরক্ষণে, এবং শেষপর্যন্ত গাছপাতার জন্য বাদাবনের সংরক্ষণের দিকেও মনোযোগ দিতে হচ্ছে। আবার মাছের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রাক্ষুসে মাছ (Cat-fish)-এর সংখ্যাও কম রাখা দরকার, যাতে মুলেট (Mullet)-জাতীয় পার্শে, ভাঙন ইত্যাদি খাওয়ার যোগ্য মাছের সংখ্যা ঠিক থাকে। তাই কুমীরের চাষ করে রাক্ষুসে মাছের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, নামে ব্যাঘ্র-প্রকল্প হলেও সমস্ত খাদ্য-শৃঙ্খলকেই রক্ষা করা প্রয়োজন হয়। আবার এর ফলেই মাছ এবং মধু আজকাল অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা

১৯৭৩	১৯৭৬	১৯৭৯	১৯৮৩	মন্তব্য
১৩৫	১৮১	২০৫	২৬৪	বাঘের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গে আজ সুন্দরবনে একটি জাতীয় উদ্যান, দু'টি ব্যাঘ্র-প্রকল্প এবং পনেরোটি অভয়ারণ্য করা হয়েছে। সারা দেশে এ ধরণের প্রায় পঁচিশটি জাতীয় উদ্যান করা হয়েছে, সেখানে সংরক্ষণ, গবেষণা এবং মানুষের কল্যাণমুখী উপভোগ একই সঙ্গে চলতে পারবে। তবে আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, বনভূমির বাইরেও পাখি, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদির ব্যাপক নিধন প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলছে। যেমন, ভূপালের MIC-গ্যাস দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে যে, এর মূলে আছে কীটনাশক ওষুধের প্রয়োজনীয়তা। এখন কীটনাশক ওষুধের প্রয়োজন বেড়েছে পাখি এবং ব্যাঙের ব্যাপক নিধনের ফলে। তেমনি সাপের ব্যাপক নিধনের ফলে ইঁদুরের সংখ্যা বেড়েছে, এবং তার ফলে শতকরা ১৫ ভাগ শস্যের ক্ষতি হচ্ছে। ব্যাপারটা তাই ভারসাম্যের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ফেলেই বিচার করা দরকার। এই জন্যই ১৯৭২ সালে বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হয়েছে, যাতে বনের বাইরেও এই জাতীয় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময়ই খানিকটা কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে ভারসাম্য হারাতে পারি। তাই দু'একটি বিশেষ ব্যাপার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। যেমন, বাতাসের অক্সিজেনের উৎপত্তি হয় প্রধানতঃ জলজ উদ্ভিদ্ থেকে। শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ মাত্র উৎপন্ন হয় স্থলভাগের গাছপালা থেকে। তেমনি শহরের বায়ুমণ্ডলের চাইতে গ্রামাঞ্চলের বায়ুমণ্ডল কম দূষিত নয়। কারণ, ব্যাপক অজৈব সারের ব্যাবহারের ফলে গ্রামের বাতাস এখন নাইট্রোজেনের অক্সাইডে ভরপুর হয়ে থাকে। এজন্য ইদানীং জীবাণু-সারের ব্যবহারের কথা বেশী ক'রে বলা হচ্ছে। আবার শিল্প-বিপ্লবের ফলশ্রুতি স্বরূপ অত্যধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপত্তির দরুণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ভীতি (Green House Effect) বড়ই এক তরফা দৃষ্টি নিয়ে দেখা দিয়েছে, এবং সেজন্য অযথা আমাদের শঙ্কিত ক'রে তুলেছে। কিন্তু এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি সবুজ বিপ্লব আনার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। কারণ, গাছপালার পক্ষে অক্সিজেনের তুলনায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের চাহিদা প্রায় ১৫ গুণ বেশী।

অতএব সর্বপ্রধান প্রয়োজন হচ্ছে, দৃষ্টি স্বচ্ছ রেখে, সামাজিক পরিবেশকে যথা সম্ভব দূষণমুক্ত ক'রে, সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রকৃতিদেবী যে শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সবুজ-বিপ্লবের ভারসাম্য ঘটিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের পথ দেখিয়েছেন, স্থলভাগের দূষণকে জলভাগের সংযোজন দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে যাচ্ছেন, তাকেই এই দরিদ্র ভারতবর্ষে যথা সম্ভব কল্যাণকামী প্রথায় সহায়তা করে যাওয়াই আমাদের প্রধান কর্তব্য। একথা সব সময়ই মনে রাখা দরকার যে, দূষণ দারিদ্র্যের নয়, বিলাসিতারই অবদান। স্টকহল্ম সম্মেলনের ভাষায়,—

"In poverty he is threatened by malnutrition and disease, in weakness by war in richness by the pollution, brought obout by his own prosperity."
অর্থাৎ, দারিদ্র্যে মানুষের শঙ্কার কারণ হ'ল অপুষ্টি এবং ব্যাধি, দুর্বলতায় যুদ্ধ, আর প্রাচুর্যে দূষণ, যা ঘটছে মানুষের বৈষয়িক উন্নতির জন্যই।

শ্রীপ্রণবেশ সান্যাল
অধিকর্তা, ব্যাঘ্র-প্রকল্প,
সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ

* * *

১৯৭২ সালের জুন মাসে স্টকহল্মে অনুষ্ঠিত 'ইউনাইটেড নেশন্স কন্ফারেন্স অন দ্য হিউম্যান এন্ভায়রনমেণ্ট'-এ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়েছে—

"পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান মানুষ। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণ এবং তার উন্নয়নের ব্যাপারে যাতে উদ্বুদ্ধ হয় তার চেষ্টা করা দরকার। দরকার উপযুক্ত পথনির্দেশ। একাজ আন্তর্জাতিক পর্যায়েই করতে হবে।"

ভূমিকা

পৃথিবীর সব দেশেই এখন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হলে মানুষের অস্তিত্বই একদিন বিপন্ন হয়ে পড়বে। বর্তমান বিশ্বে তাই এটি একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। কিন্তু শুধু আলোচনা করলেই তো হবে না। পরিবেশ সংরক্ষণ করার ব্যাপারে আমাদের আরও বেশী ক'রে সচেতন হতে হবে, এবং আরও উদ্যোগী হতে হবে, যাতে এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা যায়।

এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়গুলি প্রধানতঃ দু'টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে আছে—**প্রাকৃতিক পরিবেশ** সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা, আর দ্বিতীয় পর্বে আছে—**পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা**। প্রকৃতির ভারসাম্য কীভাবে বিনষ্ট হচ্ছে, এবং কীভাবে তার প্রতিকার করা সম্ভব, তারও পথনির্দেশ করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

আমার বহু বছরের চিন্তা-ভাবনার ফসল এই গ্রন্থটি। এইরকম একটি পুস্তক প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগেই। এই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু লেখার কাজও তখন করেছিলাম। কিন্তু নানা কারণে বইটি প্রকাশ করার কাজে বিলম্ব ঘটেছে। বি. বি. কুণ্ডু অ্যাণ্ড সন্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীবিভূতি ভূষণ কুণ্ডু মহাশয় বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় এতদিনে আমার পক্ষে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বইটির মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন আমার বন্ধুপুত্র স্নেহভাজন শ্রীপ্রণবেশ সান্যাল। আর "জল" শীর্ষক রচনাটি লিখে দিয়েছেন আমার অনুজ শ্রীমুরারি প্রসাদ গুহ। দু'টি রঙিন ছবি এঁকে দিয়েছেন স্নেহভাজন শিল্পী শ্রীশিবেন গুহ। আর সজনেখালির পক্ষি-নিবাসের আলোকচিত্রটি পেয়েছি শ্রীকল্যাণ দে মহাশয়ের সৌজন্যে। এই সুযোগে এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বইয়ের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের, অথবা প্রবন্ধের অংশ বিশেষের, উদ্ধৃতি দিয়েছি। এজন্য ঐসব প্রবন্ধের লেখকদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

বইটি যদি এদেশের পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগে, এবং পরিবেশ সংরক্ষণ করার ব্যাপারে তারা যদি কিছুটা উদ্বুদ্ধ হন, এবং এ বিষয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাহলে বুঝবো যে, আমার এই শ্রম সার্থক হয়েছে।

ইতি—

রথযাত্রা, রবিবার, ১৩ আষাঢ়, ১৩৯৪

[ইং ২৮ জুন, ১৯৮৭]

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ

দ্বিতীয় পর্ব ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

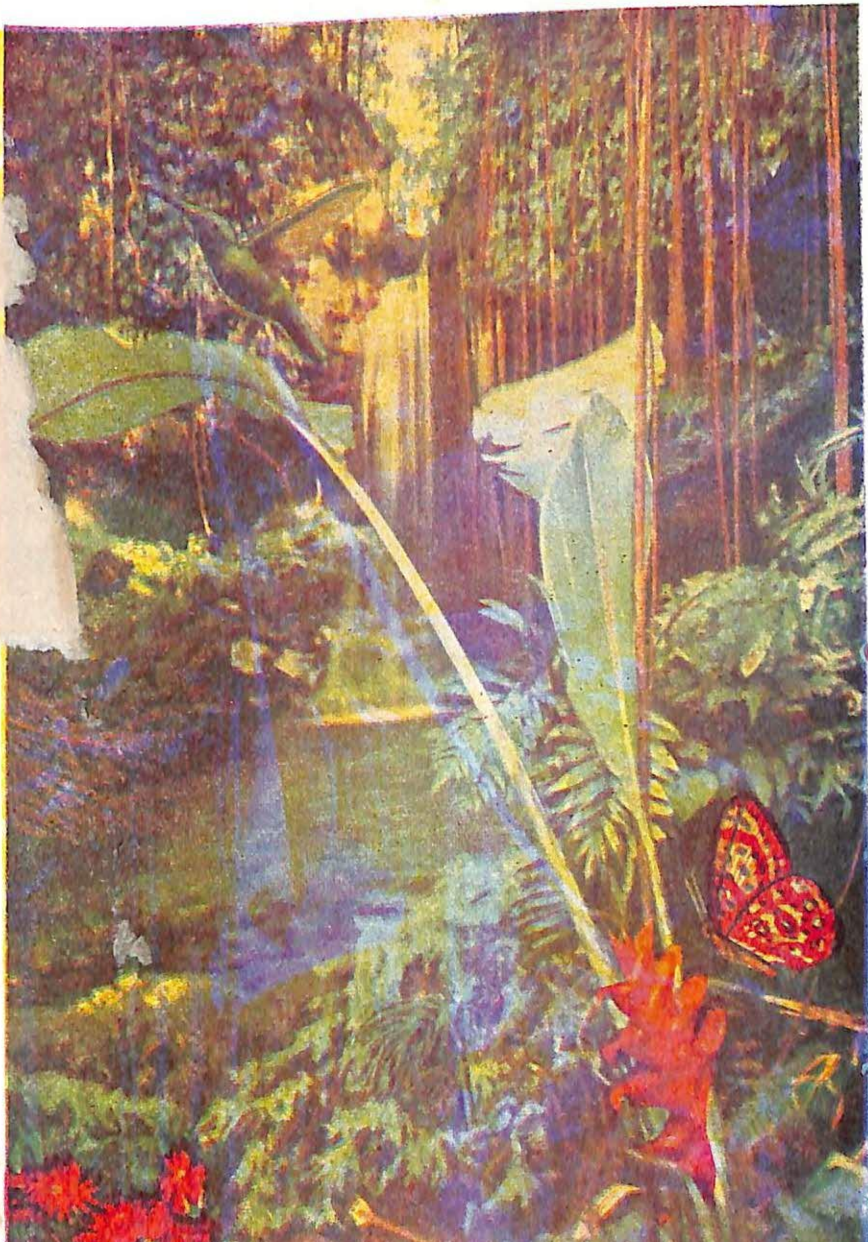
"আমরা সবাই বলতে পারি—বিশ্বমণ্ডলের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে আমাদের গ্রহই একমাত্র স্থান যেখানে প্রাণ আছে। মহাকাশে আমরা সম্পূর্ণ একা। এবং জীবনের এই চলমান অস্তিত্ব এখন আমাদের হাতেই ন্যস্ত।"

—ডেভিড অ্যাটেনবরো

* * * *

"পৃথিবীর বুকে কতরকম প্রজাতি বিরাজ করছে, কতরকম প্রজাতি অস্তিত্বের প্রান্তসীমায়, এবং কতরকম প্রজাতি বিগত কয়েক বছরে অবলুপ্ত হয়েছে, সেসব এখনি অনুসন্ধান ক'রে দেখা দরকার। এরপর গড়ে তুলতে হবে আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা। এমন ধরণের ব্যবস্থা, যা তাবৎ প্রজাতির সংরক্ষণ ত্বরান্বিত করবে। মানুষের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যেই এটা দরকার।"

—টিনবারগেন



প্রকৃতির লীলা-নিকেতন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

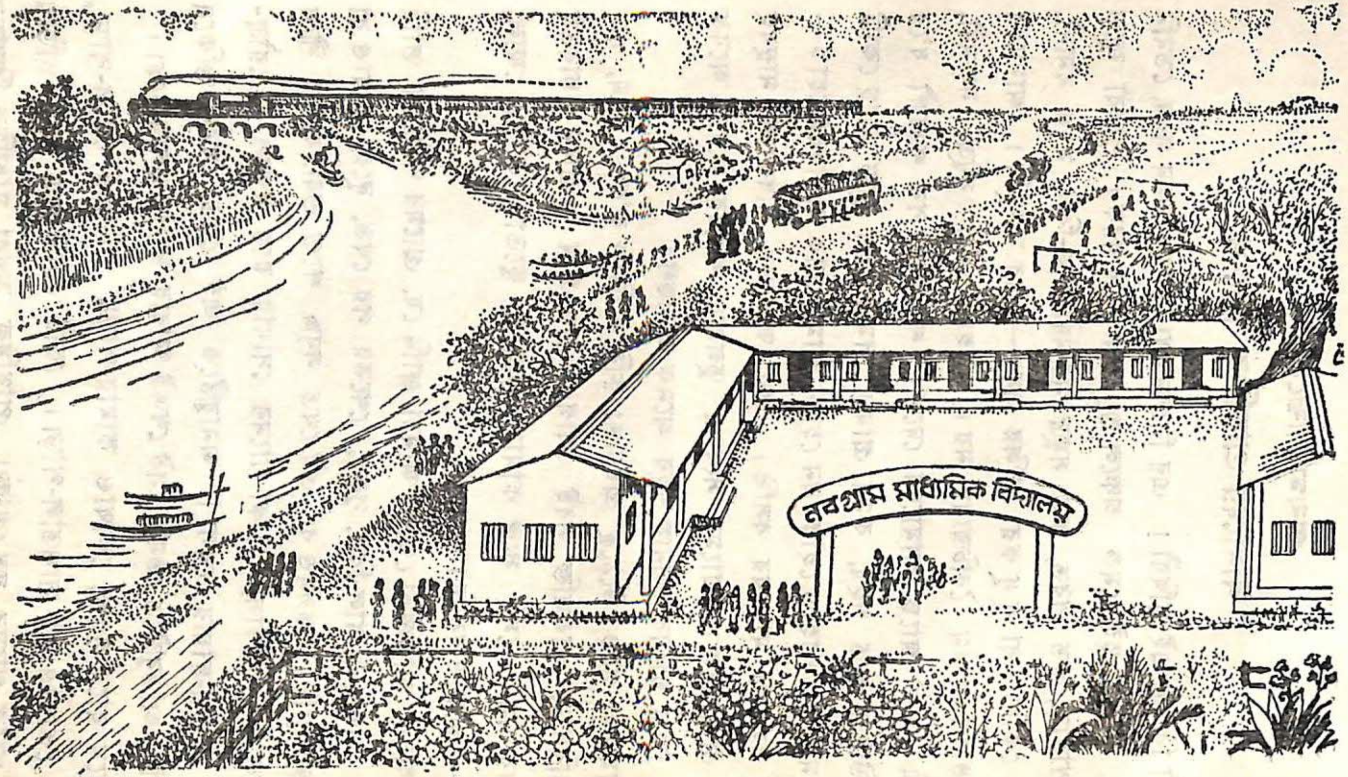
আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ

কী বিচিত্র এই পৃথিবী! এর নিরক্ষরেখা অঞ্চলে যেমন গরম, তেমনি বর্ষা। আবার দুই মেরু অঞ্চলে শুধু বরফ আর বরফ। পৃথিবী জুড়ে কত পাহাড়, কত পর্বত, কত সমুদ্র নদ-নদী খাল-বিল, সবুজ বনানী, আবার কোথাও বা ধূ ধূ করা বালির সমুদ্র—দুস্তর মরুভূমি। আমাদের দেশ ভারতও কম বৈচিত্র্যময় নয়। পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নদ-নদী, মরুভূমি—সবই আছে আমাদের দেশে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে গড়ে উঠেছে কত শহর, বন্দর, গ্রাম! সমস্ত দেশ জুড়ে আছে কোটি কোটি মানুষ। পাহাড় হোক, বন হোক, গ্রামই হোক বা শহরই হোক—সর্বত্রই কমবেশী মানুষের বসতি। তবে ভারতের অধিকাংশ মানুষই থাকে গ্রামাঞ্চলে। গ্রামের সংখ্যার তুলনায় শহরের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু গ্রামের তুলনায় শহর অনেক জনবহুল।

গ্রামাঞ্চল গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ কৃষিকে ভিত্তি ক'রে। ধান, গম, পাট, রবিশস্য, শাকসব্জি সবই যোগান দেয় গ্রাম। গ্রামে স্বভাবতই কৃষকদের বাস। সেই সঙ্গে কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতি, জোলা প্রভৃতি—এদেরও বসতি।

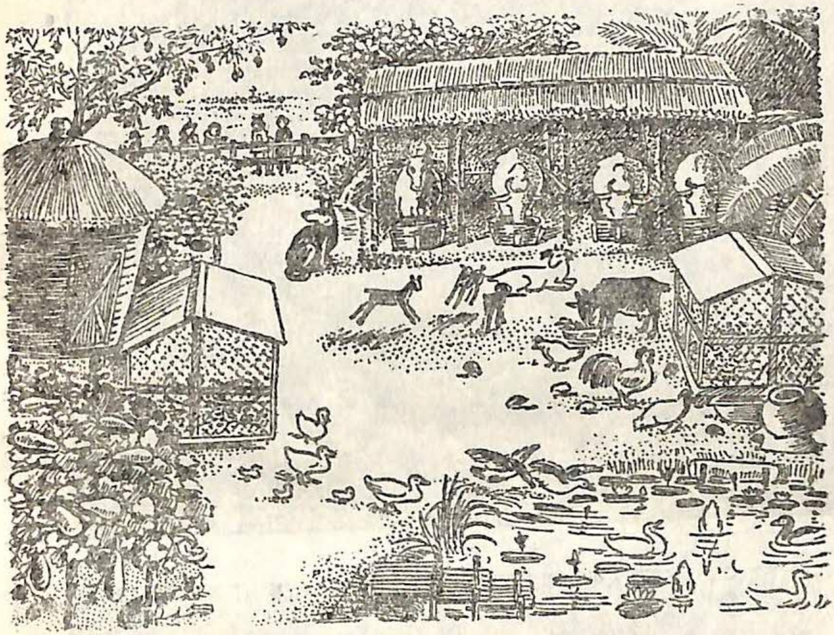
সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, গ্রামের পরিবেশ ভারি সুন্দর। নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, খেতের পর খেত, দূরে কোথাও বা পাহাড়ের সারি। কখনও বা এই খেত সবুজ শস্যে ভরা, ধানের শীষে ঢেউ-খেলানো বাতাস, পাকা ধানের সোনার রঙে কখনও বা রৌদ্র-মেঘের আলো-ছায়ার খেলা। অনাবৃষ্টিতে এই খেত যেমন শুকিয়ে ফুটি-ফাটা, অতিবৃষ্টিতে তেমনি সেই খেতই আবার জলের তলায় ঢাকা।

গ্রামে থাকে গৃহস্থ, কোথাও কামার-পাড়া, কোথাও জেলে-পাড়া, আবার কোথাও বা সাঁওতাল-পাড়া। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে গ্রামের যত লোক। প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়



চিত্র ১। গ্রামের পরিবেশ।

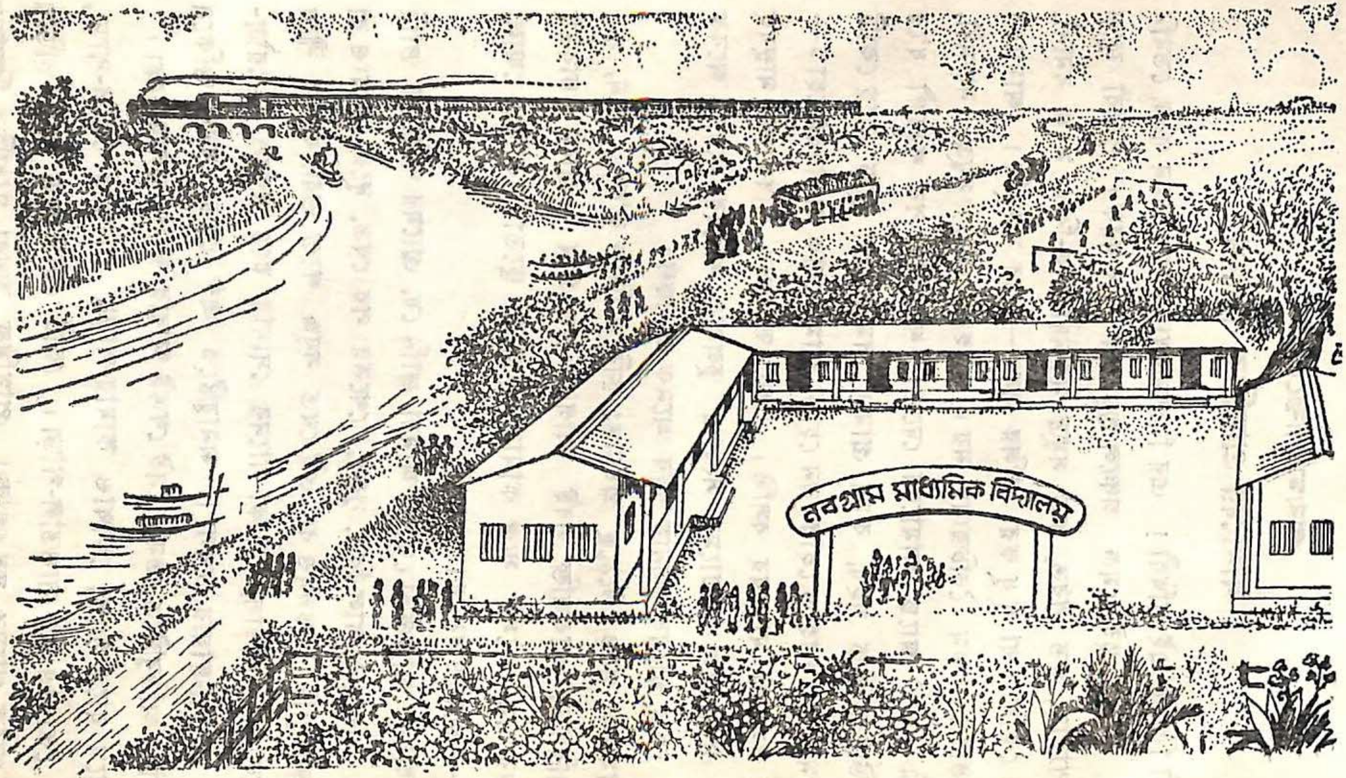
হয়তো আছে সেই গ্রামে, কিংবা অন্য কোনো গ্রামে। জলে-কাদায়-রোদ্দুরে কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে, কখনও বা মাঠ ভেঙে, ছেলেমেয়ের দল দিনের পর দিন বিদ্যালয়ে যায়। পায়ে চলা পথ—এঁকে বেঁকে চলে গেছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, হয়তো কারও গোয়াল কিংবা হাঁস-



চিত্র ২। পায়ে চলা পথ, এঁকে বেঁকে চলে গেছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে।

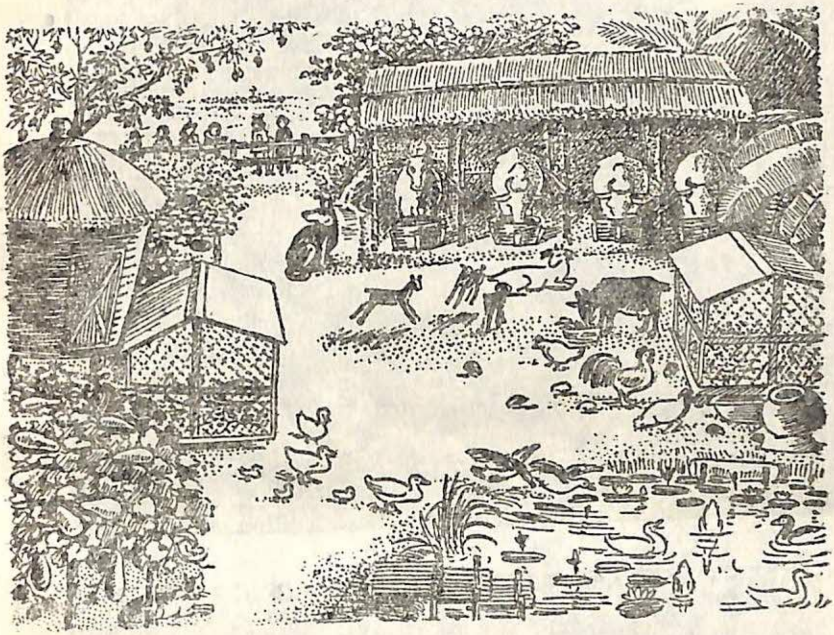
মুরগির ঘরের পাশ দিয়ে, কারও দীঘির ধার দিয়ে। পথের ধারে নজরে পড়ে কোথাও তরকারির বাগান, কোথাও ফলের বাগিচা, আবার কোথাও বা বাঁশ-বন। সবুজের মেলায় কত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটে, ফুলের বনে রঙ-বেরঙের কত প্রজাপতির আনাগোনা! এখানে ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গে পাখির কাকলীতে।

গ্রামের ঝোপ-ঝাড়ে বন-বাদাড়ে কতরকম গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, আর পশু-পাখি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। পুকুরের দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, পিচ্ছিল শেওলা, শামুক-ঝিনুক, গেঁড়ী-গুগলি, ব্যাঙ, মাছ, নানারকম পোকা-মাকড়, জল-ফড়িং প্রভৃতি। পুকুরের জলে এখানে-



চিত্র ১। গ্রামের পরিবেশ।

হয়তো আছে সেই গ্রামে, কিংবা অন্য কোনো গ্রামে। জলে-কাদায়-রোদ্দুরে কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে, কখনও বা মাঠ ভেঙে, ছেলেমেয়ের দল দিনের পর দিন বিদ্যালয়ে যায়। পায়ে চলা পথ—এঁকে বেঁকে চলে গেছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, হয়তো কারও গোয়াল কিংবা হাঁস-



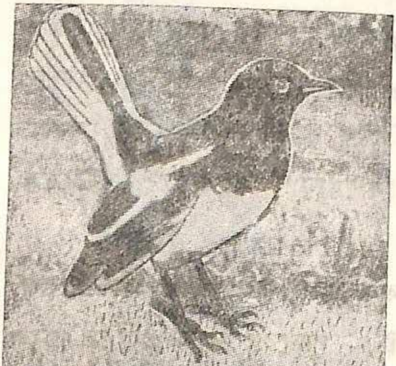
চিত্র ২। পায়ে চলা পথ, এঁকে বেঁকে চলে গেছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে।

মুরগির ঘরের পাশ দিয়ে, কারও দীঘির ধার দিয়ে। পথের ধারে নজরে পড়ে কোথাও তরকারির বাগান, কোথাও ফলের বাগিচা, আবার কোথাও বা বাঁশ-বন। সবুজের মেলায় কত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটে, ফুলের বনে রঙ-বেরঙের কত প্রজাপতির আনাগোনা! এখানে ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গে পাখির কাকলীতে।

গ্রামের ঝোপ-ঝাড়ে বন-বাদাড়ে কতরকম গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, আর পশু-পাখি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। পুকুরের দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, পিচ্ছিল শেওলা, শামুক-ঝিনুক, গেঁড়ী-গুগলি, ব্যাঙ, মাছ, নানারকম পোকা-মাকড়, জল-ফড়িং প্রভৃতি। পুকুরের জলে এখানে-



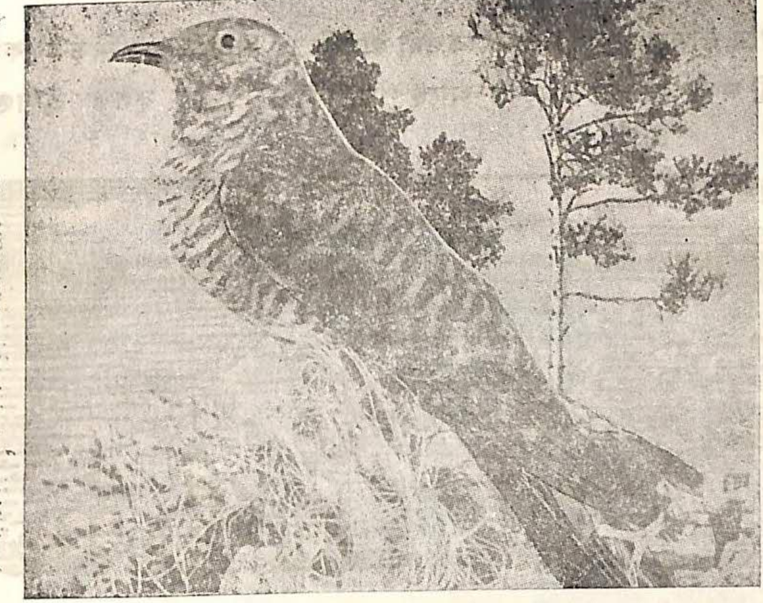
চিত্র ৩। একটি বক এক পায়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মাছের আশায়।



চিত্র ৪। দোয়েল।



চিত্র ৫। শ্যামা।



চিত্র ৬। ফাগুনে কোকিলের কুহু কুহু ডাক শুনে বোঝা যায়, বসন্ত এসে গেল।



চিত্র ৭। ময়না মানুষের মত কথা বলতে পারে।

ওখানে ভাসছে কচুরি-পানা, কলমী প্রভৃতি। গ্রামের এক নিভৃত কোণে ছোট্ট জলাশয়ে হয়তো ফুটে আছে পদ্ম কিংবা শালুক ফুল। হাঁসগুলি



চিত্র ৮। পদ্মফুল।

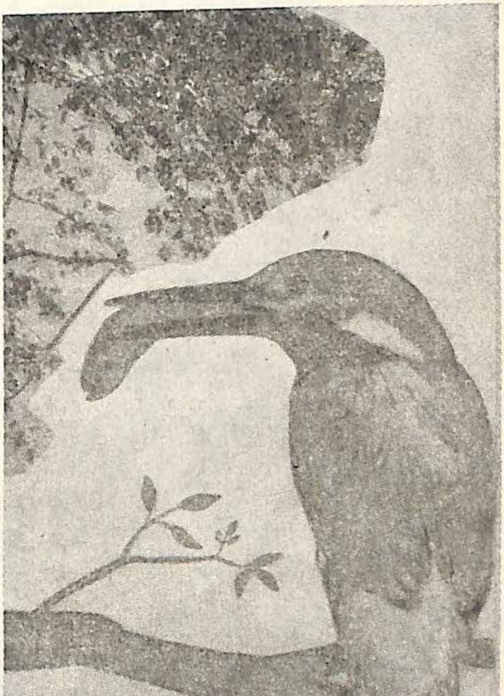


৯। শালুক।

ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও হয়তো একটি বক একপায়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মাছের আশায়। আবার কোথাও হয়তো মাছরাঙা

হঠাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অব্যর্থ নিশানা, ঠোঁটে ক'রে একটি মাছ নিয়ে উঠে এলো।

এখানে ভোর না হতেই কাক ডাকে কা-কা, চড়াই করে কিচির-মিচির, আর মোরগ ডাকে কক্কোর-কক্। দোয়েল, শ্যামা প্রভৃতি কতরকম পাখি গান গায় অবিশ্রান্ত। বুলবুল ফুল শাখাতে দোল দিয়ে যায়। এখানে নির্জন দুপুরে প্রাণ আকুল করা ঘুঘুর ডাক, নিশুতি রাতে প্যাঁচার ভয় ধরানো ভূত-ভূতুম আওয়াজ। আর ফাগুনে কোকিলের কুহু কুহু ডাক শুনে বোঝা যায় যে, বসন্ত এসে গেল। সন্ধ্যা না হতেই এখানে নেমে আসে গভীর অন্ধকার। শোনা যায় একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। ধূর্ত শিয়াল চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ে খাবারের সন্ধানে। এখানে ওখানে থেকে থেকে শোনা যায় শিয়ালের হুক্কা হুয়া ধ্বনি।



চিত্র ১০। কোথাও হয়তো মাছরাঙা হঠাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অব্যর্থ নিশানা, ঠোঁটে ক'রে একটি মাছ নিয়ে উঠে এলো।

নির্জন পাহাড়ের কোলে, উন্মুক্ত প্রান্তরে—উদার আকাশের নীচে, পাখির কাকলিতে মুখরিত ঘন সবুজ গাছ-গাছালির বিস্তীর্ণ সমাবেশে,

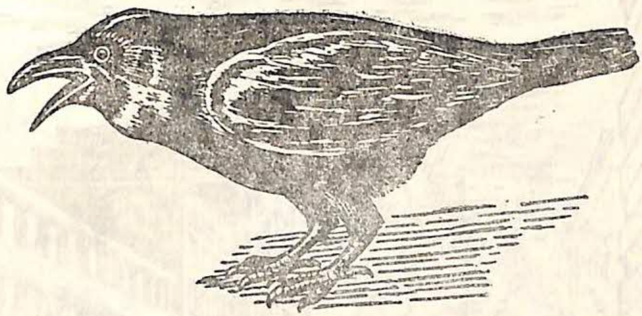
কুলু কুলু সুরে বয়ে যাওয়া নদীর ধারে, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে ছোট-বড় কত গ্রাম! এইরকম শান্ত-স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতে বড় ভাল লাগে। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে যায়। শহরের সমস্ত ক্লেদ, সমস্ত গ্লানি, যেন ধুয়ে-মুছে যায়। মন ভরে ওঠে অনাবিল আনন্দে।


চিত্র ১১। বুলবুল। চিত্র ১২। লক্ষ্মী পেঁচা।

এই রকম শান্ত সমাহিত গ্রাম্য জীবন হঠাৎ কখনও বা সচকিত হয়ে ওঠে—রেলগাড়ি বা বাসের আওয়াজে। গ্রামের ধার দিয়ে হয়তো চলে গেছে রেলের লাইন কিংবা বাসের রাস্তা।

শহরের পরিবেশ কিন্তু একেবারে অন্য রকম। এখানে যেমন ঘন বসতি, তেমনি উঁচু উঁচু অনেক বাড়ি। একই বাড়ির বিভিন্ন ফ্ল্যাটের জন-সমষ্টি নেহাৎ কম নয়। রাস্তায় যেমন গাড়ির ভিড়, তেমনি লোকের। কোথায় গ্রামের সেই উন্মুক্ত আকাশ,

সেই উদার সবুজ মাঠ, কোথায় বা সেই বিশুদ্ধ বাতাস! দিগন্তের যে বনরেখা দূর গ্রামের দিকচিহ্ন, কোথায় বা সেই সবুজের সীমানা!



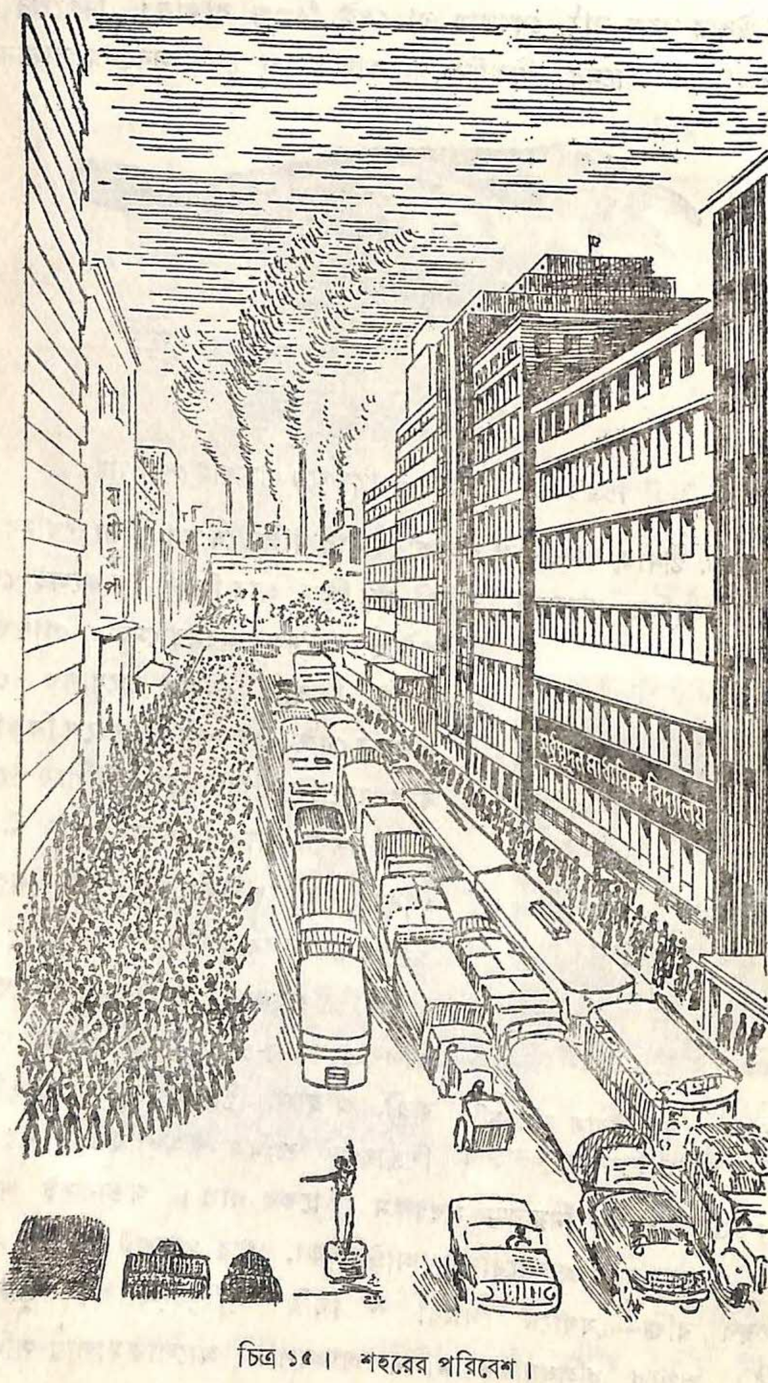
চিত্র ১৩। দাঁড়কাক—গ্রামে-গঞ্জে হামেশাই দেখা যায়।

রেলগাড়ি, স্টীমার, বাস, এবং কলকারখানার মলিন ধোঁয়া নিত্য এখানকার বাতাস কলুষিত করছে। সর্বত্রই শুধু ভিড় আর ভিড়। সকলেই যেন ছুটছে। দু'দণ্ড অবসর নেবার, প্রাণভরে একটু নিঃশ্বাস নেবার সুযোগও যেন এখানে নেই। এইরকম পরিবেশে কিছুদিন বাস করলেই প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। মানুষ তখন আশ্রয় খোঁজে গ্রামের নির্জন পরিবেশে। ছুটি-ছাটায় সেই অবসর হয়তো মেলে কিছুদিনের জন্য।



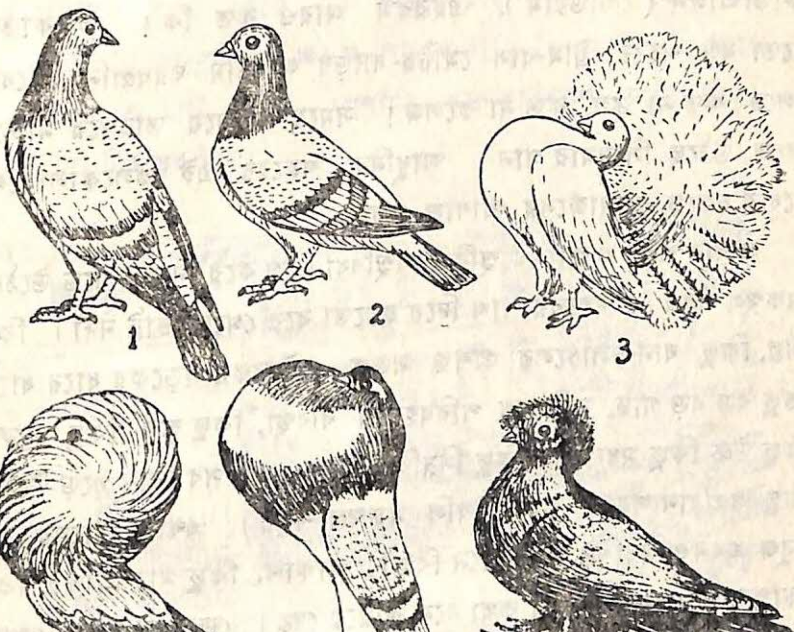
চিত্র ১৪। ধূর্ত শিয়াল চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে শিকারের সন্ধানে।

প্রতিটি শহরকে ঘিরে রয়েছে শিল্পাঞ্চল। মালপত্র আনা-নেয়ার জন্য রয়েছে রেল, লরী, জাহাজ, স্টীমার, নৌকা প্রভৃতি। শিল্পাঞ্চল শ্রমিক অধ্যুষিত। শহরের মধ্যে উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত সবরকম লোকের বাস। স্বভাবতই শহরে যেমন বিত্তবানের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, তার পাশেই হয়তো দীন-দরিদ্রের বস্তি—যেখানে নোংরা ও ঘিঞ্জি পরিবেশে জীর্ণ কুটীরের সারি। ওপরে ধূলিধূসরিত মলিন আকাশ। আলোকমালায় সজ্জিত



চিত্র ১৫। শহরের পরিবেশ।

এই শহরে কখন অমাবস্যা, আর কখনই বা পূর্ণিমা তা বোঝা খুবই মুস্কিল। কাক, চিল, শালিক, পায়রা আর চড়াই ছাড়া অন্য



চিত্র ১৩। নানারকম পোষা পায়রা—অনেকেই শখ করে পায়রা পোষেণ।

পাখিও বিশেষ দেখা যায় না। তবে আধুনিক জীবনযাত্রার সব রকম উপকরণই আছে এই শহরে। এখানে স্কুল-কলেজের ছড়াছড়ি,র য়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত, সিনেমা, থিয়েটার পার্ক-ময়দান, আধুনিক ক্রীড়াপ্রাঙ্গন (স্টেডিয়াম), এইরকম আরও কত কি! কলকাতার মতো বড় শহরে ট্রাম-বাস মোটর-গাড়ির অবিরাম ঘরঘরানির মধ্যেই চলছে কত না স্কুল, কত না কলেজ! সময়ে অসময়ে তারস্বরে মাইকে বেজে উঠছে সিনেমার গান। আধুনিক শহরের এই কলকোলাহলের মধ্যেই চলছে জ্ঞানার্জনের প্রাণান্ত প্রয়াস।

আবার শহর ও গ্রামের সুবিধা-অসুবিধা ভাগ করে নিয়েই গড়ে উঠেছে মফস্বল শহর। শহরের পাশ দিয়ে হয়তো বয়ে গেছে ছোট্ট নদী। কিছু শিল্প, কিছু যান-চলাচলের প্রশস্ত সড়ক, এই রকম সড়কের ধারে ধারে, কিছু বড় বড় গাছ, নদীপথে পরিবহনের ব্যবস্থা, কিছু স্কুল কিছু কলেজ কিছু উচ্চ কিছু মধ্য আর কিছু নিম্নবিত্ত মানুষ—এই সব নিয়ে গড়ে উঠেছে কিছু অপ্রধান শহর—আমরা বলি মফস্বল শহর। এখানে গ্রামের কিছু সবুজ এখনও অবশিষ্ট। এখানে বিস্তীর্ণ আকাশ, কিছু মাঠ-প্রান্তর, কিছু ঝোপঝাড় এখনও গ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়। জ্যোৎস্না রাতে এখানে এখনও চাঁদের আলো। এখনও টিয়া, ময়না, দোয়েল, শ্যামা, বুলবুল প্রভৃতি হরেক রকম পখির সন্ধান এখানে মেলে। সাঁঝের বেলা শোনা যায় শেয়ালের ডাক। বাড়ির লাগোয়া কোথাও তরকারির বাগান, আবার কোথাও ফুলের বাগান। বাগানের গেটে মাধবীলতা। বড় শহরের চাঞ্চল্য কোলাহল এখানে কম, আবার গ্রামের নিস্তব্ধ পরিবেশও এখানে প্রত্যাশিত নয়। তবে দোকান-বাজার, কোর্ট-কাছারী যেখানে, সেখানেই বেশী লোকের আনাগোনা, সেখানেই কিছুটা হৈ চৈ হট্টগোল।

জীবনে চলার পথে এমনি কত রকম পরিবেশের সঙ্গেই না আমরা পরিচিত হই, সেসব দেখে মুগ্ধ হই! দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের, কিংবা সুন্দরবনের জল-জঙ্গলের, অসামান্য রূপের কোনো তুলনা নেই। কিন্তু এইসব পরিবেশের নানারকম সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তারও যথেষ্ট অবকাশ আছে।

কোনো জায়গার পরিবেশ কেমন, তা প্রধানতঃ নির্ভর করে সেখানকার জলবায়ু এবং ভূ-প্রকৃতির উপর। অর্থাৎ, সে জায়গাটা গরম না ঠাণ্ডা, সেখানে বৃষ্টিপাত বেশী হয় না কম, সে জায়গাটা নিরক্ষরেখা থেকে কতদূরে অবস্থিত, সমুদ্র থেকে কত দূরে, কিংবা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে কত উপরে, কাছাকাছি নদ-নদী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত কিংবা মরুভূমি আছে কিনা সেখানকার মাটি কেমন, সেখানে কল-কারখানা আছে কিনা, এইরকম নানা বিষয়ের উপর।

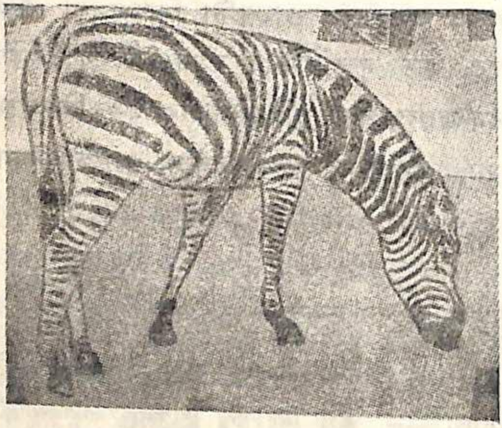


চিত্র ১৭। মফস্বল শহর।

আমাদের চারিপাশের আলো-হাওয়া, অজৈব ও জৈব উপাদান, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশু-পাখি এইসব নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

আমরা জানি, সমস্ত জীব তা সে মানুষই হোক, জীবজন্তুই হোক, অথবা উদ্ভিদই হোক—নানা কারণেই পরিবেশ-নির্ভর। অনুকূল পরিবেশ যেমন জীবদের সুষ্ঠু জীবন যাপনের উপযোগী করে, প্রতিকূল পরিবেশে তেমনি জীবন ধারণ হয় কষ্টকর, নয়তো একেবারেই অসম্ভব হয়ে

ওঠে। উদ্ভিদ-জগতের কত উদ্ভিদ্, কিংবা প্রাণী জগতের কত প্রাণী, এই প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে, আবার পরিবেশের আনুকূল্যে কত নতুন জীবন জন্মলাভ করেছে!



চিত্র ১৮। জেব্রা।

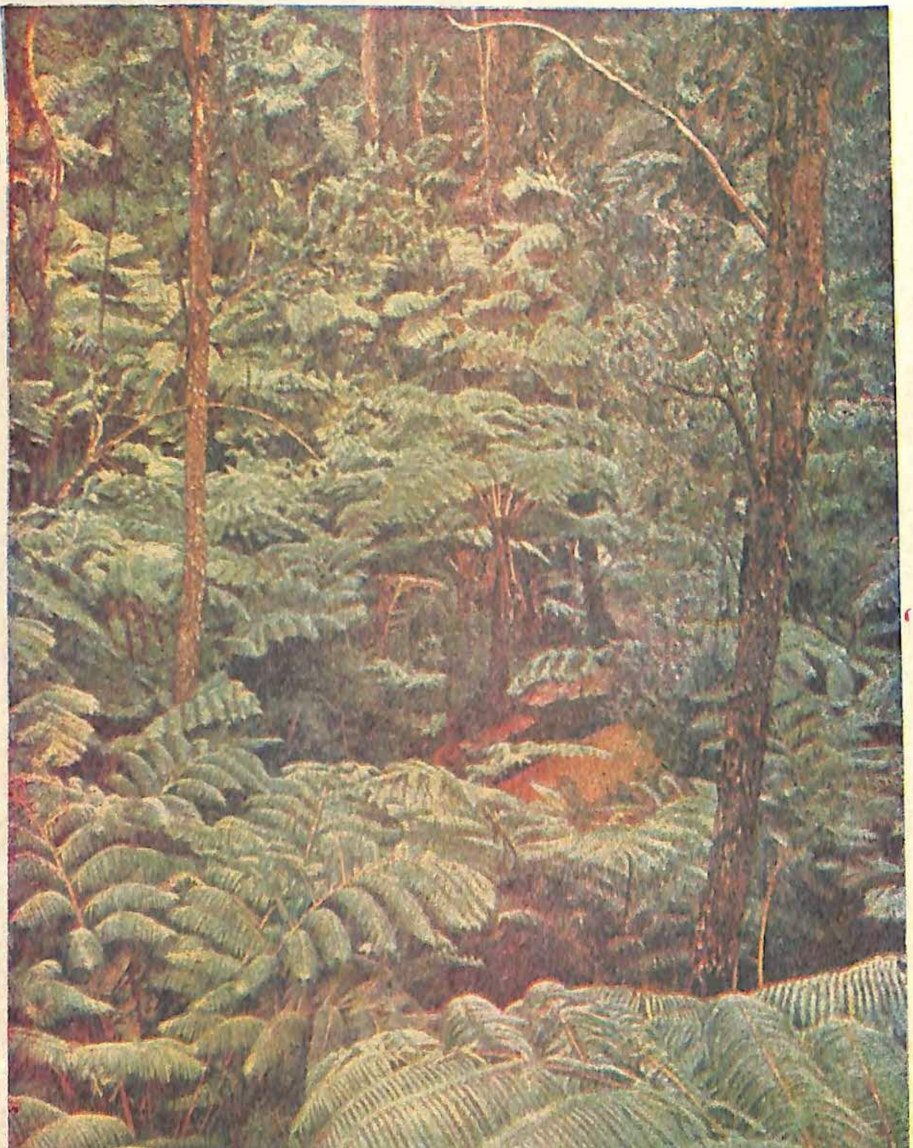
মানুষের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসও এই ধারা অনুসরণ করেই এগিয়ে এসেছে। দেশে দেশে মানুষের যে পার্থক্য তা-ও যেমন অনেকটা পরিবেশ নির্ভর, একই দেশের, একই সময়ের, এমন কি একই পরিবারের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করি, তাও আংশিক ভাবে পরিবেশের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি।

এই পরিবেশের প্রভাব আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি, জীব-জগতের অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ্ বাঁচার তাগিদে পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের কেমন খাপ খাইয়ে নিয়েছে। শ্বেতভল্লুকের তুষার বর্ণ, তার দীর্ঘ লোম, জিরাফের লম্বা গলা, তার চিত্র-বিচিত্র দেহ, সুন্দরবনের বাঘের ডোরাকাটা শরীর, গিরগিটির নিমেষে নিমেষে রঙ বদলানো, এ সবই প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার এক-একটি সফল প্রয়াস। বরফের দেশের শ্বেত-ভল্লুক প্রায় বরফের মতই সাদা। গাছের নীচের আলো-ছায়ার সঙ্গে জেব্রার বা জিরাফের, কিংবা বাঁশবনের ও ঘাসবনের আলো-ছায়ার সঙ্গে ডোরাকাটা বাঘের, বেমালুম মিশে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা, আর বনে-জঙ্গলে সবুজ আর হলুদ রঙের পটভূমিতে সতত সতর্ক গিরগিটির তড়িঘড়ি রঙ-বদলানো, এসবই যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিরাপত্তার এক চমৎকার ব্যবস্থা!

উদ্ভিদ-রাজ্যেও এমন উদাহরণ কত আছে। যেমন 'রেঙ্গুন-আলু' দেখতে



মরু-অঞ্চলের জনজীবনে উট একটি অপরিহার্য প্রাণী।
মানুষ ও মালপত্র পরিবহনের ব্যাপারে উট এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।



উষ্ণ-মণ্ডলের নিবিড় অরণ্য—সবুজ উদ্ভিদ্ আমাদের পরম সুহৃদ।
[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

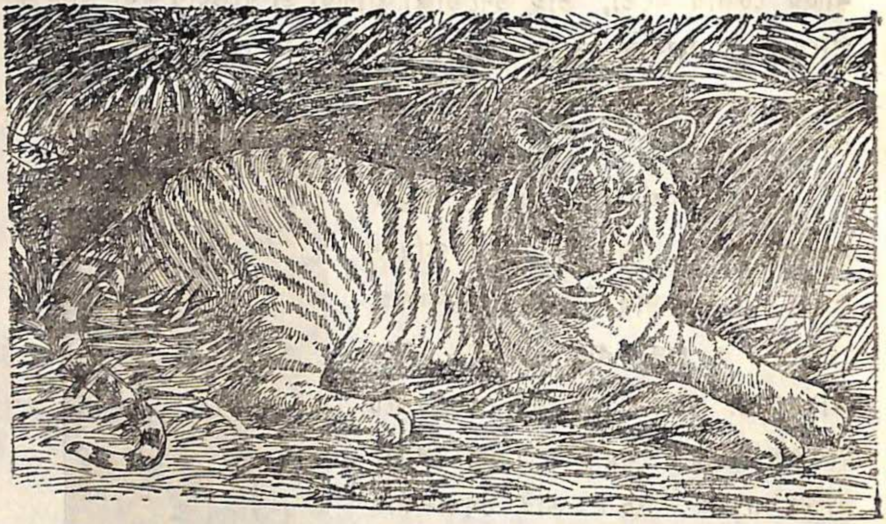
মাটির ঢেলার মতো, তাই তৃণভোজী প্রাণীরা তা খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। আবার একরকম কচুগাছ আছে, যা দেখতে সাপের ফণার মতো, তাই প্রাণীরা তার ধারে-কাছেও ঘেঁষে না।



চিত্র ১৯। জিরাফ।

এমন অনেক গাছ আছে যেগুলি মরুভূমিতে বা অনুরূপ শুষ্ক ভূমিতে জন্মায়। জলাভাব, প্রখর সূর্যালোক, বেগবান ও শুষ্ক বায়ু প্রভৃতি চরম আবহাওয়া উপেক্ষা ক'রেও এরা বেঁচে থাকতে পারে। মরুভূমিতে জল থাকে মাটির অনেক নীচে। তাই সেখানকার উদ্ভিদের মূল খুব লম্বা হয় এবং মাটির গভীরে প্রবেশ ক'রে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে। জল ধারণ ক'রবার জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে শিকড় স্থূল ও মিউসিলেজপূর্ণ হয়। তাছাড়া দেহের মধ্যেও এরা ভবিষ্যতের জন্য জল সংগ্রহ ক'রে রাখতে পারে। এজন্য কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডও স্থূল হয় এবং তাতে জল-কলা ও মিউসিলেজ থাকে। দেহের জল যাতে সহজে বেরিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য গাছে পাতার সংখ্যা কম হয়, এবং আকারে ছোট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। সেক্ষেত্রে সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত কাণ্ডই পাতার মতো সালোক-সংশ্লেষ করে।

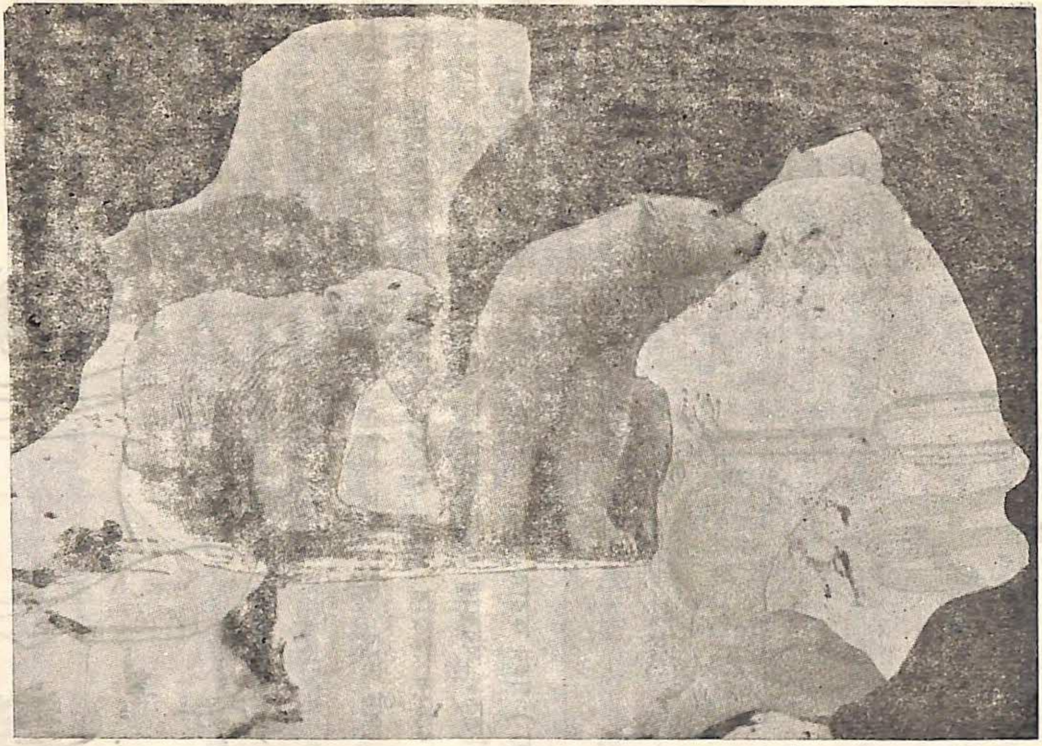
মরু-অঞ্চলে জল অতি দুর্লভ বস্তু। বারোমাস বহতা নদী এখানে নেই। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, মরুভূমি একেবারে প্রাণীশূন্য নয়। বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে কোথাও জলের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু কোন খানে জলের সামান্য উৎস থাকলেও সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মরূদ্যান। আর তাকে



চিত্র ২০। সুন্দরবনের ডোরাকাটা বাঘ।

ঘিরে তারই আশেপাশে অনেক রকম উদ্ভিদ ও প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। মরুবাসী স্তন্যপায়ীদের দেহে জলের পরিমাণ, যারা রীতিমত জল খেয়ে জীবন ধারণ করে, ঠিক তাদের মতই হয়, অর্থাৎ দেহের ওজনের ৬৫ শতাংশ। এখন প্রশ্ন—এসব প্রাণী জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক জল পায় কোথা থেকে ? অনেক মরুবাসী প্রাণীই জল পায় প্রধানতঃ তাদের খাদ্য থেকে। কারণ, তাদের অনেকেরই প্রধান খাদ্য হ'ল রসালো ফনী-মনসা, যাতে জলের পরিমাণ প্রায় ৯০ শতাংশ, কিংবা বাবলা-জাতীয় কাঁটাগাছ। এছাড়া আছে নানারকম জীবিত ও মৃত প্রাণী, যাদের দেহে থাকে প্রায় ৬৫ শতাংশ জল। মরু-অভিযোজনের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল জল সংগ্রহ এবং দেহের মধ্যে জল-সংরক্ষণ, অর্থাৎ জলের অপচয় নিবারণের বিবিধ ব্যবস্থা ! আর সেজন্যই তারা অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় অনেক কম জল খেয়ে, অথবা একেবারে না খেয়েও, অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে।

উট এক বিচিত্র প্রাণী। মরুভূমির রুক্ষ প্রকৃতিতেও সে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। আর দু'চারদিন জল গ্রহণ না ক'রেও সে অনায়াসে



চিত্র ২১। বরফের দেশের শ্বেত-ভল্লুক প্রায় বরফের মতই সাদা।

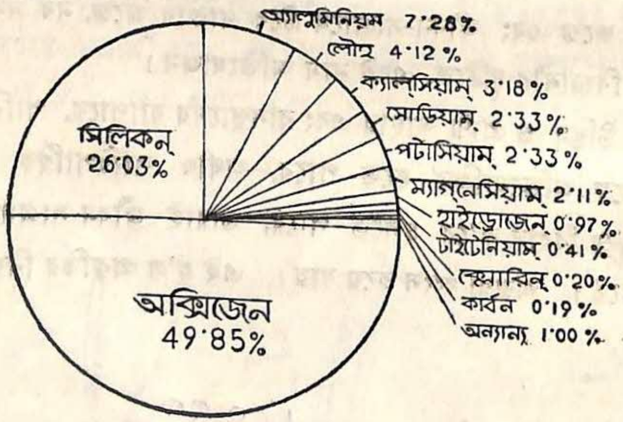
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবমণ্ডল

জীব-জগৎ এবং এই পৃথিবীর শিলামণ্ডল (Lithosphere), বারিমণ্ডল (Hydrosphere) এবং বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)—এইসব মিলিয়ে হ'ল জীবমণ্ডল (Biosphere)। শিলামণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডল বলতে বোঝায়, এই পৃথিবীর কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় আবরণ।

ভূপৃষ্ঠে আছে প্রধান দু'টি মণ্ডল—শিলামণ্ডল ও বারিমণ্ডল। আর পৃথিবীর চারদিকে বায়ুর যে আবরণ আছে, তার নাম বায়ুমণ্ডল। শিলা-মণ্ডলে সাধারণভাবে আগ্নেয়শিলার প্রাচুর্য, সেই সঙ্গে কিছুটা পাললিক শিলাও থাকে। ভূপৃষ্ঠে অবশ্য স্থল অপেক্ষা জলই বেশী (ভূপৃষ্ঠের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই জল)।

মৌল বা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা প্রায় একশ', আর এদের প্রায় সবগুলিকেই পৃথিবীতে পাওয়া যায়। সোনা, রূপা, তামা, প্ল্যাটিনাম



চিত্র ২৪। পৃথিবীতে বিভিন্ন মৌলের পরিমাণ।

প্রভৃতি কয়েকটি মৌল মুক্ত অবস্থায় ভূত্বকে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ মৌলই পাওয়া যায় অন্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়, অর্থাৎ যৌগ বা যৌগিক পদার্থরূপে।

ভূপৃষ্ঠের পাষাণময় স্তর ছাড়া শিলাচূর্ণ দিয়ে তৈরী যে-সব কোমল স্তর আছে, তারই নাম মাটি। সূর্যের প্রখর তাপে, বৃষ্টির জল-প্রবাহে, ঝড়-বাতাসে এবং আরও অনেক কিছুর জন্যে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হয়। তার সঙ্গে মেশে জীব-জন্তুর দেহ-নির্যাস (অর্থাৎ, দেহের সার-পদার্থ) (জৈব সার), অথবা তাদের দেহাবশেষ (অর্থাৎ, দেহের অবশিষ্ট অংশ)। এজন্য মাটিতে অজৈব এবং জৈব উপাদান দুই-ই প্রচুর পরিমাণে থাকে।

বৃষ্টি হলে, জল-প্রবাহের সঙ্গে মাটির ঐসব উপাদান মিশে যায়। এজন্য উদ্ভিদ্ ও প্রাণী নিজেদের পরিবেশ থেকে ঐ সব উপাদান সহজেই সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে।



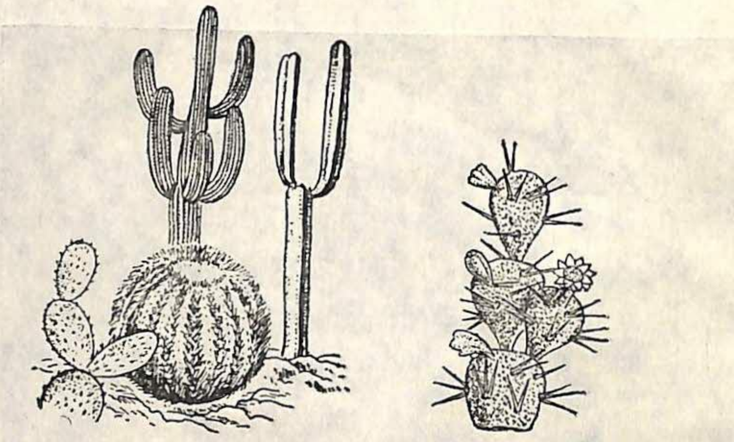
চিত্র ২৫। ভূপৃষ্ঠের পাষাণময় স্তর ছাড়া শিলাচূর্ণ দিয়ে তৈরী যেসব কোমল স্তর আছে, তারই নাম মাটি।

ভূপৃষ্ঠের উপরদিকে অন্ততঃ ২৫০ মাইল, বা ৪০০ কি. মি., পর্যন্ত বায়ু বিদ্যমান। তবে অনেকেরই অনুমান, এর বিস্তার উপরদিকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত। ভূপৃষ্ঠের উপরের স্তরই সবচেয়ে ঘন, যত উপরে ওঠা যায়, বায়ুস্তর তত পাতলা হয়ে যায়।

জীব তার প্রায়াজনীয় শক্তির জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করে সূর্যের উপর, আর গঠনগত উপাদানের জন্য নির্ভর করে পৃথিবীর উপর।

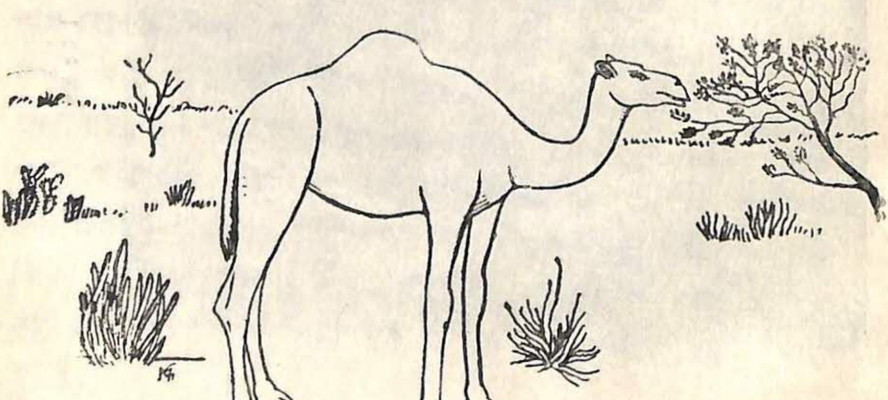
একটি জীবদেহে উৎপন্ন শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্য জীবের কোনো কাজে লাগে না। সুতরাং, শক্তির জন্য, জীব-জগতে অবিরাম সৌর-শক্তির প্রবাহ প্রয়োজন।

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারে। অর্থাৎ, যতদিন না আবার জল কিংবা রসালো উদ্ভিদ (বাবলা-জাতীয় কাঁটাগাছের পাতা, যা মরু-অঞ্চলে



চিত্র ২২। মরুভূমির উদ্ভিদ্।

সহজলভ্য) গ্রহণ করার সুযোগ পায়, ততদিন পথ চলতে পারে। এই রকম প্রতিকূল অবস্থায় একটু কৃশকায় হয়ে যায়, কিন্তু মোটেই কাতর হয় না। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, মরূদ্যানে বা লোকালয়ে পৌঁছে, আবার পেট ভরে জল পান করার মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই, তাকে



চিত্র ২৩। উটকে বলা হয় মরুভূমির জাহাজ।

আবার আগের মতই সুস্থ-সবল দেখায়। মরু-অঞ্চলের জন-জীবনে উট একটি অপরিহার্য প্রাণী। মানুষ ও মালপত্র পরিবহনের ব্যাপারে উট এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এইসব কারণে উটকে বলা হয় 'মরুভূমির জাহাজ'। উটের বিশেষ দেহ-গঠনের জন্যই এটা সম্ভব হয়।

আবার, তুষারাবৃত মেরু-অঞ্চলে গড়ে উঠেছে আর একরকম জীবগোষ্ঠী।* এইসব জীবগোষ্ঠী সেখানকার প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েই বেঁচে আছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর ক'রে জীব-জগতে এইরূপ কতরকম অভিযোজন যে হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই।

আর একটি কথা। প্রকৃতির ভৌত পরিবেশ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। বেঁচে থাকার জন্যে একে অন্যের উপরে অনেকখানি নির্ভরশীল। তাছাড়া অনেকের মধ্যেই রয়েছে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। তাই জীব-জগতের একদিকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে, খাদ্য আহরণ এবং খাদ্য গ্রহণের জন্যে, যেমন চলেছে নানাপ্রকার অভিযোজন, অর্থাৎ নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নব নব রূপায়ণ, অপরদিকে তেমনি চলেছে, আত্মরক্ষার জন্যে এবং জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার জন্যে, নব নব উপায় উদ্ভাবন। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, এরই নাম অভিযোজন।

যে-সব উদ্ভিদ্ ও প্রাণী আহার এবং বাসস্থানের ব্যাপারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত হতে পারে, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে চলতে পারে, তারাই জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে। অন্যরা ধ্বংস হয়ে যায়। এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম।

* যেমন—লাইকেন, অ্যালগী, শ্রিম্প্, ক্রিল, সীলমাছ, পেঙ্গুইন প্রভৃতি।

সবুজ উদ্ভিদই শুধু সৌর-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য তৈরি করতে পারে। এজন্য অন্য সকল জীবকেই শক্তির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপরই নির্ভর করতে হয়।

জীবের জীবন-ধারণের জন্যে প্রায় ত্রিশ রকম মৌলের, বা মৌলিক পদার্থের, প্রয়োজন। এদের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয় বেশী মাত্রায়। সে তুলনায় অন্যগুলির প্রয়োজন হয় অল্প মাত্রায়। প্রয়োজনের পরিমাণ যাই হোক না কেন, পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলি পর্যায়ক্রমে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং কোন-না-কোন উপায়ে আবার পরিবেশেই ফিরে যায়।

অজৈব উপাদানগুলির অনুপাত অনেকাংশে প্রাণ-প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। উপাদানগুলি বারবার চক্রাকারে আবর্তিত হয় (অর্থাৎ, চাকার মতো ঘোরে)। তা না হলে, পরিবেশ থেকে সেগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেত। পরিণামে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেত।

উল্লেখ্য যে, সবুজ উদ্ভিদ্ জীবমণ্ডলের সেইসব অঞ্চলেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে, যেখানে দিনের বেলায় সূর্যের আলো পৌঁছায়। এগুলি হ'ল বায়ুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ, কয়েক মিলিমিটার গভীরতা পর্যন্ত মাটির স্তর, সমুদ্রের উপরিভাগ, হ্রদ এবং নদ-নদী।

উন্মুক্ত সাগরের উদ্ভিদ-জীবন বলতে প্রধানতঃ ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন (বা, উদ্ভিদ-কণা) বোঝায়। আর এদের উপর নির্ভর ক'রেই জন্মায় জুয়ো-প্ল্যাঙ্কটন (বা, প্রাণী-কণা)। এরা সাধারণতঃ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়। এরা সমুদ্রের লবণাক্ত জলের তুলনায় সামান্য ভারি। কাজেই সমুদ্র সম্পূর্ণ শান্ত থাকলে, এরা ধীরে ধীরে তলিয়ে যেত, এবং শেষে একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়ে থিতিয়ে পড়তো। সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে এইসব উদ্ভিদ্ যে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় না, তার কারণ, বায়ুতাড়িত সমুদ্র সব সময়ই অশান্ত থাকে। এই রকম কিছু উদ্ভিদ্ হয়তো ধীরে ধীরে ডুবে যায়, ডুবে যেতে যেতে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারপর জলের তাড়নায় আবার উপরদিকে ভেসে ওঠে। এইসব উদ্ভিদ্-কোষ সব সময় একটি অঞ্চলে

আবদ্ধ থাকলে, সেখানকার পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য সব নিঃশেষিত হয়ে যেত। কিন্তু জলের তাড়নায় এরা এক জায়গা থেকে এমন আর এক জায়গায় সরে যেতে পারে, যেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

যে-কোন জলাশয়ে খাদ্য-উৎপাদক হ'ল ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন, ভাসমান শেওলা এবং নানাপ্রকার জলজ উদ্ভিদ্। আর তৃণভূমিতে মূলযুক্ত উদ্ভিদ্ প্রধান খাদ্য-উৎপাদক।

আমাদের মতো যে-সব প্রাণী ডাঙ্গার উপরে কঠিন ও গ্যাসীয় পদার্থের সংযোগস্থলে বাস করে, তারা চলে-ফিরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে, প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে। জলচর প্রাণীরাও জলের মধ্যে বিচরণ ক'রে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে, খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

স্বাভাবিক কারণেই, জীবমণ্ডলের নীচের দিকে জীবের বিস্তার খুবই সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশী সীমাবদ্ধ উপরদিকে। সুউচ্চ পর্বতে (যেমন—হিমালয়ে), প্রায় ছ'হাজার মিটার সীমারেখার উপরে, সবুজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ, তরল জলের একান্ত অভাব। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নিম্নচাপ (অর্ধেকেরও কম) সম্ভবতঃ আর একটি কারণ। অধিক উচ্চতায় কয়েক প্রকার নিম্নশ্রেণীর প্রাণী (যেমন—মাকড়সা) হয়তো দেখা যায়। এরা হয়তো এমন সব ছোটখাট কীট-পতঙ্গ ধরে খায়, যারা হাওয়ায় ভেসে আসা ফ্লের পরাগ (বা, রেণু) কিংবা অন্যান্য জৈব পদার্থ আহার ক'রে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জীবের পক্ষে কঠিন মৃত্তিকা ও বায়ুর সংযোগ-স্থলে, জলের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকলে, জীবন ধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, সেখানেই তার আহার্য পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। অবশ্য পুকুর বা জলা-জায়গার স্থির জল এবং বায়ুর সংযোগস্থলেও নানাপ্রকার কাটাণু বা জীবাণু বেঁচে থাকতে এবং বংশ-বিস্তার করতে পারে। এজন্য বিজ্ঞানী বারনেল অনেকদিন আগেই বলেছেন যে, সুদূর অতীতে জলের

সংস্পর্শযুক্ত মৃত্তিকাস্তরই সম্ভবতঃ জীবের জন্ম ও বিকাশের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সবুজ উদ্ভিদের পক্ষে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ তিনটি শর্ত অবশ্য পালনীয় ; যেমন—

(১) জল, যা উদ্ভিদ্ সহজেই শিকড়ের সাহায্যে শোষণ ক'রে নিতে পারবে, এবং সেজন্য তা মাটির কণাগুলির মাঝে সব সবসময় উপযুক্ত চাপে সঞ্চিত থাকা প্রয়োজন।

(২) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, যা উদ্ভিদ্ বায়ুমণ্ডল থেকে সহজেই গ্রহণ করতে পারবে। এবং

(৩) অক্সিজেন (বিশেষতঃ রাত্রিবেলা), যা জলের চেয়ে বায়ু থেকেই অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণ করা সম্ভব।

এছাড়া প্রয়োজন হয় নানাপ্রকার খনিজ লবণ, যেগুলি মাটির কণাগুলির মধ্যে অবস্থিত জলে দ্রবীভূত হয়ে থাকে, যাতে উদ্ভিদ্ শিকড়ের সাহায্যে সহজেই তা শুষে নিতে পারে।

আর উদ্ভিদ্ থাকলে, তবেই তাদের উপর নির্ভর ক'রে প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারে। যেখানে উদ্ভিদ্ নেই, সেখানে কোনো প্রাণী থাকাও সম্ভব নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
পরিবেশ-তন্ত্র

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির অজৈব বা ভৌত পরিবেশ, এবং উদ্ভিদ্ ও প্রাণী অর্থাৎ জৈব পরিবেশ, পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। বেঁচে থাকার জন্যে একে অন্যের উপরে অনেকখানি নির্ভরশীল।

পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পরিবেশকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন—(১) অজৈব বা ভৌত পরিবেশ, এবং (২) জৈব পরিবেশ। সূর্য-রশ্মি, ভূস্তর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল এইসব নিয়ে তৈরী হয়েছে অজৈব বা ভৌত পরিবেশ। আর জৈব পরিবেশ তৈরি হয়েছে জীবদের নিয়ে। জীব বলতে বোঝায়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী, যাদের জীবন (বা, প্রাণ) আছে।

একটি বসতিতে যত জীব (অর্থাৎ, উদ্ভিদ্ বা প্রাণী) আছে, তাদের নিজেদের মধ্যে, এবং যে ভৌত পরিবেশে তারা বাস করে, সেই পরিবেশের সম্বন্ধকে **ইকোসিস্টেম (Ecosystem)** বা **পরিবেশ-তন্ত্র** বলা হয়। আলোচনার সুবিধার জন্যে, এবং পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, ছোট ছোট পরিবেশ-তন্ত্র গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবী-ব্যাপী পরিবেশ-তন্ত্রের সমষ্টিকেই জীবমণ্ডল বলা হয়।

পরিবেশের উপাদানসমূহ :

যে কোন পরিবেশের গঠনে প্রধানতঃ দু'রকম উপাদান থাকে ; যেমন —(১) অ্যাবায়োটিক বা অজৈব উপাদান (Abiotic Factors), এবং (২) বায়োটিক বা জৈব উপাদান (Biotic Factors)। এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

(১) অজৈব বা ভৌত উপাদানসমূহ :

অজৈব বা ভৌত উপাদান বলতে বোঝায় এমন সব উপাদান, যে-সবে জীবনের কোন লক্ষণ নেই। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল

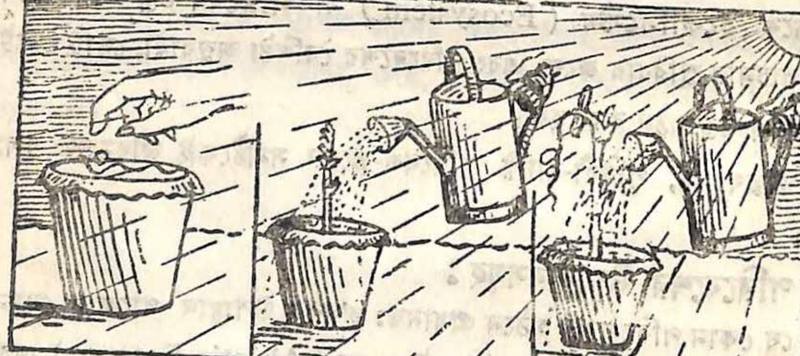
সৌর-শক্তি। আর আছে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ ; সেগুলি পাওয়া যায় মাটি, জল, বায়ু, নানাপ্রকার অজৈব ও জৈব যৌগ এবং লবণ (যেমন—অজৈব এবং জৈব সার) ইত্যাদি থেকে।

(২) **জৈব উপাদানসমূহ :**

জৈব উপাদান বলতে বোঝায় স্বভোজী বা খাদ্য-উৎপাদক (অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ্), পরভোজী বা খাদক (অর্থাৎ, প্রাণী), এবং মৃতভোজী, অর্থাৎ পচনকারী বা বিয়োজক (অর্থাৎ, পচনকারী ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণু প্রভৃতি)।

জীব-জগতে বেঁচে থাকার জন্যে প্রত্যেকেরই খাদ্যের প্রয়োজন। এই ব্যাপারে বিভিন্নরকম জীবের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একের বেঁচে থাকার জন্যে, খাদ্য হিসেবে, অন্যের প্রয়োজন হয়।

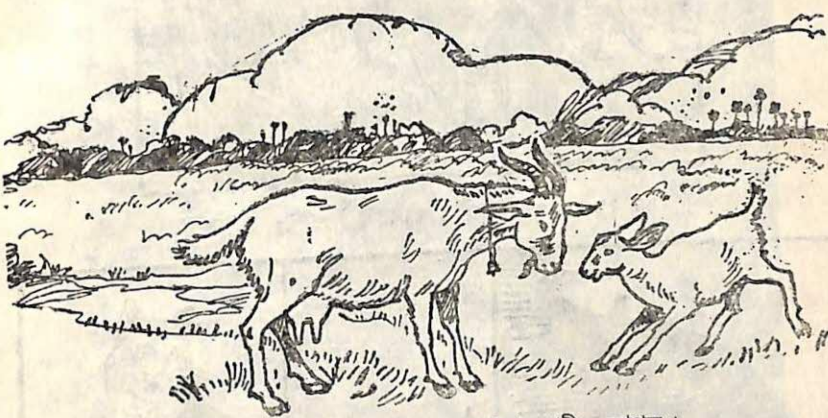
(ক) **স্বভোজী**—সমস্ত জীবিত বস্তুর মধ্যে কেবলমাত্র সবুজ উদ্ভিদই, সূর্যের আলোয়, সবুজ-পাতার সাহায্যে, বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড



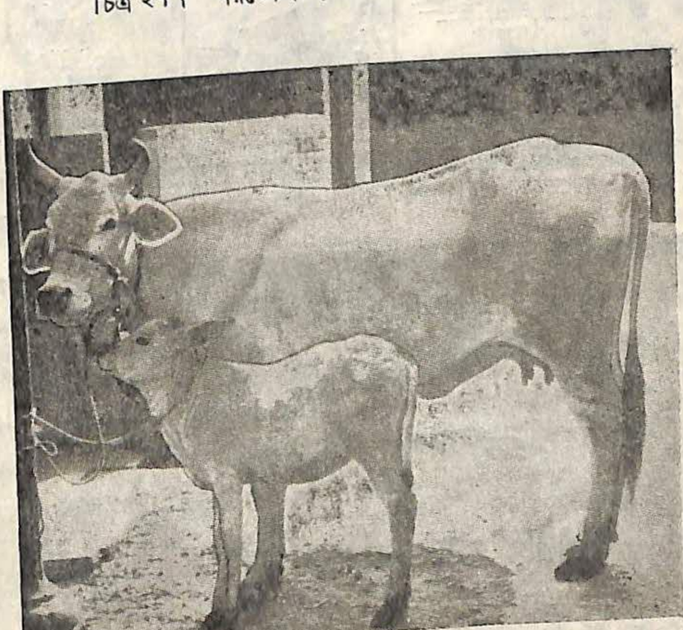
চিত্র ২৬। স্বভোজী বা খাদ্য-উৎপাদক—উদ্ভিদ্।

গ্রহণ ক'রে, এবং শিকড়ের সাহায্যে মাটির রস শোষণ ক'রে, সেইসব উপাদান দিয়ে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই প্রস্তুত ক'রে নিতে পারে (সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়া)। তাই এদের স্বভোজী বা খাদ্য-উৎপাদক (Autotrophes) বলা হয়।

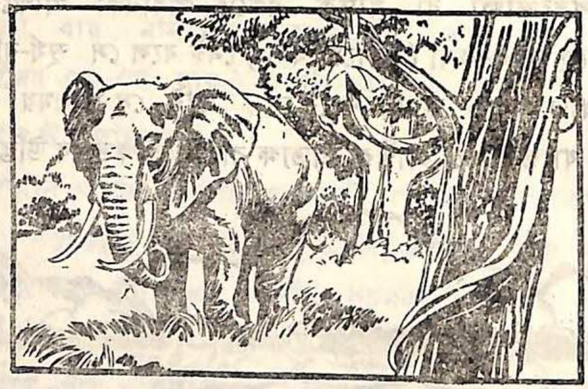
(খ) **পরভোজী বা খাদক**—বলতে প্রধানতঃ প্রাণীকে বোঝায়। প্রাণীর দেহে সবুজ-কণা (ক্লোরোফিল) নেই বলে সে সূর্য-রশ্মি ধরে তার সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। তাই সে সবসময় তৈরী খাবার খোঁজে। খাদ্যের জন্য প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপরেই



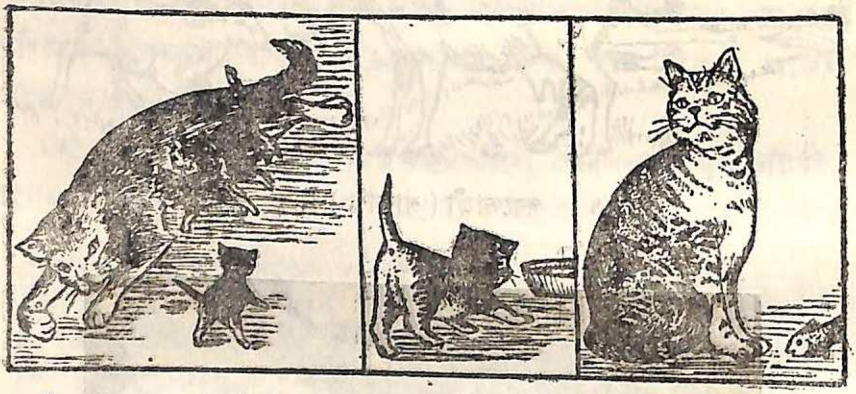
চিত্র ২৭। পরভোজী (শাকাশী) প্রাণী—ছাগল।



চিত্র ২৮। পরভোজী (শাকাশী) প্রাণী—গরু।



চিত্র ২৯। পরভোজী (শাকাশী) প্রাণী—হাতি।



চিত্র ৩০। পরভোজী (মাংসাশী) প্রাণী—বিড়াল। (দ্বিতীয় স্তরের খাদক।)



চিত্র ৩১। পরভোজী (মাসাংশী) প্রাণী—বাঘ। (দ্বিতীয় স্তরের খাদক।)

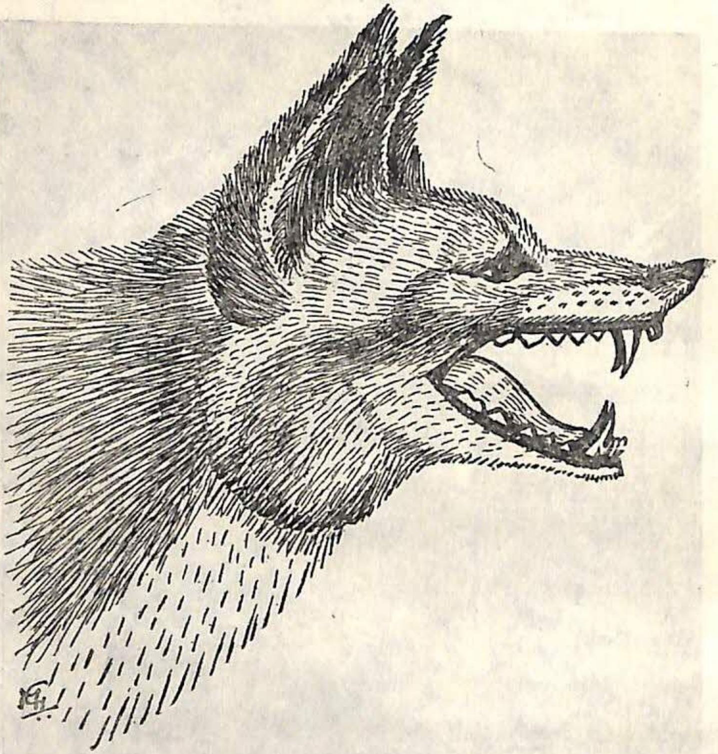


চিত্র ৩২। চিতা বাঘ—বিড়াল-জাতীয় মাংসাশী প্রাণীর দাঁতের গঠন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

নির্ভর করতে বাধ্য হয়। এজন্য তাদের পরভোজী (Heterotrophes) বলা হয়।

যে-সব প্রাণী শুধু উদ্ভিদ্ বা ঘাস-পাতা আহার ক'রে বেঁচে থাকে (শাকাশী বা তৃণভোজী), তারা প্রথম স্তরের খাদক, যেমন—গরু, ছাগল, মোষ, হাতি ইত্যাদি। আর যারা ঐ সব তৃণভোজী প্রাণীর মাংস আহার ক'রে বেঁচে থাকে (মাংসাশী), তারা দ্বিতীয় স্তরের খাদক, যেমন—বাঘ, সিংহ, নেকড়ে বাঘ, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, চিল, শকুন ইত্যাদি।

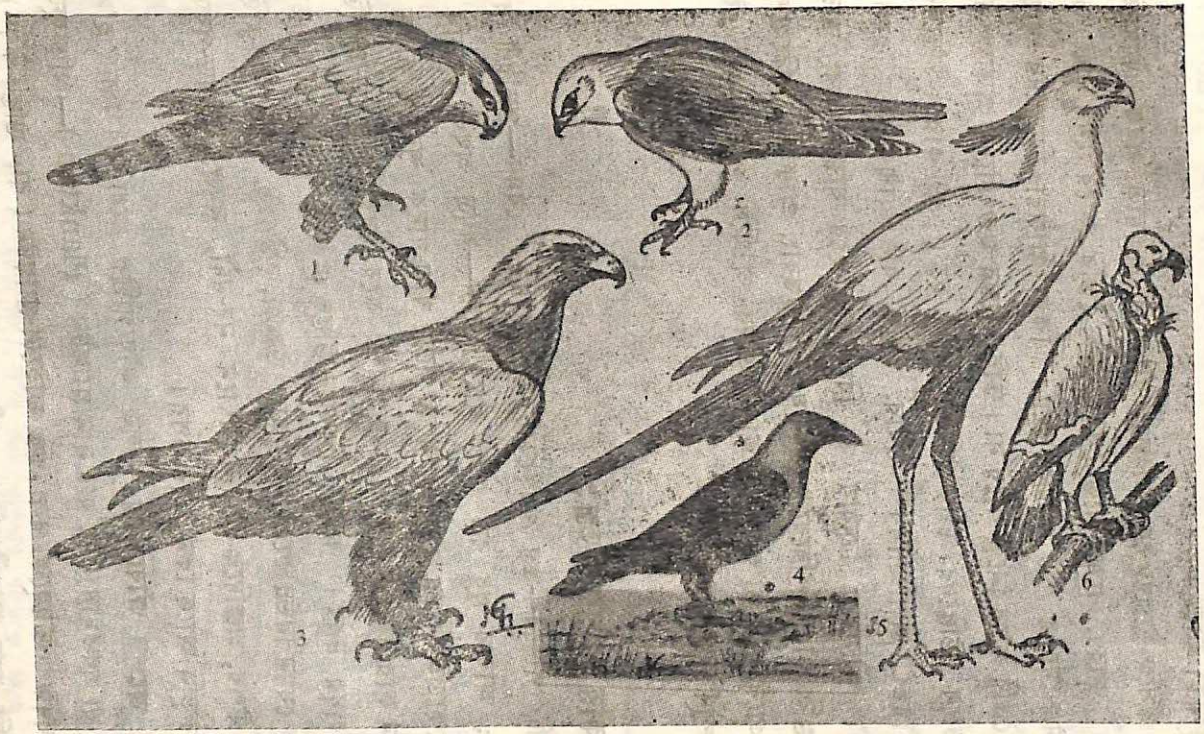
(গ) **মৃতভোজী**—আমাদের আশেপাশে আরও একপ্রকার জীব



চিত্র ৩৩। নেকড়ে বাঘ—কুকুর-জাতীয় মাংসাশী প্রাণীর দাঁতের গঠন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

আছে, যাদের বলা হয় মৃতভোজী, অর্থাৎ পচনকারী বা বিয়োজক ; যেমন—নানাপ্রকার ছত্রাক, লাইকেন (শেওলা ও ছত্রাকের মিশ্রণ), আর নানাপ্রকার ব্যাক্‌টেরিয়া বা জীবাণু।

এদের সবার কাজ হ'ল অন্য জীবের মৃতদেহ থেকে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করা। এই সময় নানাপ্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এজন্য ঐ জীবের মৃতদেহ ক্রমশঃ বিয়োজিত হয়ে যায়, এবং নানাপ্রকার সরল অজৈব ও জৈব যৌগ উৎপন্ন হয়ে আবার পরিবেশে ফিরে যায়। একেই বলে জীবদেহের পচন। আর এইসব জীবকে বলা হয় মৃতভোজী (Saprotrophes)। এদের ক্রিয়ায় মৃতদেহ বিনষ্ট হয়, এবং উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য খাদ্য উৎপন্ন হয়ে কিছু মাটিতে জমা হয়, আর কিছুটা গ্যাস



চিত্র ৩৪। কয়েক প্রকার শিকারী পাখি। (দ্বিতীয় স্তরের খাদক)

1. বাজপাখি, 2. চিল, 3. স্বর্ণ-ঈগল, 4. পাতি-কাক, 5. কেরাণী-পাখি, 6. শকুন।

হিসেবে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। সুতরাং, পরিবেশ-তন্ত্রে মৃতভোজীদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, খাদ্যের ব্যাপারে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই স্বনির্ভর। কারণ, নিজের খাদ্য সে নিজেই তৈরি ক'রে নেয় এবং তা দিয়েই নিজ-দেহের পুষ্টি সাধন করে। কিন্তু প্রাণীরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি ক'রে নিতে পারে না। তাই খাদ্যের জন্য তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়। এই কারণে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আবার, উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর মৃত্যু হলে, মৃতভোজী জীবদের ক্রিয়ায় তা বিয়োজিত হয়ে যায়, এবং তার উপাদানগুলি আবার পরিবেশে ফিরে যায়। সুতরাং, প্রাকৃতিক পরিবেশে এদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ, এদের অভাবে পরিবেশের এই চক্রটি সম্পূর্ণ হতে পারে না।

নানাপ্রকার পরিবেশ-তন্ত্র :

একটি পরিবেশ-তন্ত্র খুব ছোট হতে পারে, যেমন—পুষ্করিণী বা তৃণভূমি ; আবার খুব বড় হতে পারে, যেমন—সমুদ্র অথবা মরুভূমি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জীব পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

কোন জায়গার পরিবেশ প্রধানতঃ নির্ভর করে সেখানকার ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ুর উপর। অর্থাৎ, সেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণী কীরূপ হবে, তা একদিকে যেমন নির্ভর করে সেখানকার উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, মাটির প্রকৃতি প্রভৃতির উপর, অন্যদিকে তেমনি সেখানে নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত কিংবা মরুভূমি আছে কিনা তার উপর।

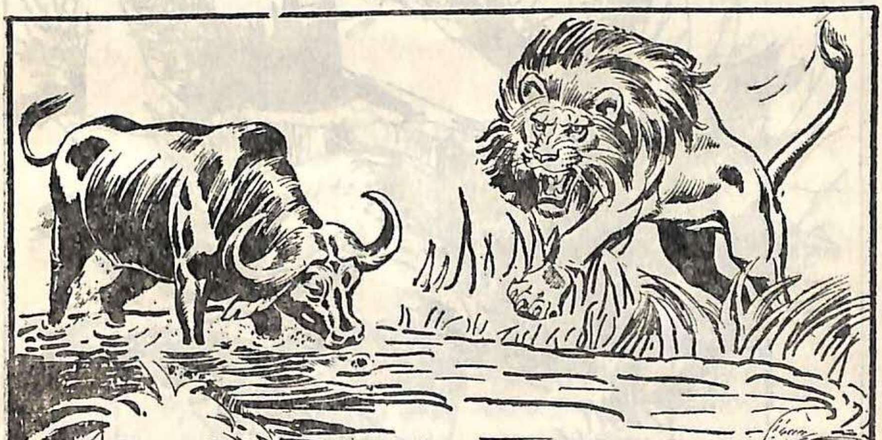
(১) **জলের জীবগোষ্ঠী**—জলজ জীবগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বপ্রধান হ'ল ভাসমান বা সঞ্চরমান জীব, যার নাম প্ল্যাঙ্কটন (Plankton)—অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্‌কে বলা হয় ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন (বা, উদ্ভিদ্-কণা), আর অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক প্রাণীকে বলা হয় জুয়ো-প্ল্যাঙ্কটন (বা, প্রাণী-কণা)। যারা জলে সাঁতার কাটে, তাদের বলা হয় নেকটন্

(Nekton)। আর যারা জলাশয়ের একেবারে তলদেশে থাকে, কিংবা সেখানে বিচরণ করে, তারা হ'ল বেন্‌থোস্ (Benthos)।

পুকুর বা হ্রদের জলে প্রচুর ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন থাকে। শেওলা এবং ঝাঁঝিও অনেক দেখা যায়। আর আছে—শাপলা, পদ্ম, পানিফল প্রভৃতি। সঞ্চরমান প্রাণীদের মধ্যে আছে—নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ ও মাছ। বেন্‌থোস্ বলতে থাকে—শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া প্রভৃতি। আর পুকুর বা হ্রদের কিনারে দেখা যায়—ব্যাঙ, সাপ, মাছরাঙা, বক, সারস প্রভৃতি, যারা কীট-পতঙ্গ, মাছ, গুগ্‌লি, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি ধরে ধরে খায়।

নদ-নদীর জলে স্রোত বেশী। তাই সেখানে দেখা যায়— সূত্রাকার অ্যাল্‌গি এবং পাটাশেওলা। বেশী স্রোতে চলার উপযোগী মাছের দেহ হয়

বনের গল্প ঃ



চিত্র ৩৫। তৃণভোজী প্রাণী বুনো-মোষ জল খাওয়ার উদ্দেশ্যে জলে নেমেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাংসাশী প্রাণী সিংহ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক।

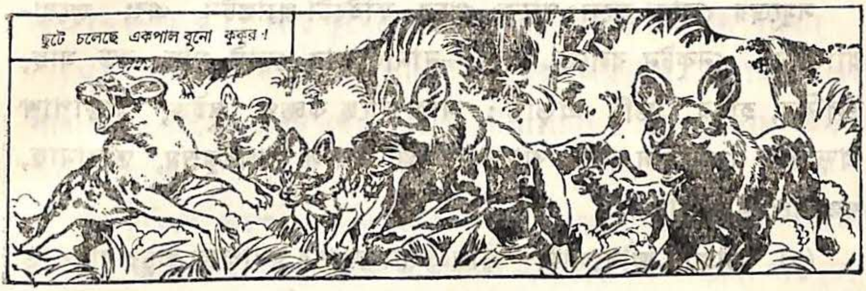
বনের গল্প ঃ



চিত্র ৩৬। হরিণ শিকার করে বাঘ ঝোপের আড়ালে বসে অপেক্ষা করছে, নিরিবিলি কখন আহার-পর্ব সমাধা করতে পারবে। (বাঘ হ'ল দ্বিতীয় স্তরের খাদক)



চিত্র ৩৭। বাঘ ও হরিণ—এদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক।
(হরিণ হ'ল প্রথম স্তরের খাদক)



চিত্র ৩৮। এদিকে শিকারের গন্ধ পেয়ে সেদিকে ছুটে চলেছে একপাল বুনো কুকুর।
(দ্বিতীয় স্তরের খাদক)



চিত্র ৩৯। আর কাছেই অপেক্ষা করছে শেয়াল আর হায়না। গাছের ডালে বসে আছে শকুন। সকলেই ভাবছে, কখন ঐ শিকারে ভাগ বসাবে।
(দ্বিতীয় স্তরের খাদক)

চ্যাপ্টা ; যেমন—ইলিশ, চিতল, বোয়াল প্রভৃতি। যেখানে স্রোত কম, সেখানে পুকুরের মতই জীবগোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

সমুদ্রের লোনা-জলে থাকে প্রচুর ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন এবং জুয়ো-প্ল্যাঙ্কটন। নেক্‌টন বলতে আছে—নানাপ্রকার ছোট মাছ, বড় মাছ, ডল্‌ফিন্, হাঙর, তিমি প্রভৃতি ; আর আছে কচ্ছপ, স্কুইড, অক্টোপাশ প্রভৃতি। বেন্‌থোস্ বলতে আছে—স্পঞ্জ, প্রবাল, সাগরকুসুম, তারামাছ, শঙ্খ, চিংড়ি প্রভৃতি।

(২) **ডাঙ্গার জীবগোষ্ঠী**—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বনাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে গাছও নানাপ্রকার ; যেমন—শাল, শিমূল, পলাশ, আবলুশ, মেহগনি, বাঁশ প্রভৃতি। বড় বড় গাছের নীচে থাকে নানারকম লতা-গুল্ম। খাবারের অভাব নেই বলে, সেখানে নানারকম কীট-পতঙ্গ, পাখি, শাকাশী ও মাংসাশী প্রাণীও প্রচুর পাওয়া যায়। হরিণ, বুনো-মোষ, বাঘ, সিংহ, হাতি, বানর, শিম্পাঞ্জী, গরিলা প্রভৃতি নানারকম জীবজন্তু বাস করে গভীর অরণ্যে।

সুন্দরবনের জলা-জঙ্গলের পরিবেশ একটু বিশেষ ধরনের। তাই সেখানে নারকেল, সুন্দরী, কেয়া, গরান প্রভৃতি উদ্ভিদের প্রাচুর্য। প্রাণীদের মধ্যে আছে—নানারকম হরিণ, শূয়োর, বাঘ, বানর, কুমীর প্রভৃতি। আর আছে নানারকম পাখি। তাদের মধ্যে বক, সারস, মাছরাঙা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পাহাড়-অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হ'ল, পাইন, ফার, লার্চ, ওক, রডোডেন্‌ড্রন, ম্যাগ্‌নোলিয়া প্রভৃতি গাছ। কুয়াশার জন্যে ঐসব গাছ শেওলা ও অর্কিডে ছাওয়া। পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল কেটে চা-বাগান করা হয়। কারণ, এই পরিবেশে চা-গাছ ভাল জন্মায়। উঁচু পাহাড় অধিকাংশ সময়ই বরফে ঢাকা থাকে। সেখানকার বাতাসও পাতলা। উদ্ভিদ্ বা জীব-জন্তু বাস করার পক্ষে এই পরিবেশ খুব অনুকূল নয়। সেখানে উদ্ভিদ্ বেশী নেই, তাই সেখানে পশু-পাখির সংখ্যাও খুব কম। যারা আছে, তারা নিজেদের ঐ অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে রয়েছে।

মেরু-অঞ্চল বারোমাস বরফে ঢাকা থাকে। সেখানে মাটি নেই,

সেজন্য সাধারণ গাছপালাও নেই। তাই বলে সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব নেই, এমন নয়। সুমেরু-অঞ্চলে দেখা যায় প্রধানতঃ সীল, সিন্ধুঘোটক এবং শ্বেত-ভল্লুক। আর কুমেরুতে দেখা যায় সীল ও পেঙ্গুইন পাখি।

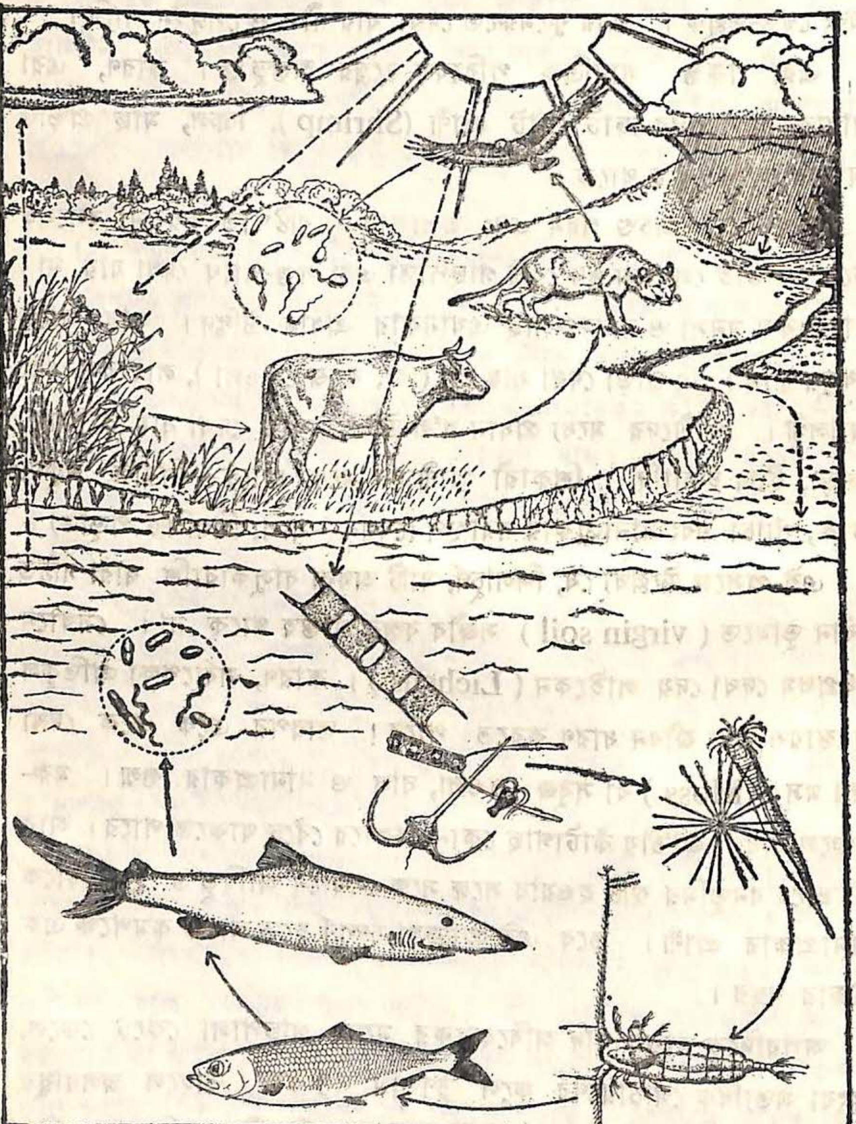
এরা কিন্তু সামুদ্রিক পরিবেশ-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এরা সাধারণতঃ সমুদ্রের ছোট ছোট প্রাণী (Shrimp), ক্রিল, মাছ প্রভৃতি আহার ক'রে বেঁচে থাকে।

মরুভূমিতে প্রচণ্ড গরম এবং জলাভাব। বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। তাই সেখানে খুব বেশী গাছপাতা এবং পশু-পাখি দেখা যায় না। নানারকম মনসা ও বাবলা-গাছ এখানকার প্রধান উদ্ভিদ। আর আছে খেজুর গাছ। এ ছাড়া দেখা যায় মস্ (বা, সবুজ শেওলা), লাইকেন এবং অ্যাল্‌গী। প্রাণীদের মধ্যে প্রধান হ'ল উট। আর দেখা যায় ক্যাঙ্গারু, ভেড়া, ইঁদুর ইত্যাদি। শিকারী প্রাণীদের মধ্যে আছে—শিয়াল, শকুন, কাক, প্যাঁচা এবং নানাপ্রকার সরীসৃপ (যেমন—সাপ, গিরগিটি প্রভৃতি)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শিলাচূর্ণ, মাটি অথবা বালুকারাশি দ্বারা গঠিত নবীন ভূমিতে (virgin soil) সজীব বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। সেখানে সর্বপ্রথম দেখা দেয় লাইকেন (Lichens)। কারণ, সর্বাপেক্ষা প্রতিকূল অবস্থায়ও এরা জীবন ধারণ করতে পারে! তারপর একে একে দেখা দেয় মস্ (Moss) বা সবুজ শেওলা, ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম। মরু-অঞ্চলে বাবলা-জাতীয় কাঁটাগাছ কোন প্রকারে বেঁচে থাকতে পারে। আর এইভাবে বনভূমির সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আবির্ভূত হতে থাকে নানাপ্রকার প্রাণী। তবে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে লাগে কমপক্ষে এক হাজার বছর।

অপরদিকে মানুষ যদি অবিবেচকের মতো গাছপালা কেটে ফেলে, কিংবা অত্যধিক গোচারণের ফলে তৃণভূমি নষ্ট করে, তাহলে জলবায়ুর ক্রিয়ায়, অত্যধিক ভূমিক্ষয়ের দরুন, সেখানে এর বিপরীত প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে থাকে, এবং তার ফলে অচিরেই সেই জায়গাটি জীবের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশী হলে, সে জায়গা মরুভূমিতে পরিণত হওয়াও বিচিত্র নয়। পূর্বোক্ত সৃষ্টির প্রক্রিয়া

সংগঠিত হতে সময় লাগে অনেক বেশী, কিন্তু ধ্বংসের কাজ সম্পন্ন হয় অত্যন্ত দ্রুত, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই।



চিত্র ৪০। পরিবেশের অজৈব ও জৈব উপাদানসমূহ। এখানে শক্তির প্রবাহ, জল-চক্র এবং দু'টি পরিবেশ-তন্ত্র (একটি ডাঙ্গায় এবং একটি সমুদ্রের লোনা জলে) দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে যে পারম্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

খাদ্য-শৃঙ্খল :

পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গেলে দেখা যাবে, জীবগোষ্ঠী হয়তো আলাদা। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ-তন্ত্রের গঠন মোটামুটি একই ধরনের।

একটি তৃণভূমি, একটি বনভূমি, একটি পুষ্করিণী, নদ-নদী অথবা সমুদ্র-তীরের লবণাম্বু বসতি হিসেবে আলাদা প্রকৃতির, তাই জীবগোষ্ঠীও হয়তো আলাদা। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এদের পরিবেশ-তন্ত্রের গঠনে বেশ মিল আছে।

আবার একটি বনে, নদ-নদীতে অথবা লবণাম্বুতে, একসঙ্গে অনেকগুলি পরিবেশ-তন্ত্র পাশাপাশি থাকতে পারে।

একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই স্বনির্ভর, অর্থাৎ নিজেদের খাদ্য তারা নিজেরাই তৈরি ক'রে নিতে পারে। কিন্তু প্রাণীরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি ক'রে নিতে পারে না। তাই খাদ্যের জন্যে তারা প্রত্যক্ষভাবে বা বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে খাদ্য-উৎপাদক উদ্ভিদের উপর। এ জন্য বনাঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একটি বনাঞ্চলের খাদ্য-শৃঙ্খল সাধারণতঃ এই রকম হয়ে থাকে :—

সবুজ উদ্ভিদ →	**শাকাশী প্রাণী →**	**মাংসাশী প্রাণী**
(খাদ্য-উৎপাদক)	(প্রথম স্তরের খাদক)	(দ্বিতীয় স্তরের খাদক)
ঘাস, গাছ-পাতা ইত্যাদি।	হরিণ, গরু, মোষ ইত্যাদি।	বাঘ, সিংহ, শিয়াল ইত্যাদি।

আর একটি খাদ্য শৃঙ্খল :—

ঘাস →কীট-পতঙ্গ →ব্যাঙ →সাপ →ময়ূর।

পুষ্করিণীতে অথবা নদ-নদীতে এইরকম একটি খাদ্যশৃঙ্খল হ'ল :—

অ্যাল্‌গি→অ্যামিবা→জলজ কীট-পতঙ্গ→ ছোট মাছ →বড় মাছ।

আবার, সমুদ্রতীরের লবণাম্বুর খাদ্য-শৃঙ্খল নিম্নরূপ :—

ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন→জুয়ো-প্ল্যাঙ্কটন→কীট-পতঙ্গ→ছোট মাছ→বড় মাছ (বা, হাঙর)।

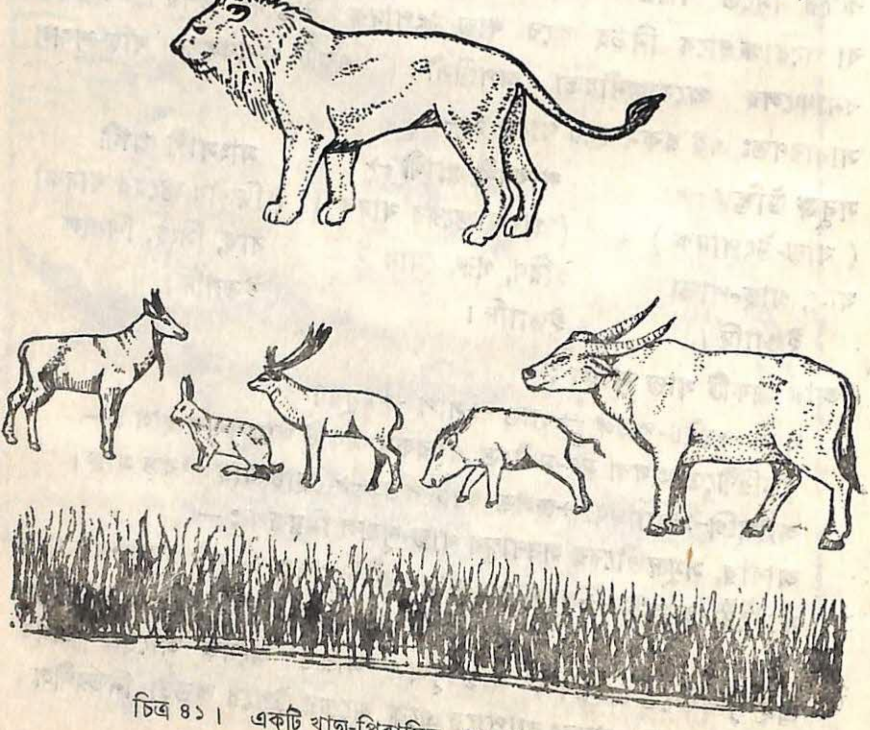
এই পৃথিবীতে এইরকম খাদ্য-শৃঙ্খল আরও অনেক আছে। এসব দেখেই বোঝা যায়, খাদ্যের ব্যাপারে একে অন্যের উপরে কতটা নির্ভরশীল।

খাদ্য-পিরামিড ঃ

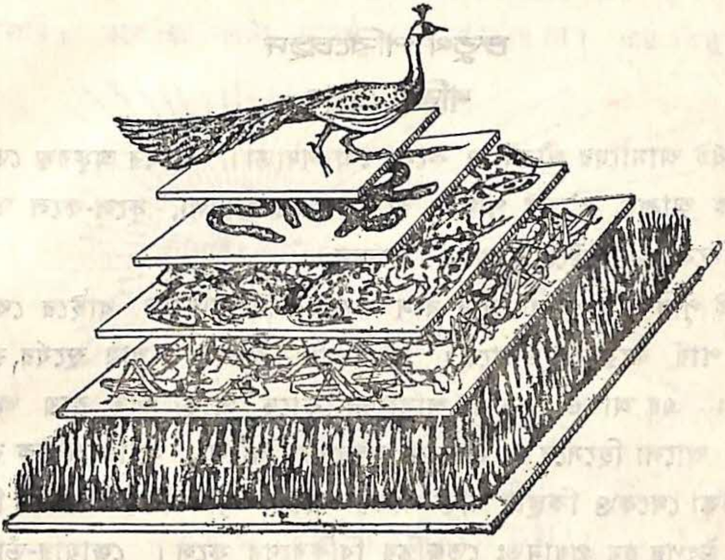
পরিবেশ-তন্ত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল, খাদ্য-উৎপাদক এবং খাদকসমূহের মধ্যে সংখ্যার অনুপাত। খাদ্য-উৎপাদকের সংখ্যা যত, প্রথম স্তরের খাদক-এর সংখ্যা তার চেয়ে কম হবে, আর তার চেয়েও কম য় দ্বিতীয় স্তরের খাদক-এর সংখ্যা। খাদ্য-উৎপাদককে সবচেয়ে নীচের রে রেখে, তার উপরে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের খাদককে রাখলে যে কাল্পনিক পিরামিড পাওয়া যায়, তাকে খাদ্য-পিরামিড (Food Pyramid) বলা হয়।

ভারতের গির-অরণ্য সিংহদের আবাস। সেখানকার খাদ্য-পিরামিডের ভূমিতে আছে লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ্ (ঘাস), তার উপরে আছে কয়েকশ' হরিণ, খরগোশ, শূয়োর প্রভৃতি শাকাশী প্রাণী, আর সবার উপরে আছে একটি মাত্র সিংহ (চিত্র-৪১)।

উদ্ভিদ্ (ঘাস)→শাকাশী প্রাণী (হরিণ, খরগোশ ইঃ)→মাংসাশী প্রাণী (সিংহ)
(খাদ্য-উৎপাদক) (প্রথম স্তরের খাদক) (দ্বিতীয় স্তরের খাদক)



চিত্র ৪১। একটি খাদ্য-পিরামিড, যার শীর্ষে আছে একটি সিংহ।



চিত্র ৪২। একটি খাদ্য-পিরামিড, যার শীর্ষে আছে একটি ময়ূর।

তেমনি চিত্র ৪২ আর একটি খাদ্য-পিরামিড, যার শীর্ষে আছে একটি ময়ূর। এক্ষেত্রে খাদ্য-শৃঙ্খল এইরূপ ঃ—

ঘাস→কীট-পতঙ্গ→ব্যাঙ→সাপ→ময়ূর।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, অজৈব অথবা জৈব যে-কোন রকম উপাদানের অভাব ঘটলে, তার উপরে নির্ভরশীল জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। মরুভূমিতে জলাভাব, তাই সেখানে গাছপালা বিশেষ জন্মাতে পারে না। আর গাছপালা না থাকায়, সেখানে শাকাশী প্রাণীরা থাকতে পারে না। আবার শাকাশী প্রাণীরা থাকে না ব'লে, সেখানে মাংসাশী প্রাণীরাও থাকতে পারে না। তুষারাবৃত মেরু-অঞ্চলের অবস্থাও অনেকটা এই রকম। অপরদিকে গভীর অরণ্যে, যেখানে নানারকম সবুজ উদ্ভিদের সমারোহ, ফুল-ফলের প্রাচুর্য, সেখানেই সাধারণতঃ হরেক রকম প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া যায়।

জীব-জগতে একটা ভারসাম্য (balance) থাকে। প্রকৃতি কোন জীবকেই বেশী বাড়তে দেবে না। তাই পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। এজন্য কোনো জীবই সংখ্যায় বেশী বাড়তে পারে না। আবার সহজে নির্মূল হয়েও যায় না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শক্তির প্রবাহ

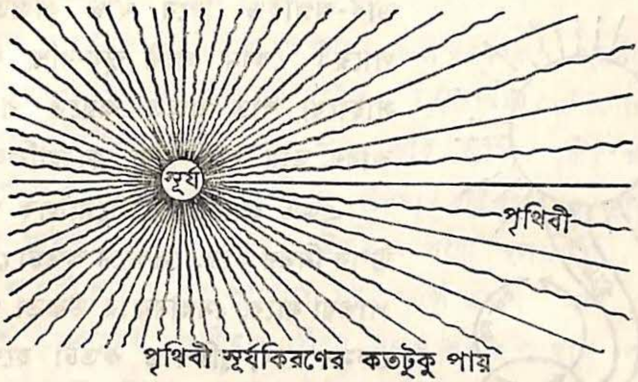
সূর্যই আমাদের জীবন ও কর্মের প্রেরণদাতা। সূর্যের অফুরন্ত তেজ-শক্তিকে আশ্রয় ক'রেই পৃথিবী হয়েছে শস্য-শ্যামলা, ফুলে-ফলে ভরা, দিকে দিকে জেগে উঠেছে প্রাণের স্পন্দন।

এই পৃথিবীতে যে-সব জীব বাস করে, তারা পৃথিবীর বাইরে থেকে শক্তি পায় কয়েকটি উপায়ে। শক্তি প্রধানতঃ পাওয়া যায় সূর্যের রশ্মি থেকে। এর আরও কিছুটা আমাদের কাছে প্রতিফলিত হয়ে আসে চাঁদের আলো হিসেবে। এছাড়া নক্ষত্রের আলো, মহাজাগতিক রশ্মি এবং উল্কা থেকেও কিছুটা শক্তি পাওয়া যায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কিছু শক্তি উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে। জোয়ার-ভাঁটার ঘর্ষণের ফলে পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি ক্রমশঃ মন্থর হয়ে আসছে, আর সেজন্যও কিছুটা শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। আর আছে, যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বুকে সঞ্চিত জ্বালানি সম্পদ—কয়লা এবং খনিজ তেল। এসব পুড়িয়েও মানুষ প্রচুর শক্তি অর্জন করছে। কিন্তু প্রতিদিনের অর্জিত সৌর-শক্তির তুলনায় এসব দ্বিতীয় পর্যায়ের শক্তির পরিমাণ অতি নগণ্য। কারণ, মোট শক্তির ৯৯.৯৯৮ শতাংশ শক্তিই পাওয়া যায় সৌর-শক্তি থেকে।

সূর্য যেন একটি বিশাল আগুনের কুণ্ডের মতো সব সময় দাউ দাউ করে জ্বলছে। যুগ যুগ ধরে এথেকে প্রচণ্ড তাপ এবং চোখ-ঝলসানো আলো বেরুচ্ছে। এর কোন বিরাম নেই।

গ্রীষ্মকালে দুপুরে ঘরে থেকেই গরমে ছটফট করতে হয়, একবার রোদে দাঁড়ালেই বোঝা যাবে, কি রকম অসম্ভব গরম! সূর্য থেকে এত দূরে থাকা সত্ত্বেও এতটা তাপ পাওয়া যাচ্ছে, এথেকেই বোঝা যাবে, সূর্যের তাপটা কেমন ভয়ঙ্কর! জ্বলন্ত সূর্য থেকে যে প্রচণ্ড তেজ-রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তার অতি সামান্য অংশ (প্রায় ২২০ কোটি ভাগের ১ ভাগ) এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। কিন্তু এতটুকুই কি ভয়ঙ্কর

তার হিসেব বিজ্ঞানীরা করেছেন। এর পরিমাণ বছরে প্রায় $১২\cdot৩ \times ১০^{২৩}$ ক্যালরি। তবে এর সবটা ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় না। এর কিছু অংশ



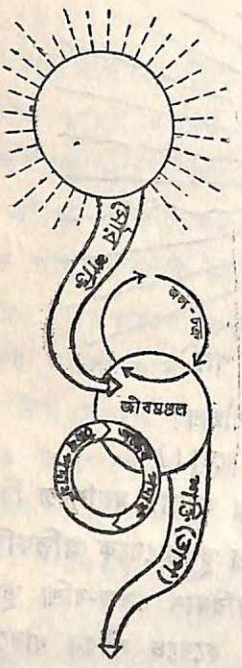
চিত্র ৪৩। সূর্যকিরণের কতটুকু পৃথিবীতে পৌছায়!
(সূর্যের তুলনায় পৃথিবী একটি বিন্দুর মতো।)

মেঘ, ধূলি, ধোঁয়া প্রভৃতিতে প্রতিফলিত হয়ে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। আর যেটুকু পৌঁছায়, তারও কিছু আবার ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে চলে যায়। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ তেজ-রশ্মি ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছায়, তারই ফলে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা হয়েছে জীবন ধারণের অনুকূল। বিভিন্ন ঋতুতে এই উষ্ণতা কিছুটা ওঠা-নামা করলেও তা জীবের সহ্য-সীমার মধ্যেই থাকে। আর সেজন্যই পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়ই উদ্ভিদ্ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়।

যতটা তেজ-রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছায়, তার এক সামান্য অংশ এসে পড়ে সবুজ উদ্ভিদের উপরে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, সূর্য থেকে পৃথিবীতে যত তেজ-রশ্মি এসে পড়ে, তার ০'১ শতাংশ মাত্র সবুজ উদ্ভিদ কাজে লাগাতে পারে। এর পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪×১০^{১৩} ক্যালরি!

এইভাবে উদ্ভিদ্ যে পরিমাণ সৌর-শক্তি কাজে লাগাতে পারে, তার $\frac{১}{৬}$ ভাগ নিজস্ব বিপাকীয় কার্যকলাপে ব্যয়িত হয়, বাকি $\frac{৫}{৬}$ ভাগ পাওয়া যায় অন্যান্য খাদক বা ব্যবহারকারীদের (consumers) জন্য। এর কিছুটা অপচয় হয় দাবানলের ফলে, আর কিছুটা মানুষ নষ্ট করে গাছপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার ক'রে।

সবুজ উদ্ভিদে সবুজ ক্লোরোফিল থাকে, তাই তা সূর্য-রশ্মি ধরে কাজে লাগাতে পারে। আর তারই সাহায্যে মাটির রস এবং বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। কোন প্রাণী সূর্য-রশ্মি ধরে তার সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। কারণ, তার দেহে সবুজ ক্লোরোফিল নেই।



চিত্র ৪৪। শক্তির প্রবাহ।

একটি জায়গার ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে, সেখানে কতটা সৌর-শক্তি পাওয়া যাবে, সেখানকার উষ্ণতা ও জলবায়ু কেমন হবে, বৃষ্টিপাত কতটা হবে! আর তারই উপর নির্ভর করে, সেখানকার উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-জীবন কেমন হবে।

সবুজ উদ্ভিদ্ সূর্যের আলোয়, মাটির রস এবং বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এইভাবে গাছ সূর্যালোক থেকে প্রচুর শক্তি আহরণ করে। খাদ্য-উৎপাদকের দেহে আবদ্ধ শক্তি শাকাশী প্রাণীর, অর্থাৎ প্রথম স্তরের খাদকের বা ব্যবহারকারীর, দেহে যায়। সেখান থেকে যায় দ্বিতীয় স্তরের খাদকের বা ব্যবহারকারীর (অর্থাৎ, মাংসাশী প্রাণীর) দেহে। এইভাবে শক্তির প্রবাহ হতে থাকে।

শক্তির প্রবাহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯৪২ সালে বিজ্ঞানী লিণ্ডেমান (Lindeman) বলেছেন,—প্রাপ্ত সৌর-শক্তির ১০ শতাংশ প্রথম স্তরের খাদকের দেহ-গঠনের কাজে লাগে। তার থেকে পরবর্তী স্তরের খাদকের দেহেও একই অনুপাতে শক্তির সদ্ব্যবহার হয়। যেমন, একটি হরিণ বা গরু যদি ১০০ কিলোগ্রাম খাদ্য (ঘাস-পাতা) খায়, তাহলে তার দেহের মেদ-মাংস গঠিত হবে ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ১০ কিলোগ্রাম। আবার একটি বাঘ ১০ কিলোগ্রাম হরিণ বা গরুর মাংস খেলে, তার দেহের মেদ-মাংস গঠিত হবে মাত্র ১ কিলোগ্রাম। একেই 'দশ শতাংশ নিয়ম' (Ten

percent law) বলা হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, খাদ্য-উৎপাদক থেকে যতই উপরের দিকে ধাপে ধাপে শক্তির প্রবাহ ঘটে, শক্তির অনুপাত ততই কম হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। সূর্যের প্রখর তাপে প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ ঘন মাইল (1,00,000 cubic miles) পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হয়, এবং পরে তাই আবার বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে। সমুদ্র-পৃষ্ঠে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তার চেয়ে ৯,০০০ ঘন মাইল পরিমাণ বেশী বৃষ্টির জল পড়ে স্থলভাগে। তারই ফলে এই পৃথিবী হয়েছে শস্য-শ্যামলা, ফুলে-ফলে ভরা। আর যেখানে উদ্ভিদ্ আছে, সেখানেই প্রাণীরাও জীবন ধারণ করার সুযোগ পাচ্ছে। মরুভূমি বা বরফের দেশে, যেখানে উদ্ভিদ্ নেই, সেখানে প্রাণীও নেই। সে-সব জায়গায়ও প্রচুর সূর্যকিরণ পরে, একথা ঠিক, কিন্তু তা কারও কোনো কাজে লাগে না!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সবুজ উদ্ভিদ্ আমাদের পরম সুহৃদ

বর্তমানে মানুষই হ'ল এই পৃথিবীর অধিপতি। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্বত্রই তার অবাধ গতিবিধি। মোট সংখ্যা এবং ওজন সব দিক দিয়েই, একমাত্র মাছ ছাড়া, আর সকল প্রাণীকেই সে এখন ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু একদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, সে নগণ্য শেওলার চেয়েও অধম। কারণ, ক্ষুদ্রতম সবুজ শেওলাটিও নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি ক'রে নিতে পারে, কিন্তু মানুষ তা পারে না। খাদ্যের ব্যাপারে মানুষ একান্তভাবে পরনির্ভরশীল। তার প্রয়োজনীয় সবরকম খাদ্যই তাকে সংগ্রহ করে নিতে হয় অপর কোনো উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর কাছ থেকে।

এই পৃথিবীতে, কিংবা অপর কোনো গ্রহে, সবুজ উদ্ভিদ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কোনো জীবের অস্তিত্বের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কারণ, বিজ্ঞানীরা বলেন যে, একমাত্র সবুজ উদ্ভিদের পক্ষেই অজৈব উপাদানসমূহ থেকে জীবন-ধারণের জন্যে অত্যাবশ্যক কার্বোহাইড্রেট (carbohydrates), প্রোটিন (proteins) এবং স্নেহ-পদার্থ (fats)—জাতীয় জৈব যৌগগুলি প্রস্তুত করা সম্ভব। আর একাজের প্রধান সহায়ক হ'ল সৌর-শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার। বিজ্ঞানীরা শত চেষ্টা করেও আজ অবধি ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে এই বিক্রিয়া সম্পাদন করতে সক্ষম হন নি। অথচ কী আশ্চর্য, সুবিশাল মহীরুহ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষুদ্রতম শেওলাটি পর্যন্ত প্রতিটি সবুজ উদ্ভিদ্ প্রতিদিন কত সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে এই বিক্রিয়া সাধন ক'রে চলেছে!

বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই পৃথিবীতে সবুজ উদ্ভিদের সহায়তায় প্রতি বছর প্রায় ১৫০ মহাপদ্ম টন কার্বন ২৫ মহাপদ্ম টন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তার ফলে ৪০০ মহাপদ্ম টন অক্সিজেন মুক্ত হয়। ✝ অনেকেই হয়তো জানেন না যে, এর প্রায় ৯০ শতাংশ বিক্রিয়াই

✝ এক মহাপদ্ম = 1 billion = 10^{12}

সম্পাদিত হয় সমুদ্রে, জলের তলায়, নানাপ্রকার জলজ উদ্ভিদের, বিশেষ করে সবুজ শেওলার, সহায়তায়। আর বাকি ১০ শতাংশ সম্পাদিত হয় ডাঙ্গায়, নানাপ্রকার সবুজ উদ্ভিদের সহায়তায়।



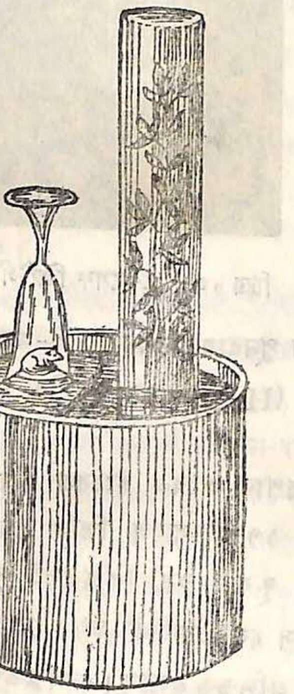
চিত্র ৪৫। যোসেফ প্রিস্টলী।

এইভাবে সংশ্লেষিত জৈব পদার্থ-সমূহের অতি সামান্য অংশই পরে ব্যবহৃত হয় নানারকম প্রাণীর খাদ্য হিসেবে। সে তুলনায় অনেক বেশী অংশ ব্যয়িত হয় ঐসব উদ্ভিদেরই শ্বাসক্রিয়া এবং অন্যান্য জৈবনিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য। তবে মৃত উদ্ভিদ এবং পাতার পচনের ফলে বেশীর ভাগ জৈব পদার্থ ই বিয়োজিত হয়ে পুনরায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস (CO_2), জল (বা, জলীয় বাষ্প) (H_2O) এবং বিবিধ লবণে পরিণত হয়ে যায়।

সালোক-সংশ্লেষ সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী যোসেফ প্রিস্টলী (Joseph priestly)। ১৭৭২ সালে তিনি ঘোষণা করেন,—"মোমবাতি জ্বলার দরুন বাতাস দূষিত হয়, কিন্তু সেই দূষিত বাতাসকে পরিশুদ্ধ করার এক সার্থক প্রয়াস যে প্রকৃতিই ক'রে রেখেছে, দৈবাৎ এই তথ্য আবিষ্কার ক'রে আনন্দে অভিভূত হলাম। প্রকৃতপক্ষে কাজটা করে উদ্ভিদ। এরূপ ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক যে, যেহেতু উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই বাতাসের প্রয়োজন হয়, সেহেতু উভয়েই একই পদ্ধতিতে বাতাসকে দূষিত করে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আমারও এইরকমই ধারণা ছিল, যখন আমি একটি ছোট্ট মিণ্ট-গাছ (Mint= aromatic kitchen herb) একটি কাচের জার দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। কিন্তু গাছটি যখন এইভাবে মাসের পর মাস ধরে বড় হতে লাগল, তখন আমি দেখলাম যে, জারের ঐ বাতাস না পারলো জ্বলন্ত মোমবাতি নেভাতে, না পারলো একটি জ্যান্ত ইঁদুরের কোনরকম অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাতে।"

এই সামান্য কয়েকটি কথায় প্রিস্টলী একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার বর্ণনা দেন। বলা বাহুল্য, উদ্ভিদ্ যে মুক্ত অক্সিজেন তৈরি করতে সক্ষম, এ তথ্য তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।

এর সাত বছর পরে অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী ইয়ান ইংগেন-হাউস (Ian Ingen-House) এই ঘটনার আর একদিকে আলোকপাত করেন। ১৭৭৯ সালে একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন,—"ডঃ প্রিস্টলীর পরীক্ষায় যেমন দেখা গেছে, আমিও সেরকম দেখলাম যে, উদ্ভিদ আট-দশ দিনের মধ্যেই দূষিত বাতাসকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। তবে এই শোধন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে উদ্ভিদের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। এই বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা উদ্ভিদের, একথা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, উদ্ভিদের উপর সূর্যালোকের ক্রিয়ার ফলেই একাজ সংঘটিত হয়।...আমি দেখলাম, পরিষ্কার দিনে সূর্যালোকের পরিমাণ যত বাড়ে, এই প্রক্রিয়াও তত দ্রুত সংঘটিত হয়, অপরাহ্নে তা ক্রমশঃ কমে আসে, আর সূর্যাস্তের পরে এই প্রক্রিয়া একেবারে থেমে যায়। আরো দেখলাম, গোটা গাছটি নয়, শুধু সবুজ পাতা এবং সবুজ ডালপালাই এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ ক'রে থাকে।"



চিত্র ৪৬। যোসেফ প্রিস্টলীর পরীক্ষা।

এইভাবে আবিষ্কৃত হ'ল যে, সালোক-সংশ্লেষের জন্য সূর্যালোক এবং উদ্ভিদের সবুজকণা বা ক্লোরোফিল সমভাবেই প্রয়োজন। এর অল্পদিন পরেই আর একটি নতুন তথ্য সংযোজিত হ'ল। ১৭৮২ সালে জেনেভার পাদরি জ্যাঁ সেনেবিয়ার (Jean Senebier) বললেন,—"বাতাসে স্থির-বায়ুর (fixed air) (অর্থাৎ, কার্বন ডাই-অক্সাইডের) পরিমাণ মাত্র

•'০৩ শতাংশ। কিন্তু বাতাস থেকে এই সামান্য গ্যাসটুকু অপসারিত ক'রে নিলেই দেখা যাবে যে, অক্সিজেন উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে।"

এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফরাসী বিজ্ঞানী আঁতোয়ান ল্যাভয়সিয়ার (Antoine Lavoisier) বললেন,—"সূর্যালোকে সবুজ উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে এবং তারপর অক্সিজেন পরিত্যাগ করে।"

এখন প্রশ্ন, তাহলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অপর উপাদান কার্বন-এর কী হয়? এর সঠিক উত্তর দিলেন ইংগেন-হাউস। ১৭৯৬ সালে তিনি বললেন,—"উদ্ভিদের পুষ্টির প্রধান উপাদান হ'ল কার্বন। অর্থাৎ, সালোক-সংশ্লেষ যে শুধু মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর হিতার্থেই সম্পাদিত হয়, তা নয়, এই প্রক্রিয়াটি হয় প্রধানতঃ উদ্ভিদসমূহের নিজেদের স্বার্থেই।"

১৮০৪ সালে জেনেভার আর এক বিজ্ঞানী নিকোলাস থিওডোর দ্য সসার (Nicholas Theodore de Saussure) আর একটি হারানো সূত্রের সন্ধান দিলেন। তিনি বললেন,—"সালোক-সংশ্লেষের জন্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া জলেরও প্রয়োজন হয়। আর সূর্যালোকে, উদ্ভিদের সবুজকণার সহায়তায়, এই দু'টি উপাদান থেকেই তৈরি হয় জৈব পদার্থ এবং অক্সিজেন।"

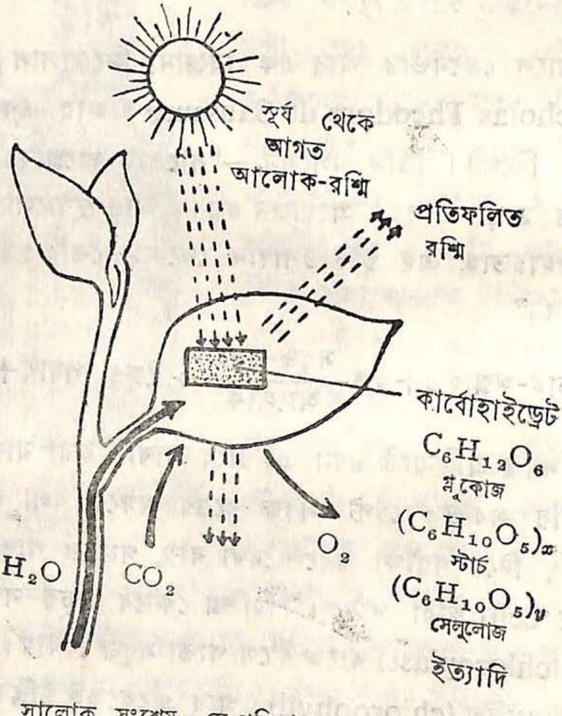
$$\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড} + \text{জল} \xrightarrow[\text{আলোক}]{\text{সবুজ-কণা}} \text{জৈব পদার্থ} + \text{অক্সিজেন।}$$

তাহলে সমস্ত প্রক্রিয়াটি এখন এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। গাছের শাখা-প্রশাখায় অবস্থিত চেপ্টা সবুজ রঙের অঙ্গকে বলা হয় পাতা। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, গাছের পাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কোষ (cell) দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন কোষে প্রচুর সবুজ-কণা বা ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast) থাকে ব'লে পাতা সবুজ দেখায়। এর প্রধান উপাদান ক্লোরোফিল (chlorophyll)। আর এ থেকেই উদ্ভিদ-জগতে যত প্রকার বৈচিত্র্যের উদ্ভাবন হয়েছে। এমনিতে ক্লোরোফিল নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যে শক্তি নিষ্ক্রিয় ক্লোরোফিলকে সক্রিয় ক'রে তুলতে পারে, তা কেবলমাত্র সূর্য-রশ্মি থেকেই পাওয়া সম্ভব। সূর্যের সেই শক্তি গ্রহণ

ক'রেই ক্লোরোফিল উদ্ভিদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পন্ন করে। প্রাণীদেহে সবুজ-কণা বা ক্লোরোফিল থাকে না, এজন্য প্রাণীরা সূর্য-রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারেনা।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, যে পরিমাণ আলোক-রশ্মি সবুজ পাতায় পড়ে, তার ৮০ শতাংশ অবশোষিত হয়, ১৫ শতাংশ প্রতিফলিত হয়, আর প্রায় ৫ শতাংশ বায়ুমণ্ডলে বিনষ্ট হয়। আবার, অবশোষিত রশ্মির মাত্র ২০ শতাংশ কাজে লাগিয়ে সবুজ-পাতা সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়া (photosynthesis) সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

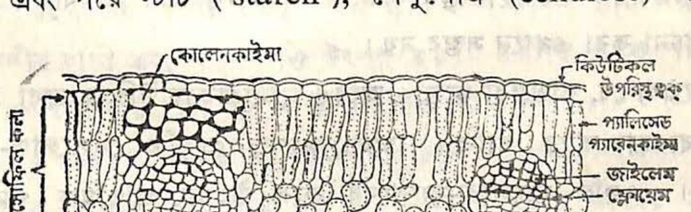
সূর্য-রশ্মি থেকে প্রাপ্ত শক্তির সহায়তায়, সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল



চিত্র ৪৭। সালোক সংশ্লেষ—যে পরিমাণ আলোক-রশ্মি সবুজ পাতায় পড়ে, তার ৮০ শতাংশ অবশোষিত হয়, ১৫ শতাংশ প্রতিফলিত হয়, আর প্রায় ৫ শতাংশ বায়ুমণ্ডলে বিনষ্ট হয়। আবার, অবশোষিত রশ্মির মাত্র ২০ শতাংশ কাজে লাগিয়ে সবুজ পাতা সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে।

বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং মাটি থেকে প্রাপ্ত জলের উপাদান দিয়ে কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate) বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে, আর সেই সঙ্গে অক্সিজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেয়। এজন্য প্রতিটি গাছের প্রত্যেকটি পাতাই চায় বেশী ক'রে আলোক-রশ্মি পেতে। তাইতো দেখা যায়, একটি গাছের সকল পত্রপল্লব, এক জায়গায় স্তূপীকৃত অবস্থায় না থেকে, ডালপালার উপরে নানা ভঙ্গিমায় অবস্থান করে, যাতে প্রত্যেকের পক্ষেই যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ আলো পাওয়া সম্ভব হয়। যে লতাটি দুর্বল, সেও নীচে অন্ধকারে পড়ে থাকে না, অন্য কোনো সবল বৃক্ষকে অবলম্বন ক'রে ধীরে ধীরে উপরদিকে এগিয়ে যায় আলোর সন্ধানে।

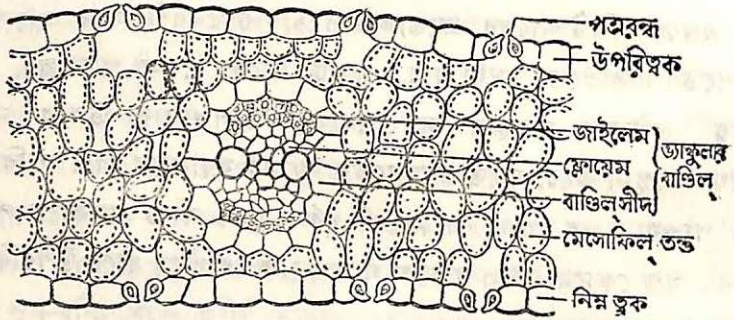
গাছের পাতায় অনেক রন্ধ্র বা ছিদ্র আছে। পাতার উপর সূর্যকিরণ পড়লে এ-সব ছিদ্রের মুখ খুলে যায়, এবং বায়ুর সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। এই গ্যাস মাটি থেকে সংগৃহীত রসের সঙ্গে মিশে যায়। সূর্যকিরণ এবং সবুজ-কণার সাহায্যে তা থেকে কার্বন-ঘটিত খাদ্য তৈরী হয়, আর অক্সিজেন গ্যাস পাতার ছিদ্রপথে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়। এভাবে প্রথমে শর্করা (যেমন—গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা-শর্করা) এবং পরে স্টার্চ (starch), সেলুলোজ (cellulose) প্রভৃতি



চিত্র ৪৮। দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার প্রস্থচ্ছেদ (বিবর্ধিত)।

কার্বোহাইড্রেট তৈরী হয়। একেই বলা হয় সালোক-সংশ্লেষ (photo-synthesis) বা অঙ্গার-আত্তীকরণ-প্রক্রিয়া (carbon-assimilation)। পাতা যেন উদ্ভিদের রান্নাঘর। এখানে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত হয়। উদ্ভিদ

তাই খেয়ে জীবন ধারণ করে। তবে এখানে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, তার সবটা তখনই খরচ হয় না। উদ্‌বৃত্ত অংশ উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন



চিত্র ৪৯। এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার প্রস্থচ্ছেদ (বিবর্ধিত)।

স্থানে অবস্থিত ভাঁড়ার-ঘরে সঞ্চিত থাকে, ভবিষ্যতের জন্য। এইসব সঞ্চিত খাদ্যই মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী তাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার ক'রে থাকে।

উপরিউক্ত বিক্রয়াটি সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ—

$$nCO_2 + nH_2O \rightarrow (CH_2O)n + nO_2$$

প্রকৃতপক্ষে বিক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল, এবং অনেকগুলি ছোটখাট বিক্রিয়ার ফলে কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হয়। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য যে, খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও আরও নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আমরা নিত্য ব্যবহার ক'রে থাকি। তুলো, কাগজ প্রভৃতি সেলুলোজ-জাতীয় পদার্থ। এগুলি সালোক-সংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন প্রাথমিক পদার্থেরই পরিবর্তিত রূপ। এছাড়া চা, কফি, কোকো, নানাপ্রকার ভেষজ ওষুধ, তেল, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি কত জিনিস আমরা ব্যবহার করি। সালোক-সংশ্লেষের ফলে উদ্ভিদ-দেহে যে-সব কাঁচামাল (raw materials) উৎপন্ন হয়, উদ্ভিদ তার নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে সেই সব কাঁচামালের সদ্ব্যবহার ক'রেই যেন ঐসব জিনিস আমাদের জন্য তৈরি ক'রে রাখে।

সূর্য থেকে যে-সব শক্তি নিয়ত বিকীর্ণ হয়, তার মধ্যে শুধু আলোক-শক্তিকেই সবুজ পাতা গ্রহণ করে এবং নিজদেহে নানাভাবে সঞ্চয় ক'রে

রাখে। পরে তা থেকেই পাওয়া যায় রাসায়নিক শক্তি—তাপ শক্তি। সভ্য মানুষ অগ্নি উৎপাদনের জন্য যে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করে, তা গাছেরই সঞ্চিত পদার্থ। অনেকেই হয়তো বলবেন যে, বর্তমান সভ্য-জগৎ কাঠের চেয়ে কয়লা ও খনিজ তেলের উপরে অনেক বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এগুলিও আদিযুগের উদ্ভিদ এবং সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত (Bottom-ooze) নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর (প্ল্যাঙ্কটনের) দেহাবশেষ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, প্রতিটি প্রাণীই বেঁচে থাকার জন্যে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে। এসময় বায়ুর অক্সিজেন গৃহীত হয়, এবং তারই সাহায্যে কোষে কোষে মৃদু-দহনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এর ফলে প্রাণীদেহে শক্তির সৃষ্টি হয়। সেই শক্তির সাহায্যেই প্রাণীরা অঙ্গ-সঞ্চালন ক'রে জীবনী-শক্তির পরিচয় দেয়। শ্বাসকার্যের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। প্রাণীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে এগুলি বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়।

উদ্ভিদও পাতার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। প্রধানতঃ পাতার ছিদ্রপথে বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করে। এই অক্সিজেনের সাহায্যে উদ্ভিদের কোষে কোষে মৃদু-দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর তার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, জলীয় বাষ্প এবং তাপ-শক্তি উৎপন্ন হয়। এইসব গ্যাস পাতার ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়, আর ওই শক্তি উদ্ভিদের কাজে লাগে।

উদ্ভিদের শ্বাসকার্য দিনরাত সমানভাবে চলে। এজন্য সবুজ-কণা বা সূর্য-কিরণের কোনো প্রয়োজন হয় না। দিনের বেলা পাতার মধ্যে সালোক-সংশ্লেষ বা অঙ্গার-আত্তীকরণ-প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত চলতে থাকে ব'লে শ্বাসক্রিয়া যেন ঢাকা পড়ে যায়। রাতের বেলা, আলোর অভাবে, অঙ্গার-আত্তীকরণ-প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে, তাই তখন শুধু শ্বাসক্রিয়া বোঝা যায়। এসময় কেবল অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প পরিত্যক্ত হয়।

শ্বাসকার্যের ফলে উদ্ভিদ যে শক্তি অর্জন করে, তার সাহায্যেই সে কার্বো-হাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এই খাদ্যই পরে,

শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে, ইন্ধনের মতো কাজ করে। উদ্ভিদ প্রাণীদের মতো অঙ্গ-সঞ্চালন করতে পারে না, তাই তার নিজের জন্যে বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না। মানুষ এবং তৃণভোজী প্রাণীরা উদ্ভিদ-দেহের এই সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় ক'রে মহানন্দে চলে বেড়ায়। একদিকে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শক্তি সঞ্চয় করে, অন্যদিকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা, প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে, তারই ধ্বংস-সাধন করে। একের ক্ষতি, তাই অপরের সমৃদ্ধি। উদ্ভিদ অচল, আর তারই বিনিময়ে আমরা সচল। প্রকৃতির এ এক নির্মম পরিহাস!

আর একটি কথা। যে কোন জীবের শ্বাসক্রিয়ার সময় অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে বাতাস অবিরত কলুষিত হচ্ছে। কিন্তু সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ ক'রে অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে দূষিত বাতাস পুনরায় শোধিত হয়।

সবুজ উদ্ভিদই প্রধানতঃ প্রাণী-জগতে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে। শুধু তাই নয়, জীবজগতের প্রতিটি জীবের শ্বাসক্রিয়ার ফলে বাতাস অবিরত কলুষিত হয়, আর সবুজ উদ্ভিদ সেই দূষিত বাতাসকে অবিরত কলুষমুক্ত করে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, সবুজ উদ্ভিদ আমাদের পরম সুহৃদ্। কিন্তু তবুও অকৃতজ্ঞ মানুষ প্রতিনিয়ত গাছপালা ধ্বংস ক'রে চলেছে। বলা যায় না, উদ্ভিদ হয়তো একদিন এই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরে গিয়ে এর নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সেদিন মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রবে, উদ্ভিদ্ তার কত বড় সুহৃদ্ ছিল!

দ্বিতীয় পর্ব

পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাটি

ভূপৃষ্ঠের পাষাণময় স্তর ছাড়া শিলাচুর্ণ দিয়ে তৈরি যেসব কোমল স্তর আছে, তারই নাম মাটি। মাটির একটি বিশেষ গুণ এই যে, তা বেশ খানিকটা জল ধরে রাখতে পারে। স্থলভাগ অনেক ক্ষেত্রে জলাধারের মতো কাজ করে, এবং বেশ খানিকটা জল সঞ্চয় ক'রে রাখে, তাই স্থলভাগের অধিকাংশ স্থানে উদ্ভিদ জন্মাতে পারে। আর উদ্ভিদই বিভিন্ন রকম প্রাণীর প্রাণ ধারণের সুযোগ ক'রে দেয়।

তাই অনেকেই বলেন যে, মাটি যেন আমাদের মা-টি। কারণ প্রকৃতপক্ষে মাটিই প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদকে, এবং পরোক্ষভাবে, এই পৃথিবীর সকল জীবকেই লালন-পালন করছে।



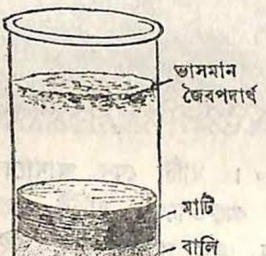
চিত্র ৫০। মাটি যেন আমাদের মা-টি। কারণ, প্রকৃতপক্ষে মাটিই প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদকে, এবং পরোক্ষভাবে, এই পৃথিবীর সকল জীবকেই লালন-পালন করছে।

মাটির উৎপত্তি ঃ

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক কারণে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হয়। শিলা অত্যন্ত কঠিন, এবং দেখে মনে হয় যে, তার কোনো ক্ষয় নেই। কিন্তু সূর্যের তাপে, জলের প্রভাবে, ঝড়-বাতাসে এবং আরও অনেক কিছুর জন্যে উপরের শিলা ক্রমাগত ভেঙ্গে-চুরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে মিশছে জীব-জন্তুর দেহ-নির্যাস (অর্থাৎ, দেহের সার পদার্থ), অথবা দেহাবশেষ (অর্থাৎ, দেহের অবশিষ্ট অংশ)। এর ফলে তার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হচ্ছে ক্রমাগত। এভাবেই পৃথিবীর বুকে তৈরি হচ্ছে মাটি।

মাটি তাই অজৈব এবং জৈব এই দু'রকম পদার্থের মিশ্রণে গঠিত হচ্ছে। মাটির অজৈব উপাদান হচ্ছে মিহি মাটি, বালি, কাঁকর এবং নানারকম ধাতব লবণ। আর জৈব উপাদানের সৃষ্টি হয় গাছপালা এবং নানাপ্রকার জীবজন্তুর পচনশীল ও গলিত দেহ, মল-মূত্র প্রভৃতি থেকে।

একটি সহজ পরীক্ষা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে। বাগান থেকে খানিকটা মাটি সংগ্রহ ক'রে এনে তা একটি কাচের পাত্রে রাখা হ'ল। এর মধ্যে খানিকটা জল ঢেলে এবং একটা কাচের কাঠি দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে তারপর রেখে দেওয়া হ'ল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখা যাবে যে, অদ্রবণীয় ভারি পদার্থগুলি ক্রমশঃ নীচে থিতিয়ে পড়েছে, আর হাল্‌কা পদার্থগুলি জলের উপরে ভেসে উঠেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সকলের নীচে জমেছে কাঁকর, তার উপরে বালি এবং তার উপরে কাদা-মাটি। আর গাছপালা ও জীবজন্তুর দেহাবশেষ (জৈব পদার্থ) হালকা ব'লে জলের উপরে ভেসে উঠেছে।



চিত্র ৫১। অদ্রবণীয় ভারি পদার্থগুলি ক্রমশঃ নীচে থিতিয়ে পড়েছে, আর হালকা পদার্থগুলি জলের উপরে ভেসে উঠেছে।



চিত্র ৫২। পাত্রে খানিকটা সাদা গুঁড়ো পড়ে রয়েছে।

একটা চামচ দিয়ে উপর থেকে ভাসমান ময়লাগুলি সরিয়ে ফেলা হ'ল। উপরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জলীয় দ্রবণটি, আস্রাবণ-প্রক্রিয়া অনুযায়ী, একটি পাত্রে ঢেলে নেওয়া হ'ল। তারপর পরিস্রাবণ-প্রক্রিয়া অনুসারে সমস্ত অদ্রবণীয় ময়লা অপসারিত করা হ'ল।

এইভাবে যে পরিস্রুত দ্রবণটি পাওয়া গেল, তা একটি ঘড়ি-কাচ (clock-glass)-এর উপরে নিয়ে, তা একটি বালি-উষ্মক (sand-bath)-এর উপরে রেখে, উত্তাপ দিয়ে শুকিয়ে ফেলা হ'ল। দেখা যাবে, ঐ পাত্রে খানিকটা সাদা গুঁড়ো পড়ে রয়েছে। মাটিতে যে-সব ধাতব লবণ আছে, তাদের অধিকাংশই জলে দ্রবণীয়, তাই জলীয় দ্রবণ থেকে সেগুলি ফিরে পাওয়া গেছে।

মাটির প্রকারভেদ ঃ

উৎপত্তি অনুসারে মাটি দু'রকম ঃ—

(ক) **স্থানীয় মাটি**—প্রাকৃতিক শক্তি আর জৈব পদার্থের সহযোগে পাথর ক্ষয়ে যে মাটি তৈরি হয়, এবং তা যতক্ষণ সেই একই জায়গায় থাকে, ততক্ষণ তাকে স্থানীয় মাটি বলে। সাধারণতঃ এই মাটির স্তর বিশেষ গভীর হয় না। এর একটু নীচেই পচা পাথর ও কঠিন পাথরের স্তর পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সাঁওতাল পরগণা অথবা ছোট-নাগপুরে এরকম মাটি দেখা যায়।

(খ) **স্থানান্তরিত মাটি**—যে মাটি জল অথবা বায়ুর প্রভাবে উৎপত্তি স্থান থেকে অন্যত্র সরে গিয়ে সেখানে জমা হয়ে থাকে, তাকে বলে স্থানান্তরিত মাটি। পূর্ববঙ্গের মাটি এরকম, তাই সেখানে গভীর কুয়ো খুঁড়লেও পাথর পাওয়া যায় না।

আর প্রকৃতি অনুসারে মাটি নানারকম ; যেমন—

(১) **এঁটেল মাটি**—এই মাটির ৭০—৮০ শতাংশ কাদা-মাটি আর অজৈব পদার্থ, ১০—২০ শতাংশ বালি, বাকিটা জল। এই মাটি প্রচুর জল ধরে রাখতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে বাতাস বিশেষ প্রবেশ করতে পারে না ব'লে গাছের শিকড় পচে যায়। কাজেই সাধারণভাবে এই মাটি কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী নয়। এই মাটি আলগা ক'রে যথেষ্ট সার মিশিয়ে নিলে, চাষের উপযোগী হয়। তবে বর্ষায় এর উপরে পলিমাটি জমলে, ধান ও যবের চাষ খুব ভালো হয়।

(২) দো-আঁশ মাটি—এতে কাদা-মাটি আর বালির ভাগ প্রায় সমান-সমান থাকে। কাজেই এই মাটি প্রচুর জল শোষণ

ক'রে তা ধরে রাখতে পারে। এই মাটি খুব উর্বর এবং চাষের খুব উপযোগী। এতে ধান, গম, ভুট্টা, সরষে, ডাল, তামাক ইত্যাদি খুব ভালো জন্মে।

(৩) **বেলে মাটি**—এতে প্রায় ৯০ শতাংশ বালি এবং মাত্র ১০ শতাংশ কাদা-মাটি থাকে। এর মধ্যে বাতাসও প্রবেশ করতে পারে। এই মাটি প্রচুর জল শোষণ করে, কিন্তু কাদা-মাটি কম থাকায়, সেই জল ধরে রাখতে পারে না। এই মাটিতে পটল, তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি বেশ ভালো জন্মে।

(৪) **কাঁকর মাটি**—এতে খুব বেশী কাঁকর থাকে, বালির ভাগও নেহাৎ কম নয়। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জায়গায় এই মাটি দেখা যায়। ক্ষেতে আল দিয়ে জল আটকে এই মাটিতে ধান চাষ করা যায়।

(৫) **চুনা মাটি**—প্রায় ১০ শতাংশ চুন থাকে ব'লে এই মাটি বেশ উর্বর হয়। এতে এঁটেল মাটির আঠালো এবং বেলে মাটির শিথিল প্রকৃতির বেশ সামঞ্জস্য হয়েছে। তবে, এ থেকে ভালো ফসল পেতে হলে, প্রচুর জল-সেচের প্রয়োজন হয়।

(৬) **লোনা মাটি**—সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলের মাটি লোনা। এই মাটিতে নারকেল ও সুপারি গাছ ভালো হয়।

(৭) **বোদ বা পচা মাটি**—এই মাটির রং ময়লা, তাই অনেক সময় একে কালো মাটি বলা হয়। এতে প্রচুর জৈব পদার্থ থাকে। সাধারণ কৃষিকাজের পক্ষে এই মাটি ভালো নয়, তবে এতে চা-গাছের চাষ ভালো হয়।

(৮) **লাল মাটি**—এতে লোহার পরিমাণ বেশী থাকে ব'লে এরকম লাল দেখায়। মধ্যে-ভারতের কালো মাটিতেও লোহার পরিমাণ বেশী থাকে। এরকম মাটিতে কার্পাসের চাষ ভালো হয়। পশ্চিমবঙ্গের এইরকম মাটিতে গভীর শালবন দেখা যায়।

উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ ঃ

উদ্ভিদ মাটি থেকে জল এবং জলে দ্রবীভূত যে-সব লবণ-জাতীয় পদার্থ, এবং বায়ু থেকে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে, সেগুলিই তার খাদ্যের প্রধান উৎস।

উদ্ভিদের খাদ্যে যে মৌলিক উপাদানগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক, তাদের সংখ্যা হ'ল দশ। এগুলির নাম—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম এবং আয়রন। উদ্ভিদের সতেজ বৃদ্ধির জন্য উপরিউক্ত মৌলিক উপাদানগুলি অত্যাবশ্যক। উদ্ভিদ বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস থেকে কার্বন ও অক্সিজেন এবং জল থেকে হাইড্রোড্রোজেন ও অক্সিজেন পায়। কাজেই এই তিনটি মৌল পেতে উদ্ভিদের কোন অসুবিধা হয় না। বাকি মৌলিক উপাদানগুলি পাওয়া যায় বিভিন্নরকম লবণ থেকে। এদের যে-কোন একটি বা একাধিক উপাদানের অভাব ঘটলেই উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

সাধারণভাবে বলা যায়,—যে চারা-গাছটি নাইট্রোজেন পায় না, সেটি বিশেষ বড় হয় না, আর তার পাতাও বেশী গজায় না। যেটি আয়রন পায় না তার ক্লোরোফিল ভাল হয় না। ম্যাগ্‌নেসিয়ামের অভাবেও সবুজ ক্লোরোফিল ভাল হয় না। ফস্‌ফরাসের অভাব হলে, ভাল রকম শিকড় গজায় না। পটাসিয়ামের অভাব হলে, পাতার স্থানে স্থানে ব্রাউন দাগ দেখা দেয়, এবং পাতাগুলি ভঙ্গুর হয়ে যায়। ইত্যাদি।

ভাল মাটি কাকে বলে ?

ভাল মাটি বলতে বোঝায় এমন মাটি যাতে উদ্ভিদের খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সবই যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এরূপ মাটিতেই শুধু ভাল ফসল হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী জল-সেচেরও ব্যবস্থা থাকা দরকার। নতুবা বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায় না।

ফসল উৎপাদনের ফলে মাটির উৎপাদিকা-শক্তি কমে যায় ঃ

উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে তার খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি শুষে নেয়। এজন্য যতবার ফসল উৎপাদন করা যায়,

ততবারই মাটির উৎপাদিকা-শক্তি খানিকটা ক'রে কমে যায়। এই ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা না ক'রে, কোনো একটি ক্ষেতে বার বার চাষ-আবাদ করলে, সেই ক্ষেতের সঞ্চিত খাদ্য ক্রমশঃ ফুরিয়ে যায়। তখন খাদ্যের অভাবে উদ্ভিদের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি সম্ভব হয় না ব'লে ফসলও ভাল হয় না। এজন্য কৃষকগণ প্রত্যেকবার ফসল ঘরে তোলার পরে, এবং পুনরায় চাষ-আবাদ শুরু করার আগে, জমির এই ক্ষয়পূরণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে থাকেন। অর্থাৎ, জমিতে প্রয়োজনমত সার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তা না করলে, পরবর্তীকালে ভাল ফসল পাওয়া যায় না।

উদ্ভিদের খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সরবরাহের বিবিধ ব্যবস্থা :

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উদ্ভিদের পুষ্টির জন্যে দশটি মৌলিক উপাদান অত্যাবশ্যক। এজন্য সাধারণতঃ অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট, ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও আয়রনের লবণ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু ফসল উৎপাদন ক'রে তা আমরা অন্যত্র নিয়ে যাই ব'লে ক্ষেতে ক্রমশ এইসব উপাদানের অভাব ঘটে। এজন্য ক্ষেতের উৎপাদিকা-শক্তি ক্রমশ কমে যায়। এই ক্ষয় পূরণ করতে হলে, অর্থাৎ মাটির উৎপাদিকা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে, কিংবা আরো বাড়াতে হলে, বাইরে থেকে উদ্ভিদের খাদ্যের উপাদানগুলি সরবরাহ করতে হয় ; তারই নাম সার।

আবার মাটি অম্লীয়, ক্ষারীয় অথবা নোনা হতে পারে। এজন্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাটি পরীক্ষা ক'রে তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা দরকার।

জমির উৎপাদিকা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, কিংবা তা বৃদ্ধির জন্য, সাধারণতঃ তিন রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হ'ল।

(১) **সাধারণ সার**—জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির জন্য সাধারণ

সার ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে সভ্যতার অতি প্রাচীনকাল থেকেই। আমরা জানি, স্মরণাতীত কাল থেকেই চাষের কাজে, সাধারণ সার হিসেবে, গোময় সার ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এদিক দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত 'কম্পোস্ট' সারই অধিক ফলপ্রদ।

উঁচু ছায়া ঘেরা মাটিতে গর্ত ক'রে গাছপাতা, আগাছা, কচুরিপানা গবাদি পশুর মল-মূত্র ইত্যাদি স্তরে স্তরে সাজিয়ে তাতে মাঝে মাঝে মূত্র অথবা জলের ছিটা দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হয়, এবং মাঝে মাঝে উলটে-পাল্‌টে দিতে হয়। এর ফলে সকল অংশ সমভাবে 'কম্পোস্ট'-এ পরিণত হতে পারে। এটিই চাষের ক্ষেতের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। তাই কৃষকরা সাধারণতঃ এইভাবে সার তৈরি ক'রে নিজ নিজ জমিতে ব্যবহার ক'রে থাকেন।



চিত্র ৫৩। 'কম্পোস্ট'-সার তৈরি করার পদ্ধতি।

(২) **রাসায়নিক সার**—আজকাল সব দেশেই কৃত্রিম রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে। এদের মধ্যে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া, পটাসিয়াম নাইট্রেট, ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট, সুপার-ফস্‌ফেট প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটি পরীক্ষা ক'রে নিয়ে তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী এইসব সার ব্যবহার করতে হয়।

বিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে পেরেছেন যে, ক্রমাগত শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহার করা উচিত নয়। তাতে জমির মূল্যবান "হিউমাস" বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন প্রচুর সার প্রয়োগ করেও বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায় না। এজন্য স্থায়ী কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে, কম্পোস্ট সার এবং রাসায়নিক সার একত্রে প্রয়োগ করার ব্যবস্থাই হ'ল সবচেয়ে ভালো। কারণ, তার ফলে জমিতে মূল্যবান "হিউমাস" গঠিত হয়, এবং তাতেই সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নীলরতন ধর বলেছেন,—"গোময় সার এবং রাসায়নিক সার পরস্পরের পরিপূরক। কাজেই আমার মতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে তার পরিমাণ কখনই একর প্রতি ১০০ পাউণ্ডের বেশী হওয়া উচিত নয়। আর সেই সঙ্গে সর্বদাই গোময় সার, খড়, 'কম্পোস্ট' এবং অন্যান্য জৈব-পদার্থ প্রয়োগ করা অবশ্যই কর্তব্য, যাতে হিউমাস হ্রাস না পায়।*

পরীক্ষার ফলে এ-ও প্রমাণিত হয়েছে যে, নীল-সবুজ শেওলা-সার পরিমাণমত ব্যবহার করলে, জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর সেইসঙ্গে মূল্যবান "হিউমাস" গঠিত হয়। এজন্য সার হিসেবে নীল-সবুজ শেওলার চাহিদা এখন খুব বেড়ে গেছে। ইচ্ছা করলে, নিজেরাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সার তৈরি ক'রে নেওয়া যায়।

মাটিতে অম্লের ভাগ বেশী থাকলে, পরিমাণমত চুন প্রয়োগ ক'রে মাটির অম্লতা কমানো যায়। তখন চাষ ক'রে ভালো পাওয়া যায়।

(৩) **পর্যায়ক্রমে চাষের ব্যবস্থা**—শিম্ব-জাতীয় গাছপালার শিকড়ে একরকম গুটি দেখা যায়, এর মধ্যে একপ্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া (ছত্রাক-জাতীয় অণু-উদ্ভিদ্) ঐসব গাছপালার বন্ধুরূপে বাস করে। এরা বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য তৈরি করে। আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্, এদের কাছ থেকে, কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্যের বিনিময়ে, নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য আদায় ক'রে নেয়, এবং তা দিয়ে নিজদেহের পুষ্টি-সাধন করে। এর নাম সিম্‌বাইওসিস্ বা মিথোজীবিতা। এরূপ পরস্পর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বায়ুর নাইট্রোজেন থেকে উদ্ভিদ্-দেহে নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য তৈরি হয়। তাছাড়া যে মাটিতে এই জাতীয়

---

* স্থায়ী কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে গোময় সার এবং কৃত্রিম সার একত্রে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা লাভজনক হয়, কারণ এগুলি মাটিতে ক্যাল্‌সিয়াম কার্বনেট ও নাইট্রোজেন সরবরাহ করে, বায়ুর নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার ক'রে নাইট্রোজেন যৌগিক উৎপাদনে সহায়তা করে, আর মাটির নাইট্রোজেন এবং মৃত্তিকাজাত লিগনিন-ফস্‌ফরাস-নাইট্রোজেন ঘটিত সারাংশ সংরক্ষণ করে। এই সারাংশকে হিউমাস্ (Humus) বলে।

গাছপালা জন্মায়, সেখানে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

এই কারণে, জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, ধান বা গম চাষ করার পর, সেখানে শিম্ব-জাতীয় গাছপালা (যেমন—মটর, ছোলা ইত্যাদি) চাষ করবার প্রথা সব দেশেই প্রচলিত হয়েছে। এরই নাম পর্যায়ক্রমে চাষের ব্যবস্থা (Rotation of Crops)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বড় অরণ্যে শুকনো পাতা আপনি ঝরে পড়ে। তাতেই সেখানকার মাটি হয় উর্বরা। এজন্য সেখানে বাইরে থেকে সার দেওয়ার কোনো দরকার হয় না।

মাটির ক্ষয় ঃ

রোদ, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে মাটি ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়। দিনের বেলা সূর্যতাপে ভূ-পৃষ্ঠের শিলা প্রসারিত হয়, আবার রাত্রে ঠাণ্ডা হয়ে তা সঙ্কুচিত হয়। অনেকদিন ধরে ক্রমাগত এরকম হতে থাকলে, শিলা ভেঙ্গে যায়—এভাবে ক্রমশঃ বালিকণার সৃষ্টি হয়। এসব বালিকণা ঝড়-বাতাসে, বৃষ্টির জলে অথবা নদীস্রোতে স্থানান্তরে চলে যায়।

গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে মাটি আঁকড়ে ধরে থাকে। কাজেই যেখানে গাছপালা আছে, সেখানে ঝড়-বাতাস, বা বৃষ্টির জলের ক্রিয়ায়, সহজে মাটির ক্ষয় হতে পারে না। অপরদিকে গাছপালা না থাকলে, সেখানকার মাটি ক্রমশঃ আলগা হয়ে পড়ে, এবং ঝড়-বাতাসে, কিংবা বৃষ্টির জলের সাহায্যে, সহজেই স্থানান্তরে সরে যায়। পাহাড়ের ঢালে তৃণের আস্তরণ না থাকলে, সেখানে ভূমিক্ষয় হয় আরও বেশী পরিমাণে। সুতরাং, নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেললে, কিংবা অত্যধিক গোচারণের ফলে তৃণভূমি বিনষ্ট হলে, ধ্বংসের কাজ সহজেই সম্পাদিত হয়। এর ফলে একটা বিরাট এলাকা ক্রমশঃ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ক্রমাগত মাটির ক্ষয় হতে থাকলে, সেখানে চাষ-আবাদ করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে গাছপালা, তৃণ-গুল্ম ইত্যাদি লাগিয়ে দিলে, মাটির ক্ষয় অনেকাংশে নিবারিত হয়। আজকাল মরুভূমির দেশে, কিংবা

পাহাড়-অঞ্চলে, প্রথমে এই উপায়ে মাটির ক্ষয় বন্ধ করা হয়, এবং তারপর আস্তে আস্তে সে-সব জায়গায় চাষ-আবাদের কাজ আরম্ভ করা হয়।

আর একটি কথা। বাতাসের অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অনেক শিলা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তার ফলে বৃষ্টি বা নদীর জলে সেগুলি আরও সহজে ক্ষয়ে যায়।

বৃষ্টি বা নদীর জলে মাটি ভিজে প্রথমে নরম ও আলগা হয়ে যায়। তারপর স্রোতে ভেসে দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যায়। গাছপালা, তৃণ-গুল্ম ইত্যাদি না থাকলে, একাজ আরও সহজেই সম্পাদিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। নদী এক-দিকে ভাঙ্গে, কিন্তু অন্যদিকে গড়ে। নদীস্রোতে ভেসে আসা বালি এবং পলিমাটি আবার এক জায়গায় জমা হতে হতে ক্রমে নদীর চর কিংবা একটা নতুন দেশ, গড়ে তোলে। বহুকাল ধরে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদীর জলে ভেসে আসা পলিমাটির স্তর জমা হয়েই আমাদের বাঙলা দেশের সৃষ্টি করেছে। নানা জায়গার মাটি এসে জমেছে ব'লে এখানকার মাটি এতো উর্বর।

ভূমিক্ষয় নিবারণ এবং ভূমি-সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য :—

(১) জলাঙ্কভূমিতে তৃণ-গুল্ম অথবা বৃক্ষ-রোপণ এবং বনসৃজন।

(২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ। কারণ, বানের জলে ভূমিক্ষয় খুব সহজেই সম্পাদিত হয়, এবং তা হয় অত্যন্ত বিপুল পরিমাণে।

(৩) পাহাড়ের ঢালে তৃণভূমির পত্তন। কারণ, তৃণের আস্তরণ না থাকলে, পাহাড়ের ঢালে ধ্বস নামে অতি সহজেই।

উন্নত চাষ-ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে উন্নত সেচ-ব্যবস্থা। এর ফলে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করা সহজ হয়।

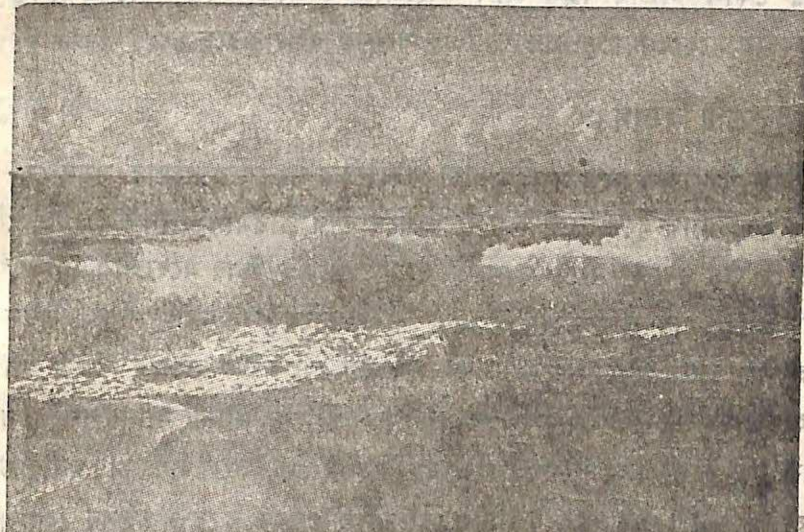
(৫) মরুভূমির প্রসার রোধ করার জন্য, এবং মরুবিজয়ের উদ্দেশ্যে, পরিকল্পিত ভাবে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণও অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। নতুবা, মরুভূমির আয়তন ক্রমশঃ বেড়ে যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জল*

ভূমিকা ঃ

আমাদের এই পৃথিবীর আয়তন ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ-মাইল, এবং তার মধ্যে ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ-মাইলই সমুদ্র। পৃথিবীর ৩ ভাগ জল, ১ ভাগ স্থল। এই ৩ ভাগের শতকরা ৯৭ ভাগই সমুদ্রের লোনা জল, এবং মিষ্টি জলের পরিমাণ মোটে ৩ ভাগ।



চিত্র ৫৪। পুরীর সমুদ্র—এই পৃথিবীর আয়তন ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল এবং তার মধ্যে ১৪ কোটি বর্গ মাইলই সমুদ্র।

[আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ]

সূর্যের ক্রিয়ায় অতিকায় পাতনের সাহায্যে এই সমুদ্রের জল বৃষ্টি ও তুষারের আকারে ধরার বুকে নেমে আসে, যদিও মাটিতে পৌঁছাবার

* [এই প্রবন্ধটি লিখেছেন মদীয় অনুজ শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ।]

আগেই এরও শতকরা ৬০-৭০ ভাগ বাষ্প হয়ে উবে যায়। তবে বাকিটা মাটির মধ্যে প্রবেশ ক'রে জলাঙ্কভূমিকে সমৃদ্ধ করে, এবং ঝোরা, নদী-নালার মধ্যে দিয়ে মানব-সমাজের কাছে এসে পৌঁছায়।

জল সরবরাহের সকল সূত্রের মূলেই হ'ল ধারাপাত, বৃষ্টি ও তুষার। প্রকৃতির দানের মধ্যে বাতাসের পরেই জলের স্থান। কাজেই যে-সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী, সেখানে মিষ্টি জলের সরবরাহও বেশী, এবং ব্যবহারের সুযোগও যথেচ্ছ। এই কারণেই মানব-সভ্যতার প্রথমকাল থেকেই তাদের বাসস্থানের পত্তন হয়েছে সেই সব অঞ্চলেই যে-সব অঞ্চলে জলের কোন অভাব ছিল না। হাজার হাজার বছর আগের সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা এই সাক্ষ্যই বহন করছে।

জলের শ্রেণী বিভাগ ঃ

বরফ-গলা জল অথবা বৃষ্টির ধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নামার সময় যে-সব খনিজ পদার্থ ধুয়ে নিয়ে আসে, প্রথমে তার পরিমাণ থাকে কম, এবং যতই সে উঁচু থেকে নীচে নামতে থাকে, ততই তার মধ্যেকার খনিজ পদার্থের পরিমাণ বাড়তে থাকে, এবং এই ভাবেই এইসব পদার্থ বহন করে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে। অনাদিকাল থেকে এই ভাবেই সমুদ্রে বা আবদ্ধ জলাশয়ে, যেমন—হ্রদ ইত্যাদিতে, এইসব খনিজ পদার্থপূর্ণ জল গিয়ে জমা হচ্ছে এবং সূর্যের তাপে বাষ্পীভবন-এর ফলে লবণতা ঘনীভূত হয়েছে। এবং এই ভাবেই মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেও এইসব লোনা জল সঞ্চিত হয়, অন্যান্য মিঠা জলের মতই, যাকে আমরা ভূজল বলি। রাজস্থান, পঞ্জাব, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশের যে সব শুখা অঞ্চলে গরম অত্যন্ত বেশী, সেখানে স্বাভাবিক জলার জল ক্রমাগত বাষ্পীভবনের ফলে জলের মধ্যেকার মৌলিক পদার্থগুলি ঘনীভূত হয়ে লোনা হয়ে যেতে দেখা গেছে, যদিও সমুদ্র অনেক দূরে থাকার দরুন সমুদ্রের লোনা জলের অনুপ্রবেশের কোন সুবিধা সেখানে নেই। আবার অনেক জায়গায় সমুদ্রের কোন অংশ চড়ার দরুন বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে সেই লোনা জল সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের আলোড়নের ফলে চাপা পড়ে যায়। এই গুলিই

বর্তমান কালের পটাস (রাসায়নিক) সার-এর উৎস। কাজেই কেবলমাত্র সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটায়, নদীর মিষ্টি জলের লবণতা (যেমন—কলকাতার গঙ্গায় হচ্ছে) এবং সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের মাটিতে এবং জলে লবণতা বৃদ্ধি পায় না।

এই লবণতা কেবলমাত্র যে নুনের অর্থাৎ সোডিয়ামের পরিমাণ বেশী থাকায় হয়, তাই নয়, চুন, ম্যাগ্‌নেসিয়ম, পটাসিয়াম এবং অন্যান্য বিরল মৌল পদার্থের জন্যও হয়ে থাকে। সাধারণতঃ যদি অনুপ্রবেশকারী জলে দ্রবীভূত কঠিনের পরিমাণ প্রতি ১০ লক্ষ ভাগে ১০০০ ভাগেরও বেশী থাকে, তাহলে তাকে লোনা জল বলা হয়। এই জল পানীয় হিসেবে বা সেচের কাজে ব্যবহার করা চলে না।

জলের উৎস:

পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ জল, এবং তা হ'ল, সমুদ্র, হ্রদ, খাল-বিল এবং নদী-নালা। জলের আরও বিভিন্ন উৎস হচ্ছে মাটির উপরকার এবং মধ্যেকার জল, যেমন, ঝরণা, কূয়া, আর্তেজীয় কূপ ইত্যাদি। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, মাটি এবং পাথর সবই জলাধারের কাজ ক'রে থাকে। বাতাস বাষ্পের আকারে জল গ্রহণ করে সমুদ্র, হ্রদ, নদীনালা, গাছপালা, পশু, পাখি, মানুষ এবং মাটির উপরিভাগ থেকে। বাতাসের এই জলীয় বাষ্প আবার পৃথিবীর বুকেই ফিরে আসে বৃষ্টি, তুষার, হিম-ঝঞ্ঝা বা তুষার-বর্ষণের আকারে। এর একটা বৃহৎ অংশ ব্যবহৃত না হয়েই আবার ফিরে যায় বাতাসে, বাষ্পের আকারে, কিছু গড়ান জমি থেকে ধারার আকারে নদী-নালায় প্রবেশ করে জলাঙ্কভূমির মাধ্যমে, কিছু মাটিকে ভিজিয়ে দেয় এবং গাছপালা তাকে গ্রহণ করে এবং বাড়তি অংশ মাটির নীচে গিয়ে মাটির মধ্যেকার সঞ্চিত জলের অর্থাৎ ভূজলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

জলের সদ্‌ব্যবহার:

জলেই প্রথম প্রাণের স্পন্দন জেগেছিলো এই পৃথিবীতে। জল ভিন্ন জীবন ধারণের কোন উপায়ই নেই। তাই জলের আর এক নাম জীবন। এবং এই তরল জলের সঙ্গে বিবর্তন এবং আমাদের জীবনের সব কিছুই

জড়িত। মাতৃগর্ভে প্রথম প্রাণের সঞ্চার থেকে মানবকের জন্ম পর্যন্ত সবই তরল পদার্থে হয়ে থাকে। তাই বলেছি, জীবজগৎ জলের উপর একান্ত নির্ভরশীল। মানুষের দেহের যদিও শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই জল, তবুও



চিত্র ৫৫। জল-সেচের প্রাচীন পদ্ধতি—ডোঙ্গার সাহায্যে জল-সেচের ব্যবস্থা।
[আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ]

দেহের ওজনের অনুপাতে আমাদের জলের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ কর্মঠ ব্যক্তির বেলায় দৈনিক ২·৮-৩·৩ লিটার মাত্র, এবং সমাজ ও পরিবেশের প্রয়োজন-এর তুলনায় তা একান্তই কম। কিন্তু তবুও বিপাক, শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখা এবং কলার পুষ্টিতে জলের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করলে, আমরা একথাই বুঝতে পারি যে, জল বিনা আমাদের জীবন ধারণ অসম্ভব। যদিও বয়স, স্বাস্থ্য এবং কার্যক্ষমতার উপর প্রয়োজনের সামান্য তারতম্য হতে পারে।

জলজ প্রাণী আমাদের প্রোটিন খাদ্যের যোগান দিয়েছে, দিচ্ছে এবং অনন্তকাল ধরে দিয়ে যাবে। জলজ উদ্ভিদ্ আমাদের অন্যান্য খাদ্যের

যোগান দেয়। এমন কি সমুদ্রের শৈবাল থেকে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান খাদ্যোপযোগী প্রোটিন আহরণ করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক জলপথ পৃথিবী-ব্যাপী বাণিজ্যে মানুষের সহায়তা করছে। খাল-বিল, নদী-নালা সেচের ও যোগাযোগের সহায়তা করে।



চিত্র ৫৬। জল-সেচের আধুনিক পদ্ধতি—পাম্পের সাহায্যে খেতে জল-সেচের ব্যবস্থা।

[আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ]

বর্তমান সভ্যতায় জলের প্রয়োজন অত্যধিক। খাদ্য-উৎপাদনে সেচের প্রয়োজন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। বর্তমানে ভারতে যেখানে ২৮০ লক্ষ হেক্টর-এ, অর্থাৎ শতকরা ২৩ ভাগ জমিতে,

জলসেচ দেওয়া হয়, সেখানে আমাদের খাদ্য-সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় খাদ্য-উৎপাদনের জন্য আরও অতিরিক্ত ৪৮০ লক্ষ হেক্টর-এ সেচের ব্যবস্থা অবশ্যই করা দরকার। ফসলের এই জলের প্রয়োজনীয়তা, কোন গাছ বা ফসলের প্রতি একক শুষ্ক পদার্থ তৈরীতে যে পরিমাণ জল বাষ্প-মোচনের দ্বারা ব্যয়িত হয়, সোজা কথায় কোন ফসল ফলানোয় মোট যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন তাই। ধানের গড়পড়তা ১৪ সেন্টিমিটার হেক্টর জলের প্রয়োজন, তুলার ৭½-১১½, ভূট্টার ৭½, জোয়ার-দানার জন্য ৬ এবং গোখাদ্যর জন্য ৫, গাজর ৫, গমের ৩ এর কিছু বেশী, আলুর ও তামাকের ৬ এর কিছু বেশী, পাটের ৬, সরষের ২½, চীনা বাদামের ৬ এর কিছু বেশী এবং আখের প্রায় ১০ (দক্ষিণ ভারতে ১৮ মাসের ফসলে ২৯ এর কিছু বেশী)। প্রত্যেক ফসলেরই জলের প্রয়োজনের সর্বোচ্চ সীমা আছে, তার জীবনের কোন নির্দিষ্ট সময়ে, সেই প্রয়োজন বৃষ্টির জলে যদি পূরণ না হয় তখনই সেচের প্রয়োজন হয়। কারণ, ফসলের বৃদ্ধি বৃষ্টির ধারার ভরসায় অপেক্ষা করতে পারে না।

শিল্পে জলের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে শুধু একটা দৃষ্টান্তে—একটি সাধারণ কাগজ-কলের জলের প্রয়োজনীয়তা ৫০,০০০ জন বাস করে এমন একটি সহরের চেয়েও বেশী। শুধু তাই নয়, হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে, এক পিপা তেল পরিশোধনে ১৮ পিপা জল, এক পিপা বিয়ার (মদ) তৈরীতে ১৩৪০ লিটার জল, এক লিটার পেট্রল পরিশোধনে ১০ লিটার জল, এক টোনো সাল্‌ফেট কাঠের মণ্ড তৈরীতে ২৫০ টোনো জল এবং বাষ্পশক্তি চালিত যন্ত্রে প্রতি টোনো কয়লা পোড়ানোর সঙ্গে ৬০০-১০০০ টোনো জলের প্রয়োজন। বর্তমান যুগের শিল্প-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, এটি সেচের এক প্রবল প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে ইস্পাত-শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করছে ; এবং প্রতি টোনো ইস্পাত তৈরীর জন্য মোটামুটি ৩ লক্ষ লিটার জলের প্রয়োজন।

জলের অভাব কেন হয় এবং কি তার সমাধান :

ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যা, শিল্পের দ্রুত প্রসার এবং সেই সঙ্গে নদী-প্রবাহের ক্রমোন্নতি, নদী-নালার জল দূষিত হওয়ার সমস্যাকে দ্রুতগতি

ক'রে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৬৪ সাল এবং তার আগেও দিল্লীর পানীয় জল দূষিত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করা যায়। জল দূষিত হওয়ার সমস্যার জন্য শিল্পের প্রসার এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের জল সরবরাহ ব্যাহত হয়।

নদীর জলের বহুমুখী ব্যবহার এবং তার সঙ্গে বেসরকারী স্বার্থের সম্বন্ধও নিত্য নূতন আকারে ততই দেখা দিচ্ছে, যতই জলের উৎস সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

নদীর মোহানায় পলি পড়ার দরুন সমুদ্রের নিকটবর্তী সহরে, যেমন কলকাতার জলে, লবণের পরিমাণও সমস্যার আকার নিচ্ছে। গঙ্গার জলে ৪০০ পি. পি. এম. পর্য্যন্ত লবণ থাকতে পারে, কিন্তু ১৯৬৫ সালের জুন মাসের গোড়ায় হাজার পি. পি. এম-ও ছাড়িয়ে যায়। তেমনি পরিস্রুত জলে যদিও ৩০০ পি. পি. এম-লবণ থাকতে পারে, কিন্তু ঐ একই সময়ে পরিস্রুত জলের লবণের পরিমাণও প্রায় পাঁচশ'র কাছে চলে যায়। শুধু তাই নয়, নদীর জল থিতানোর জন্য জলাধারে পলি পড়ে বুজে যাওয়াও জল জমা করা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। কলকাতার জল সরবরাহের জন্য এরূপ 'প্রিসেটলিং ট্যাঙ্ক'-গুলিতে ৩ কোটি ঘন ফুট পলি জমায়, গঙ্গার জল জমা করার স্থানাভাব এবং ঐ জলাধারের পলি অপসারণ না করতে পারলে এবং নতুন জলাধারের জন্য স্থানাভাব হলে—এখানে স্থানাভাব আছেই—অন্য উপায়ে সহরের জলাভাব মিটানোর কথা চিন্তা করতে হবে, যার জন্য অভাবিত ব্যয়ের সম্ভাবনা।

গ্রামাঞ্চলের কথা ছেড়ে দিলেও পশ্চিম বাংলায় যে ৮৯টি পৌর সভা আছে তার মধ্যে ৩০টিতে জল সরবরাহের ভালো কোন ব্যবস্থা নেই।

ভূগর্ভের জলস্তর থেকে জল সরবরাহ যদি সুশৃঙ্খল ভাবে না করা যায়, তবে নলকূপের দ্বারাও জল-সমস্যা সমাধান সম্ভবপর নয়। দেশময় পরিত্যক্ত নলকূপ এই সাক্ষ্যই বহন করে। কলকাতায় ভূগর্ভের জলস্তর নেমে যাওয়ায়, বর্তমানে (১৯৬৫ সালে) শতকরা ৭৫টি নলকূপ অচল এবং গভীর নলকূপ (বিদ্যুত-চালিত) প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করতে পারছে না।

কৃষি-কাজে সেচের জলের সমস্যাও প্রবল আকারে দেখা দিচ্ছে।

প্রকৃতি-নির্ভর বৃষ্টির জলের হেরফের হলে, যদি ডি. ভি. সি. বা ময়ূরাক্ষী জলাধার থেকে সময়মত পরিমিত জল সরবরাহ না করা যায়, তবে খাদ্য-উৎপাদন আরও সংকটময় হয়ে উঠবে। বর্তমানে জলাধার থেকে প্রয়োজনের সময় জল পাওয়া যায় না বলে শোনা যায়, কারণ জলাধারে জল অধিকাংশ সময়েই সরবরাহের উপযুক্ত পরিমাণে সঞ্চিত থাকে না।

আমাদের প্রয়োজনীয় টাটকা জলের সরবরাহের পরিমাণ প্রয়োজন মত বাড়ানো সম্ভব, সংরক্ষণ ও পুনরায় ব্যবহারের দ্বারা।

নদী-নালার জল এবং ভূজল কার্যকরী ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ ও বিতরণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। পুরোনো আইন সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে, যার দ্বারা জল ব্যবহার-কারীর অধিকার রক্ষা, যে জল পাওয়া যাচ্ছে তার উপর পূর্ণ দায়িত্ব, এবং জলের অপব্যবহার এবং অপচয় কমান এবং রোধ করা যায়।

নদী-উপত্যকার জল ব্যবহারকারীদের নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

কারখানার দূষিত জলকে ব্যবহারযোগ্য করতে হবে। যেমন, হুগলীর ত্রিবেণীতে কারখানার দূষিত জল পরিশোধনের পর ব্যবহার ক'রে স্থানীয় সমবায় সমিতি এক ফসলী জমিকে তিন ফসলিতে রূপান্তরিত করেছেন।

বৃষ্টির জল জলাধারে বা চাষের জমিতে ধরে রাখার উপযোগী ভূমির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বাড়তি জল বয়ে না যায়। সেচের উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সরবরাহ-কেন্দ্র থেকে জমিতে নিতে অধিকাংশ জলই নালার মধ্যে দিয়ে অপচিত না হয়, অর্থাৎ সেচের নালা মেরামত করতে হবে সেচের আগেই। এই বাড়তি জল নিকাশ এবং বন্যা প্রতিরোধ ইত্যাদির দিকেও নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। খোলা জল বাতাসের সংস্পর্শে ক্রমাগত বাষ্পীভূত হয়ে অপচিত হচ্ছে, তার প্রতিরোধের জন্য জলাংকভূমিতে বনভূমি বা তৃণভূমির পত্তন করতে হবে, নদী-নালার দুপাশ দিয়ে গাছপালা লাগাতে হবে এবং সর্বদাই মনে রাখতে হবে, সেখানে জলের অপচয় অত্যন্ত অন্যায়।

জল-সংরক্ষণঃ

চাষের কাজে মাটি ছাড়া যেমন চলে না, তেমনি জল ছাড়াও চাষ সম্ভব নয়। জল ভিন্ন কোন ফসল বাড়বে না, এবং কোন জীবই বাঁচতে পারে না। অযত্নে চাষ বৃষ্টির ধারা বা গলে যাওয়া বরফের জলকে ধরে না রেখে মাটির উপর দিয়ে বয়ে যেতে দেয়, যার ফলে সেই জল মাটির মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার ফসলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে না। আমাদের দেশে বহু অঞ্চলে জলের খুব অভাব, তবুও আমরা যে স্বল্প পরিমাণ জল বৃষ্টির ধারায় বা অন্য সূত্রে পেয়ে থাকি, তাও সঞ্চয় বা সংরক্ষণের বিষয় চিন্তা করি না, তাকে অপচয়ের হাত থেকে বাচাতে চেষ্টা করি না, আমাদের ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা ভেবে।

কাজেই আমাদের জানতে হবে, জলাংকভূমিকে গাছপালা দিয়ে ঢেকে না দিলে বৃষ্টির ধারা, বরফ গলা জল সোজা পাহাড়ী খাত বেয়ে নদী-নালা দিয়ে প্রবল বেগে বন্যার আকারে নেমে আসবে। সমতল ভূমিতে ধারাপাতের বৃষ্টির জল পুকুর ইত্যাদিতে সঞ্চয় ক'রে রাখতে হবে, ভবিষ্যতের কথা ভেবেই, সেচের এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য। বৃষ্টির জল মাটির মধ্যে সঞ্চয় না করায়, ভবিষ্যতে ভূজলেরও অভাব হবে, কাজেই ভবিষ্যতে নল-কূপের জলের কথা ভেবেই ভূজল সংরক্ষণের কথাও আমাদের ভাবতে হবে এখনই।

চাষের জমি যদি অসমতল হয় তাহলে বৃষ্টি বা সেচের জল কোন অংশ বেশী পায় এবং কোন অংশ কম পায়। উঁচু অংশে ঠিকমত সেচ দিতে গিয়ে নীচু অংশে জলের অপচয় হয় এবং ফসলের পক্ষে তা ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কাজেই ফসল ফলাতে হলে সর্বদাই জমির লেভেলও যথাসম্ভব ঠিক রাখা আবশ্যক।

ঠিক একই ভাবে, সার প্রয়োগের দ্বারা যদি অনুর্বর জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা না হয়, তাহলেও গাছের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির জন্য যে জলের প্রয়োজন তাও তারা কাজে লাগাতে পারবেনা। কারণ, উপযুক্ত উর্বরতার অভাবে গাছ ঠিকমত বৃদ্ধি না পেলে, সে তার প্রয়োজনীয় জল ব্যবহার করবে কি ভাবে? অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও উর্বরতা পরিমিত

না হওয়ার দরুন জলের অপচয় হবে, তা বৃষ্টি বা সেচের যে জলই হোক না কেন।

জলাংকভূমি—জলাংকভূমি সেই অঞ্চলকে বলে যেখান থেকে বৃষ্টির বা পাহাড়ের বরফগলা জল ধুয়ে একটি খাত দিয়ে বয়ে যায়। এই ভাবেই আবার অনেকগুলি ছোট ছোট খাতের ধোয়ানি জল গিয়ে মেশে একটি নদীতে। কাজেই ঐ সমস্ত অঞ্চল যদিও ঐ নদীরই জলাংকভূমি, কিন্তু তবুও ছোট ছোট খাতাগুলিকে ভূগর্ভস্থ বা মাটির উপরকার জলের ধারায় যে অঞ্চল পুষ্ট করে, তারা আবার সেই খাতগুলিরই জলাংকভূমি। জল সংরক্ষণের কাজের শুরু জলাংকভূমি থেকে, কারণ নদী-নালার জলের উৎসই হচ্ছে জলাংকভূমি।

জলাংকভূমি রক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে, যে জল এর উপর পড়ছে তার উপযুক্ত ব্যবহার, অর্থাৎ যে জল পাওয়া যাচ্ছে তাকে লাভের কাজে লাগানো, এবং বাড়তি জলের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, যাতে কোন ক্ষতির কারণ না হয়। জলাংকভূমি সংরক্ষণের কোন কার্যসূচী গ্রহণের আগে সুষ্ঠুভাবে জমির ব্যবহারের এবং স্থান-বিবরণসহ জরিপের ব্যবস্থা করতে হবে। জলাংকভূমির আকার, পরিমাণ, স্থান-বিবরণ এবং তৃণাদির আবরণের হদিশ পাওয়া খুবই প্রয়োজন, এর ওপর বৃষ্টি বা ধারাপাতের ফলে কি হতে পারে এবং কি করা প্রয়োজন, তা স্থির করার জন্য। সেই ভাবেই জমির বর্তমান ব্যবহার, এবং কি ভাবে ব্যবহার করার ইচ্ছা, এ-ও জানা প্রয়োজন, কেননা প্রত্যেকটি জমির উপযুক্ত ব্যবহারই এর উদ্দেশ্য। একটি সত্যিকারের খাঁটি কার্যসূচী শুধু যে প্রত্যেকটি জমি এবং গাছপালার হিসাব নেবে, তাই নয়, প্রত্যেকটি প্রাণী এমনকি মানুষেরও হিসাবের অন্তর্বর্তী করবে, এবং প্রত্যেকটি ঝোরা, নালা যে-গুলি ঐ জলাংকভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়, তাদেরও এর শামিল করবে। অর্থাৎ, ঐ অঞ্চলের সকল অবস্থা জানা চাই।

জলাংকভূমি যদি তৃণহীন হয়, তবে বৃষ্টির জল, ধারাপাত বা বরফগলা জল, সবকিছু ধুয়ে প্রবল বেগে বন্যার আকারে সমতল ভূমিতে নামবে। কাজেই একে সবুজের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এইখানে

বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। জলাংকভূমির ঢাল, গড়ান এবং উর্বরতার বিচার ক'রে তবেই স্থির করতে হবে, সেখানে বনভূমি না তৃণভূমি হবে, না সেখানে ভূমি-সংরক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে উপযোগী কোন ফসল ফলান হবে। হিসাবমত সব কিছুই হবে প্রয়োজন অনুসারে। মাটির গভীরতা যেখানে কম, সেখানে তৃণভূমি বাঞ্ছনীয়; যেখানে মাটি গভীর অথচ চাষ-আবাদে ভুমি-ক্ষয়ের সম্ভাবনা, সেখানে উপযুক্ত বনভূমির পত্তন করতে হবে; এবং যেখানে চাষ-আবাদ সম্ভব, সেখানে ভূমি-সংরক্ষণের সকল পদ্ধতি (যার বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে) অবলম্বন ক'রে বাঁধ বা দেহরেখা বাঁধ দিয়ে, অথবা ধাপ-চাষের সাহায্যে, কোন ফসল ফলানো হবে। জমি কোন সময়ই খোলা ফেলে রাখা হবে না। কারণ, সবুজের এই আস্তরণ থাকার দরুন বৃষ্টির বা বরফগলা জল সোজা খাতে না নেমে, মাটির মধ্যে দিয়ে গাছপালার পুষ্টির সহায়তার পর বাড়তি অংশ চুইয়ে গিয়ে নদী-নালায় পড়বে। এর ফলে নদী-নালায় জলস্ফীতি হঠাৎ বিপদসীমা অতিক্রম ক'রে বন্যার রূপ নিতে পারবে না।

বন্যা :

সূর্যের প্রখর তাপে সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল প্রভৃতির জল সর্বদাই বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশছে। প্রকৃতির নিয়মে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে জলীয় বাষ্প ঘণীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে এবং পরে বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে নেবে আসে। সূর্যের তাপশক্তির সাহায্যে এইভাবে পাহাড়-পর্বতের শীর্ষদেশে প্রচুর বারিপাত হয় এবং সেই বিপুল বারিধারা পাহাড়ের গা বেয়ে ছুটে চলে উদ্দাম গতিতে সমতল ভূমির দিকে।

বৃষ্টির ধারা অথবা তুষার-বরফগলা জল যখন মাটির টেনে নেওয়ার ক্ষমতার চেয়ে বেশী পরিমাণে ধারা বয়ে যায়, এবং নদী-নালার বুকে তাদের বহতার ক্ষমতার চেয়ে বেশী পরিমাণে নেমে আসে, তখনই বন্যা দেখা দেয়। বিপুল জলস্রোত নদীর দুকুলের সীমায় ধরে রাখা সম্ভব হয় না। দু'কুল ছাপিয়ে জল ছুটে চলে সমতল ভূমির গ্রাম, জনপদ প্রভৃতি ভাসিয়ে দিয়ে।

বন্যা অনাদিকাল থেকে হয়ে আসছে, তবে তখনকার কালে, নীচু জমিতে বা নদীনালার পাশের যে-সব জমি বর্ষার জলে ডুবে যায়, সেখানে আমাদের আদি পুরুষেরা চাষ, আবাদ বা বাস করা কোনটাই করেন নি। কিন্তু আজ তা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে জমির উর্বরতা শক্তির মূল্যায়ন ক'রে আমরা পলিপড়া ঐ সব জমিতে চাষ করা এবং তার আশপাশেই বাস করা অধিকতর সুবিধা বা লাভজনক বলে মনে করছি।

শুধু যে প্রচুর পরিমাণ জল বয়ে গেলেই বন্যা হবে, তা নয়। একই নদীর এক অঞ্চলে যখন বন্যা হয়, তখন অন্য অঞ্চলে যদিও সেই একই পরিমাণ জল বয়ে যায় তবুও সেখানে বন্যা হয় না। এর কারণ হচ্ছে যে, নদীর বুকে না জমে, অনেক সময় ডুবন্ত বা জেগে ওঠা চড়ার দরুন, একই পরিমাণ জল সেখানে বয়ে গেলেও সেই অঞ্চলের দু'পাশ ভাসিয়ে দেয়। এই কারণে জলের পরিমাণ-এর উপর বন্যা বা নাব্যতা সব সময় নির্ভর করে না। আবার কোন সময় ঐ একই নদীর উৎসমুখের পাথরের বাধা অল্প অল্প ক'রে সরে গিয়েও হঠাৎ প্রবল আকারে প্রচুর জল এক সঙ্গে নিম্ন-ভূমিতে নেবে আসায়ও বন্যা দেখা দেয়। আবার ঠিক এই ভাবেই উৎসমুখে শুকিয়ে মূল নদী মৃতকল্প হয়ে যায়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই সাক্ষ্যই বহন করে।

বন্যার ব্যাপকতা বাড়ে যখন অল্প সময়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। এবং জলাঙ্কভূমির সে জল গ্রহণের বা শোষণের ক্ষমতা না থাকে। জলাঙ্কভূমি বনাচ্ছাদিত থাকলে শোষণ-ক্ষমতা বেশী থাকবে, তৃণভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকলে কিছুটা থাকবে, কিন্তু যদি অবার গোচারণের ফলে বা অন্য কারণে আবরণহীন হয়, তবে সহজেই সেই জল গড়িয়ে প্রবল বন্যার আকার ধারণ করতে পারে। নদী-খাতের গভীরতা অনেক সময় প্রবল বর্ষণের অতিরিক্ত জল ধারণ করতে পারে। তখন বন্যা হয় না।

বন্যার ধ্বংস-লীলা ঃ প্রকৃতির অন্যান্য ধ্বংস-লীলার সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখলে, বন্যার ক্ষতি টাকার অঙ্কে হয়ত বিপুল মনে হবে না। হয়তো জাতীয় আয়-ব্যায়ের হিসাবেও সে অঙ্ক ক্ষুদ্রই মনে হবে। এমনকি রোগ ও পোকার আক্রমণে দেশে শস্যের যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়, তার

তুলনায় এ ক্ষতি ক্ষতিই মনে হবে না। তবুও হঠাৎ আসা এই বিপুল জলরাশি অতি অল্প সময়েই তার ধ্বংসের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলে, এবং তার হাত থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা কেউই রেহাই পায় না, পশু-পক্ষী (বন্য বা গৃহপালিত) তারাও রেহাই পায় না। এই প্রবল জল-স্রোতের পথে বহুকালের সঞ্চিত ধন, বহু যত্নে তৈরী বাসগৃহ, যারাই বাধা দেবার চেষ্টা করে, তারা সবাই সমান ভাবে, নিষ্করুণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের প্রকৃতিকে জয় করার বাসনা চিরন্তন, কিন্তু এই খানেই সে অসহায় বোধ করে, এবং এই কারণেই প্রয়োজন বন্যার হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষার ব্যাপকতর ব্যবস্থা, অতি আধুনিক ব্যবস্থা, দ্রুত উদ্ধার কার্যের ব্যবস্থা।

হিসেব করে দেখা গেছে যে, বছরে বন্যার ধ্বংস-লীলায় আমাদের দেশে ৪৬ কোটিরও বেশী টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়ে থাকে, কেবলমাত্র আসামেই ক্ষতির পরিমাণ ৫-৬ কোটি টাকা। এর উপর বন্যাত্রাণ ইত্যাদিতে খরচ হয় ৮ কোটি টাকার মতো। এই ধ্বংস নিবারণ করতে পারলে, জাতীয় আয় অন্ততঃ পক্ষে ১০০ কোটি টাকা বেড়ে যেতে পারত।

বন্যার ফলে সাধারণতঃ ক্ষতি হয় (ক) ফসলের, (খ) বাসগৃহ, মানুষ এবং গবাদি পশুর, (গ) জাতীয় সম্পত্তি, এবং (ঘ) শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার জন্য দেশের ও সর্বসাধারণের।

বন্যার সমস্যা : বন্যার কারণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, ভারতে মূল সমস্যা হচ্ছে—(ক) নদীর পাড় ডুবে যাওয়া—(১) পাড় ভেসে যাওয়ার দরুন, (২) উৎসমুখ বন্ধ বা স্বাভাবিক ঝোরার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন, (৩) নীচু অঞ্চলের অপর্যাপ্ত জলনিকাশের দরুন, এবং (৪) সমুদ্রের জল-স্ফীতির দরুন। (খ) নদীর পাড় ভাঙ্গা—যেমন প্রতি বছর ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, পদ্মা প্রভৃতি নদীতে ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এবং (গ) নদীর গতি-পরিবর্তন—যে জন্য মূল ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহের পাশে মৃতকল্প, মূল গঙ্গা মুর্শিদাবাদের পাশে মৃতকল্প, এবং যে জন্য কলকাতার বন্দরকে বাচানোর জন্য আজ ফারাক্কা-পরিকল্পনা করতে হয়েছে, মূল

নদীতে জলপ্রবাহ আরও বাড়িয়ে দিয়ে নদী মোহনায় পলিপরা বন্ধ করে সমুদ্রগামী জাহাজের যাতায়াত সহজ করার জন্য।

নদীর হঠাৎ গতিপথ পরিবর্তন গতিপথে বাধার সৃষ্টির জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্য হঠাৎ নতুন পথে বিপুল জল-ধারার প্রবেশের ফলে অনেক সময় বন্যা দেখা দেয়, যেমন ব্রহ্মপুত্রের হঠাৎ গতিপথ পরিবর্তনে (১৯৬৫'র বর্ষায়) আসামের ব্যাপক অঞ্চলে হঠাৎ বন্যা দেখা দেয়।

নদীর পাড় ভাঙ্গা একটি কঠিন সমস্যা। তার কারণ, মূল্যবান উর্বরা জমি অল্প সময়েই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সহরকে রক্ষার জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় ক'রে বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। ক্রমাগত পলি পড়ে, এবং নানা ভাবে নদীর বুক যখন উঁচু হয়ে যায়, তখন সামান্য জলপ্রবাহেই পার্শ্ববর্তী সহর নদীর জল-প্লাবনে ডুবে নানান ক্ষতির কারণ হয়। অতি অধুনা পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি সহরের পার্শ্ববর্তী তিস্তা নদীর বাঁধ বহু টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়েছে, কারণ নদীর বুক প্রায় সহরের সমান উঁচু হয়ে উঠেছিল, এবং সামান্য বর্ষণেই সহর জলের নীচে ডুবে যেত। আসামের ডিব্রুগড় সহরের অধিকাংশই ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে বিলীন হয়েছে, এবং বহু টাকা ব্যয়ে আবার যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, তার রক্ষা-ব্যয়ও কম নয়। অথচ এখন নদী গতি পরিবর্তন ক'রে অন্য অঞ্চলের ক্ষতির কারণ হচ্ছে।

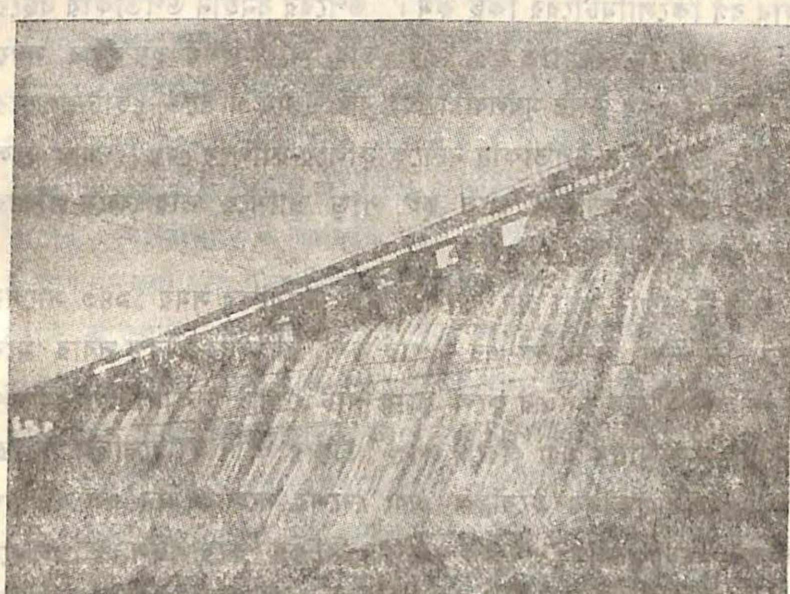
এই সব কারণেই নদীর গতিপথ এবং তার পরিবর্তনের সম্ভাবনা ইত্যাদি জানার জন্য, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই নদী-গবেষণা একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং আমাদের দেশেও নদী-গবেষণার উপর ভিত্তি ক'রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ভারতের প্রধান নদী-গবেষণা কেন্দ্র বোম্বাই-এর পুণায় অবস্থিত। পশ্চিমবাংলায় নদী-গবেষণা কেন্দ্র হরিণঘাটায় অবস্থিত। বর্ধমানের গল্‌সীতে নদী-গবেষণার উপকেন্দ্র অবস্থিত, বিশেষ ক'রে দামোদরের জন্য।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ—দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা : বর্ষার সমাগমে ক্ষুদ্র পাহাড়িয়া নদীর বিপুল জলস্রোত তার সীমায় ধরে রাখা সম্ভব হয়

না, এবং দু'কূল ছাপিয়ে ছুটে চলে সমতল ভূমির গ্রাম, জনপদ প্রভৃতি ভাসিয়ে দিয়ে। আকাশে-বাতাসে ভেসে ওঠে অসহায়ের করুণ ক্রন্দন। বর্ষার শেষে সেই নদীই ক্রমে ক্রমে শীতের সময় একেবারে শীর্ণ হয়ে পড়ে, তাকে হেঁটে পার হওয়াও আর কঠিন থাকে না। এই কারণেই এই সব নদীর নিয়ন্ত্রণ দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

দামোদর এমনি একটি নদী, যদিও ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষতিতে ভয়ঙ্কর, এবং এর এই ধরণের পাগলামীর জন্য একে বলা হ'ত "দুঃখের নদী"। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০০ মিটার উচ্চতায় ছোট নাগপুরে এর উৎপত্তি, এবং



চিত্র ৫৭। তিলাইয়া বাঁধ—জলাধারের স্পিল্‌ওয়ে (spillway) দিয়ে বাঁধের জল উপচে পড়ছে।

[আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীসুশান্তকুমার দত্ত চৌধুরী]

বিহারের মধ্যে দিয়ে প্রায় ২৯০ কিলোমিটার বয়ে বাংলার সমতলে নেমে এসেছে, এবং শেষ পর্যন্ত হুগলী বা গঙ্গায় এসে মিশেছে, কলকাতা থেকে ৫০ কি. মি. দূরে। বাংলার সীমানায় এর প্রধান উপনদী বরাকর এসে মিশেছে, যার পর এর নদী নাম সার্থক হয়েছে। কিছুটা বাঁকুড়ার মধ্য

দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখো এসে, বর্ধমান সহরের কাছে এসে, দক্ষিণে কিছুটা হুগলী জেলার মধ্য দিয়ে গিয়ে, হাওড়া জেলার মধ্যে দিয়ে গিয়ে পড়েছে গঙ্গায়। এর মোট ৫৩০ কি. মি. দৈর্ঘ্যের মধ্যেই, যে কোন ভারতীয় নদীর বিশেষত্বই এতে দেখা যায়। যেমন প্রথমে দ্রুত গতিতে পাড় ভেঙ্গে পলি সংগ্রহ করা, এবং শেষে শ্লথ গতি হয়ে বানের জলের সঙ্গে নিম্নভূমিতে সেই পলি দুপাড় দিয়ে নিক্ষেপ করা।

দামোদরের জলনির্গম ক্ষেত্রের পরিমাণ ২২ হাজার বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে বরাকর সংগমের উপরে এর জলগ্রহ ক্ষেত্রের পরিমাণ হচ্ছে ১৮ হাজার বর্গ কিলোমিটারের কিছু কম। উপরের বনহীন উপত্যকায় বছরে গড়ে ১২০ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়, এবং তার অধিকাংশই হয় বর্ষার সময় এবং মসৃণ টাকের উপর মুষলধারা এই বৃষ্টি উদ্দাম গতিতে ছোটনাগপুরে দুই পাড় ভেঙ্গে নিম্ন-উপত্যকায় নদীকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেয়। যার ফলে এই নদী বাংলার সমতলে এসে দুই পাড় ভাসিয়ে তার ধ্বংস-লীলার সাক্ষর রেখে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে।

পূর্ববর্তী বন্যার কথা বাদ দিলেও, গত মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালের সাড়ে তিন লক্ষ কিউসেক-এর বন্যার কথা দামোদর-তীরস্থ সবার মনে এখনও স্পষ্ট রয়েছে। এর ফলে প্রায় আট কোটি টাকার সম্পত্তিই শুধু নষ্ট হয়নি, বহু মানুষ এবং গবাদি পশু তাদের প্রাণ হারিয়েছিল, উর্বরা জমি অনুর্বর বালুকাময় হয়েছিল এবং দেশের সঙ্গে বর্ধমান এবং সন্নিহিত অঞ্চলের যোগাযোগ অনেক কাল বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত, এবং ভিন্ন পথে চালু করতেই শুধু ব্যয় হয়েছে ৫৩ লক্ষ টাকা ; অন্যান্য রাস্তাঘাট, পুল ইত্যাদির মেরামত এবং নতুন করে তৈরীর কথা বাদ দিলেও। অথচ গ্রীষ্মকালে এই নদীতে জল সরু সুতোর আকারে কোনমতে নাম রক্ষা ক'রে চলে।

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জল-সংরক্ষণ-উন্নয়ন কার্যসূচী বিভিন্ন প্রদেশ বা রাষ্ট্রের আয়ত্বাধীন ছিল এবং এই সব বিষয়ে উৎসাহ বা তদারকের জন্য কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা ছিল না। কেন্দ্রীয় জলপথ, সেচ এবং নাব্য কমিশন

এই অভাব মোচন করে। এবং এদেরই আনুকুল্য পেয়ে কতকগুলি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, এবং তার মধ্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় ৬,৫০,০০০ কিউসেক বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।* কিন্তু ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে ৬,৬৫,০০০ কিউসেকের এক প্রচণ্ড বন্যা এই উপত্যকাকে আক্রমণ করে। কিন্তু তখন তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং মাত্র দু'মাস আগে পাঞ্চেত বাঁধ তৈরী হয়ে গেছে, আর দুর্গাপুর আড়বাঁধও তৈরী। যার ফলে বন্যার গতিবেগ দুর্গাপুর আড়বাঁধের কাছে ২,০৫,০০০ কিউসেকে নিয়ন্ত্রিত প্রবাহে এসে যায়, এবং ১৯৪৩ এর দ্বিগুণ বেগসম্পন্ন বন্যা দামোদর উপত্যকার বুক দিয়ে প্রায় সবার অলক্ষ্যে বয়ে যায়। ১৯৫৯ এলো আরো প্রবল বন্যা, যার বেগ দাড়ালো ৮,১০,০০০ কিউসেক এবং পরিকল্পনামত আটটি বাঁধের কেবলমাত্র চারটির সাহায্যেই দুর্গাপুরে তাকে ২,৮৮,০০০ কিউসেক-এ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হ'ল। যদিও নিম্ন উপত্যকা এর ফলে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তবুও বাঁধের কার্যকারিতা তাদের লক্ষ্য-সীমাকেও ছাড়িয়ে গেল, কারণ ঐ বন্যাকে কোন রকমে নিয়ন্ত্রণ না করা হলে, নিম্ন-উপত্যকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এর পর আরও ছোট কয়েকটি বন্যা লোক চক্ষুর অগোচরে দামোদরের বাঁধই নিয়ন্ত্রণ করেছে। আশা করা যায়, বাকি চারটি বাঁধ তৈরী ক'রে পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলে, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আরো বাড়ানো যাবে।

বাঁধগুলি শুধু যে বর্ষার সময়ে নিজ নিজ অববাহিকা অঞ্চলে প্রবাহিত জলধারাকে ধরে রেখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করছে, তাই নয়, অনাবৃষ্টির সময় সেচের জলও সঞ্চয় ক'রে রাখছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদনেও এদের দান বড় কম নয়। নিম্নভূমিতে সেচের ব্যবস্থার জন্য এবং দুর্গাপুরে শিল্পনগরী গড়ে তোলার জন্য ৭০২ মিটার লম্বা আড়বাঁধ তৈরী সম্পূর্ণ হয় ১৯৫৫ সালে, এবং ১৯৫৬ সালেই ৪,৪৫০ হেক্টর অঞ্চলে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই হিসেবে জল-বিদ্যুৎ তৈরীর জন্য জলের যে বিপুল প্রয়োজন

* কিউসেক = কিউবিক ফুট প্রতি সেকেণ্ডে = ২৮.৩ লিটার জল প্রতি সেকেণ্ডে বয়ে যাওয়া।

তা ধরা হয়নি, এবং তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং দুর্গাপুর শিল্প-নগরীর জলের যে বিরাট চাহিদা তাও ধরা হয়নি। আর ধরা হয়নি, দুর্গাপুর-ত্রিবেণী নৌবহ খাল। দুর্গাপুর-ত্রিবেণী সেচ ও নাব্য খাল ১৯৬৩ সালে চালু করা হয়, এবং ঐ বছরই এর কর্তৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে তুলে দেয়া হয়। এই খাল দিয়ে ১.৮ মিটার গভীরতার এবং ২০০ টোনো মালবাহী জলযান বছরে ২০ লক্ষ টোনো মাল পরিবহণ করবে।

ডি. ভি. সি'র শক্তি উৎপাদন দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং মোট উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ বিদ্যুৎই এরা উৎপাদন করেন, তাদের তাপ এবং জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে। বোকারো এবং দুর্গাপুর তাপ-বিদ্যুৎ-কেন্দ্র এবং মাইথন, পাঞ্চেৎ এবং তিলাইয়া জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৪৭৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে, এবং তার সঙ্গে অধুনা চন্দ্রপুরার ১৪০ মেগাওয়াট। দুর্গাপুরের নতুন কেন্দ্রটি ১৯৬৬ সালেই চালু হয়েছে। ডি. ভি. সি'র হিসাব মত, গত ১৯৬৩-৬৪ সালে ২৮,৫৪০ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিক্রয় ক'রে মোট ১৫.১০ কোটি টাকা আয় হয়েছিল, যা বর্তমানে বহু গুণ বেড়ে গেছে।

বাঁধে পলি জমে অকেজো হয়ে যাওয়া—এর দৃষ্টান্ত আমেরিকায় অনেক পাওয়া যাবে। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে বাঁধ তৈরী হচ্ছে। জলাংকভূমির বনভূমি রক্ষা করা, এবং যেখানে বনের কোন চিহ্নই নেই, সেখানে নতুন ক'রে বনভূমির পত্তন করা অবশ্যই কর্তব্য। দামোদরের উৎস ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলে যদিও বা কিছু কিছু বনভূমি আছে, এবং তাদের সংরক্ষণ-এর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তার নীচে থেকেই জমিদারী প্রথা অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অপরিণত শালবন নির্মম-ভাবে ধ্বংস করা হয়। অবশ্য এই ধ্বংসের কাজ অনেক আগে থেকেই সুরু হয়েছিল, যে জন্য পূর্বেই বলেছি, দামোদরের জলগ্রহ ক্ষেত্র টাক মাথার মত মসৃণ, বনহীন। এই অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে নতুন বনভূমির পত্তনের দ্বারা বর্ষার ধারাপাতের উদ্দাম গতি রোধ করা এবং সেই সঙ্গে ভূমিক্ষয় রোধ করার যে কার্যসূচী প্রথম থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিল, বাঁধ তৈরীর পর নির্দিষ্ট সময়েই তা শেষ করা উচিত ছিল। কি ক্ষতি বর্তমানে হয়েছে,

বা হতে পারে, সেটা বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিয়েও একথা বলা যায় যে, যে-কোন জলাধারকে দীর্ঘ জীবন দান করতে হলে, তার জলের উৎস জলাংকভূমিকে বনভূমি তৈরীর দ্বারা রক্ষা করতেই হবে।

অন্যান্য সেচ ও জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা—ময়ুরাক্ষী নদীর উপর সাঁওতাল পরগণার মশানজোড়ে প্রধান জলাধার-বাঁধ থেকে জল-বিদ্যুৎ এবং সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে। সিউড়ির কাছে তিলপাড়ায় আঁড়-বাঁধ যোগাযোগ এবং সেচের উন্নতি সাধন করেছে। ১৯৫১ সাল নাগাদ ১,৮২, ১০০ হেক্টরে সেচের ব্যবস্থা হয় বর্তমানে ২,২২,৭০৯ হেক্টরে। কংসাবতী পরিকল্পনা উত্তর অঞ্চলে সেচের দ্বারা সমৃদ্ধি এনে দেবে। আর উত্তর বঙ্গের জলঢাকা জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা ভূটানের সঙ্গে সহযোগীতায় উত্তর বঙ্গের বিদ্যুৎ-সমস্যা সমাধান করবে অদূর ভবিষ্যতেই।

বাড়তি জল ধরে রাখা ঃ সেচের অথবা গ্রামাঞ্চলের পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য, ছোট বাঁধ ঢালের মুখে দিয়ে, অথবা পুকুর বা ডোবার মধ্যে, সঞ্চয় করে রাখা যায়। অনেক সময় প্রবল বর্ষণের বাড়তি জলও এইসব ছোট খাট জলাধারে সরিয়ে দিয়ে ছোট খাট প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাঁধ তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নীচের দিকটা চওড়া থাকে এবং ক্রমেই পিরামিডের মত সরু হয়ে ওঠে। কারণ, বাঁধের মধ্যের জল যত গভীর হবে, বাঁধের নীচের দিকে জলের চাপ পড়বে ততই বেশী। পুকুরের পাড়ও এই ভাবেই করতে হবে। জলের গভীরতার হিসেবে বাধ কতটা চওড়া করে তুলতে হবে, এবং দুই পারের ঢাল কতটা হবে, সেটা সেচ-বাস্তুকারের পরামর্শ মত করা উচিত।

সাধারণত বাঁধের ক্ষতি হয় বাতাসের দরুন জলে যে ঢেউ ওঠে তাতে। আবার বাঁধের মাটির উপরও তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কোন কাদা-মাটির বাঁধ ঢেউ-এর আঘাত অনেক বেশী সহ্য করবে, দোঁয়াশ বা অন্য হালকা মাটির বাঁধের চেয়ে। যদি বাঁধ ৮ হাতের কম উঁচু হয়, উজান দিকের পাড় ৩ঃ১ ঢালে করা হলে (অর্থাৎ ৩ হাত সমান্তরালে এক হাত উঁচু) তখন আর সেই বাঁধের কোন অতিরিক্ত রক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। যে

সব বাঁধের উচ্চতা ৮ হাতের বেশী করতে হয়, সেখানে ঢেউ-এর আঘাত বেশী হওয়ার দরুন, উজান দিকের পাড় আরও কম চালু হওয়া প্রয়োজন।

জলাধারের জল সেচের প্রয়োজনে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, যখন নেবে আসতে থাকে, তখন তার দুই ধারেরপলি-পড়া উর্বরা মাটিতে চাষের একটা প্রবল ইচ্ছা অবশ্যই দেখা দেবে, যেমন বিলের জমিতে আমরা সর্বদাই চাষের জন্য আগ্রহী হই। কিন্তু বিলের আশপাশের জমিতে চাষের পর যদি সেই মাটি বর্ষার জলে ধুয়ে যেয়ে পড়ে, তাতে কারুর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, কারণ বিলের বুকে পলি অল্প-বিস্তর জমায় কোন বিপদ নেই, যে বিপদ জলাধারের বাঁধের অবশ্যই আছে। সকল প্রকার ভূমি সংরক্ষণের নীতি অনুসরণ করা আমাদের দেশের অল্প শিক্ষিত চাষীদের দ্বারা যে-সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়, সেখানে এই বিপদের ঝুঁকি না নেওয়াই উচিত। কোন কোন মহলের ধারণা, যেহেতু বাংলাদেশের চাষীকে বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বাঁধের জলাধার জমি ডুবিয়েছে বিহারের, সেইহেতু বিহারের বাঁধ অঞ্চলের সেই সব চাষীর কিছু কিছু সুবিধা রাজনৈতিক কারণে দেওয়া প্রয়োজনীয়। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে বৃহত্তর স্বার্থে বহুমুখী এই সব পরিকল্পনা স্বার্থকতা লাভ কোন দিনই করে না। যে টেনেসি ভ্যালীর পরিকল্পনার আদর্শে আমাদের দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হয়েছিল, এই সব ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী ছাড়িয়ে তা এখনও টেনেসি ভ্যালীর দ্বারপ্রন্তেও উপস্থিত



চিত্র ৫৮। সুপরিকল্পিত সেচ-ব্যবস্থা—কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে, খালের সাহায্যে, শতদ্রু নদীর জল সরবরাহ করা হচ্ছে।
[আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীমুরারি প্রসাদ গুহ]

হতে পারেনি। টেনেসি ভ্যালী পরিকল্পনা আমেরিকার ঐ চির-দারিদ্র্যের অঞ্চলে সবার মুখে হাসি ফুটিয়েছে, দামোদর ভ্যালী তা কতটা পেরেছে সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

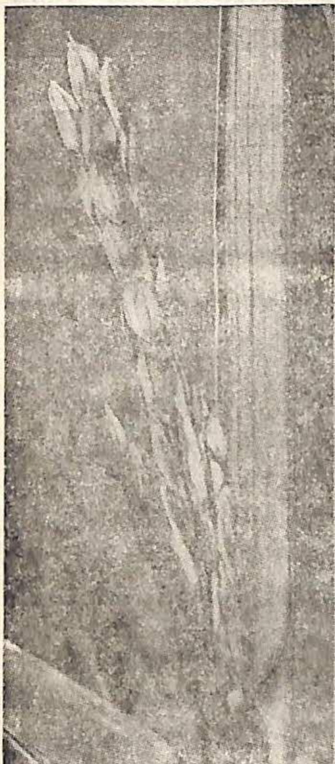
ভূ-জল ঃ আমরা জানি যে, মাটির উপরকার বৃষ্টির জলের বেশ খানিকটা অংশ, সাধারণত $\frac{৩}{৫}$—$\frac{৩}{৪}$ অংশ, নদী-নালা দিয়ে সমুদ্রে না গিয়ে, তা বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে না মিশে, মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মাটির আকার একটা সূক্ষ্ম মৌচাকের মত, এবং এরই ফাঁক-ফোকরের মধ্যে দিয়ে উপরকার জল ক্রমেই নীচের দিকে নেমে আসে, এবং এদের ধারণ ক্ষমতার বেশী যে জলটা আসে, সেই বাড়তি জল চুঁইয়ে আরও নীচে কোন একটা স্তরে গিয়ে জমা হয়। মাটির উপরে হ্রদ-নদী-নালায় সঞ্চিত জলের সবটা জলই কিন্তু মাটির নীচে এখন শুধুমাত্র জলের সঞ্চয় থাকা সম্ভব না। মাটির নীচে নানা প্রকার প্রবেশ্য শিলার মধ্যে দিয়ে এই জলের সঞ্চয় অপ্রবেশ্য শিলায় এসে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তখন থেকেই তার সঞ্চয় বাড়তে থাকে। মাটির নীচে মৃত্তিকাস্তরের এই সব শূন্যস্থান তা শিলার অভ্যন্তরস্ত ফাটলই হোক, বা বিভিন্ন বালুকণার মধ্যেকার শূন্য স্থানই হোক, সম্পূর্ণ জলে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এই সম্পৃক্ত জলবাহী স্তরের সঞ্চিত জলকেই **ভূ-জল** বলা হয়, এবং সম্পৃক্ত অংশের উপরের তলকে **জলপীঠ** বলা হয়।

ভূ-জল মাটির অভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে। এজন্য এই শতাব্দীর আগে পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। বর্তমানে সভ্যতা ও শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রয়োজনও ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এবং সেই চাহিদা মাটির উপরকার নদী-নালা-বাঁধ বা পুকুর ইত্যাদির দ্বারা পুরণ করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আজ তাই ভূ-জলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেচের কাজে ভূ-জল অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, কেননা এতে আগাছার বীজ বা জীবাণুর সংক্রমণের ভয় থাকে না। শুধু তাই নয়, সেচ, পানীয় এবং সকলপ্রকার শিল্পের জন্যই ভূ-জল ব্যবহারের নলকূপ খনন ইচ্ছামত যেখানে প্রয়োজন, এবং যেখান থেকে অল্প ব্যয়ে অন্যত্র নেওয়া যায়, সেখানেই খনন করা যায়।

ভূ-জল প্রয়োজনীয় জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে কিনা সেকথা সরকারী ভূ-তত্ত্ববিদ-এর মারফত জানা যাবে। অবশ্য কাছাকাছি জায়গায় খনন করা আগেকার কূপ বা নলকূপও এই খবর দিতে পারে। ভূ-জল প্রধান অন্তরায় হ'ল প্রাথমিক ব্যয়। নদী-নালা থেকে জল আহরণের নেবার চেয়ে এর জন্য ব্যয় প্রথমে অনেকগুণ বেশী করতে হয়। একটি গভীর নলকূপ খোড়ার খরচ প্রায় ৩০-৪০ হাজার টাকা, এবং তার জন্য বৈদ্যুতিক পাম্প-এর খরচও প্রায় ৪০ হাজার টাকা এবং এছাড়াও আছে বিদ্যুৎ-সংযোগের ব্যয়। জলবাহী স্তরের মধ্যে অনেক বৈষম্য আছে। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জলবাহী স্তর হচ্ছে মোটা নুড়ি-পাথরপূর্ণ এবং বালুকাবর্জিত। কিন্তু এই জাতীয় স্তর খুব সচরাচর পাওয়া যায় না। সাধারণত নুড়ি-পাথরের সঙ্গে বালি, পলিমাটি বা কাদা মিশ্রিত থাকে। মিহি বালি এবং বেলে পাথরের স্তর থেকে সাধারণতঃ ভাল জল পাওয়া যায়। শেল, কাদা, কর্দমাক্ত বেলেপাথর এবং স্বল্প প্রবেশ্য শিলা থেকে অল্প জল পাওয়া যায়।

আমাদের ভারতবর্ষে প্রকৃতির করুণায় মাটির উপরকার জলের প্রাচুর্য আছে যথেষ্ট, এবং যার মধ্যে কেবলমাত্র শতকরা ১২ ভাগই আমরা বর্তমানে কাজে লাগাতে পারছি এবং বাকিটা নদী-নালার বুক দিয়ে বয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। অথচ দ্রুত শিল্পের প্রসার এবং সেচের প্রয়োজনীয়তার জন্য বহু অঞ্চলেই ব্যাপক জলাভাব দেখা দিচ্ছে। এমনকি যে-সব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেখানেও বছরের প্রায় ৮ মাসেই জালাভাব দেখা যায়। বিশেষ করে হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলেই এটা দেখা যায়। বিশুষ্ক এবং প্রায় বিশুষ্ক অঞ্চলে অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেছে যে, সেখানে ভূ-জল-উদ্যোগের সঙ্গে জলের লবণতা দূরীকরণ একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে ইস্রায়েলে গবেষণার দ্বারা দেখা গেছে যে, সমুদ্রের জলের সঙ্গে ভূ-জলের একটা সংযোগ আছে, তা সে যত দূরেই থাক না কেন! ভূ-জল সর্বদাই মিষ্টি বা পানযোগ্য। কিন্তু সেই জল যদি যথা সময়ে না ব্যবহার করা যায়, তবে ক্রমশঃ তা সরে গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মেশে। এবং এইভাবে পৃথিবীর সর্বত্র মূল্যবান পানীয় বা

আমাদের ব্যবহারযোগ্য জল নষ্ট হচ্ছে। আবার একই জায়গা থেকে পাম্পের সাহায্যে জলবাহী স্তরের সঞ্চিত জলের চেয়ে বেশী জল তোলার উদ্যোগের ফলে ক্রমে সেই জলের লবণতা বৃদ্ধি পেয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। যে পথে সঞ্চিত জল সময়মত উত্তোলনের ব্যবস্থা না করায়





চিত্র ৫৯। উচ্চ-ফলনশীল উন্নতজাতের ধানগাছ।

চিত্র ৬০। উচ্চ-ফলনশীল উন্নতজাতের গমগাছ।

সমুদ্রে যায়, আবার সেই পথেই জল বেশী উত্তোলনের ফলে সমুদ্রের জল এসে পানীয় জলের লবণতা বাড়িয়ে দেয়। কাজেই পরীক্ষা ক'রে প্রথমে দেখা দরকার, কোথায় কি পরিমাণ ভূ-জল সঞ্চিত আছে, এবং তার কতটা

আমরা কতদিনে তুলে নিতে পারি, অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করে আমাদের উন্নয়নের কাজে লাগানোর জন্য। আবার এটাও দেখতে হবে যে, প্রাকৃতিক উপায়ে সেই সব জলবাহী স্তরের সঞ্চয় বৃদ্ধির কোন অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, সেই অঞ্চলের বনভূমি ইত্যাদির বিনাশের ফলে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে সঞ্চিত জলের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন উপায়ও আবার থাকে না। সম্পৃক্ত জলবাহী স্তর কতটা গভীর হবে, তা নির্ভর করে সেই



চিত্র ৬১। প্রয়োজন অনুযায়ী সার এবং সেচের জল দেওয়ার ফলে ফসলের সমৃদ্ধি। (ধান-খেত—পশ্চিমবঙ্গ)

[আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীমুরারি প্রসাদ গুহ]

অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, বনভূমি ইত্যাদির জলধারণ, এবং বাড়তি জল মাটির নীচে কতটা প্রবেশ করবে, তার উপর। এই কারণেই প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় জলপীঠের গভীরতা বেশী এবং ভূ-পৃষ্ঠের খুব কাছেই থাকে এবং এরই বিপরীত চিত্র দেখা যায় বিশুষ্ক অঞ্চলে। শুধু

তাই নয়, অনেক সময় ভূ-সংকোচের ফলে জলবাহী শিলা হেলে থাকতে পারে এবং আটকে থাকা জলের উপর প্রবল চাপের সৃষ্টি হয় এবং কোন নলকূপ খোড়া হলে নিজে থেকেই উৎসের জল ফোয়ারার মতো উঠে আসে। একে বলা হয় **উৎস** বা **আর্তেজীয় কূপ**। এই অবস্থা গুজরতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় দেখা যায়। ভরতবর্ষে প্রথম পরিকল্পনাকালে ভূ-জলের তথ্যানুসন্ধানের কাজ হাতে নেওয়া হয়, এবং ১৯৫৯ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০টি মনোনীত স্থানে ১৫০—৪৫০ মিটার গভীর পর্যন্ত নলকূপ বসিয়ে এই সমীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। এই প্রথম তথ্যানুসন্ধানের যন্ত্রপাতি এবং জ্ঞান অন্যান্য অঞ্চলে এবং পুরোনো অঞ্চলে আরও ব্যাপকভাবে কাজ করার জন্য বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই সমীক্ষার কাজ ভারতীয় ভূ-তত্ত্বীয় জরিপ বিভাগের ভূ-তত্ত্ববিদদের পূর্ণ সহযোগিতায় করা হয়েছে, এবং হচ্ছে। এই সঙ্গে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপদেশও কাজে লাগান হয়েছে। বর্তমানে সম্পূর্ণ দেশীয় বিজ্ঞানীরাই এই কাজ ক'রে চলেছেন।

অপরিমিত জল ব্যবহারের কুফল ও আইনগত রক্ষা-ব্যবস্থা ঃ অপরিমিত জল ব্যবহারের ফলে ভূ-জলের লবণতা বৃদ্ধি পায়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে-সব অঞ্চলের ভূ-জল বন্দীজীবন যাপন করছিল, তাকে উৎস-কূপের সহায়তায় দ্রুত নিঃসরণের ফলে, কিছুকালের মধ্যে সেই সব অঞ্চলে জলের জন্য হাহাকার দেখা দেয়। ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে অসংযত ব্যবহারের ফলে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় বিশুষ্ক অঞ্চলে উৎস-কূপের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সেখানে বর্তমানে সংকট দেখা দিয়েছে। এই সব অবস্থা বিবেচনা করে, সমস্ত প্রগতিশীল দেশই দেশের এই জল-সম্পদকে রক্ষার জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশে বর্তমানে সমীক্ষার কাজ প্রায় শেষ এবং আইন প্রণয়নের জন্যও আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। পৃথিবীর সমস্ত দেশের আইন যাতে দেশের ও দশের প্রয়োজন মত এবং পরস্পর সঙ্গিতপূর্ণ হয়, সেই জন্য রাষ্ট্র-সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন।

ভূ-জল যে পরিমাণ তুলে নেওয়া হচ্ছে, এবং চুইয়ে অন্য পথে নীচে

নেমে যাচ্ছে, তার পূরণ হতে পারে কেবলমাত্র যে জল, নদী-নালা বা বনভূমি, তৃণভূমি এবং শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তার দ্বারাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অল্প-বিস্তর এবং এখনও ভারতের অনেক অঞ্চলে, এই সাম্য বজায় আছে। কারণ, যে পরিমাণ ভূ-জল খরচ হচ্ছে, সেই পরিমাণ আবার জমা হচ্ছে।



চিত্র ৬২। প্রয়োজন অনুযায়ী সার এবং সেচের জল দেওয়ার ফলে ফসলের সমৃদ্ধি। (আলু-খেত—পশ্চিমবঙ্গ)
[আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীমুরারি প্রসাদ গুহ]

কিন্তু বনভূমি বা তৃণভূমির উচ্ছেদ, জলনিকাশ, গোচারণ এবং অবাধ চাষের ফলে খরচের পরিমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুগুণ বেড়ে গেছে। এবং যখনই পূরণ-এর তুলনায় ভারী জলোত্তলন যন্ত্র দিয়ে জল তুলে নেবার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, তখনই জলপীঠ নীচে নেমে যাচ্ছে। দু'টি উপায়ে একে রোধ করা যায়। প্রথম হচ্ছে, জলের ব্যবহার কমিয়ে, যেটা বর্তমান যুগে প্রায় অসম্ভব ; দ্বিতীয় হচ্ছে, বাড়তি সমস্ত জল পুনরায় যাতে ভূ-জলের সঞ্চয়ে জমা হয়, তার জন্য কৃত্রিম ব্যবস্থা, যেমন—পরিত্যক্ত খনি, কূপ বা জলাধারে বাড়তি জল নিক্ষেপ করা।

ইউরোপে শুধু যে অনুন্নত দেশগুলি, যেখানে কৃষি কাজে ভূ-জল অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলে বিবেচিত, তাদের প্রশ্নই নয়, অধিকন্তু উন্নত দেশ-গুলির প্রশ্নও আছে, যাদের শিল্পের জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় জলের সমস্যাও ভূ-জলের দ্বারাই পূরণ করতে হয়। এই সব দেশে, গভীর নলকূপের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে জল অতি সহজে শিল্পে ব্যবহার করতে পারার দরুন, কৃষি এবং গৃহস্থলীর কাজে প্রয়োজনীয় জলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই সব কারণেই ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল ভূ-জল আইন প্রণয়নের দিকে বেশী নজর দিতে স্নুরু করেছে, এবং এই সব বিধিবদ্ধ করার জন্য যে প্রশাসনিক কাঠামের প্রয়োজন তা তৈরীর দিকেও দৃষ্টি দিতে শুরু করেছে, এই সব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যাপারে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্য খুবই ব্যাপক। যে সমস্ত দেশে আইন বর্তমানে আছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের ইউরোপীয় কৃষি-কমিশন ১৯৬৩ সালে সেইগুলির পূর্ণ পর্যালোচনার পর যে-সব সুপারিশ অনুমোদন করেন, সেইগুলি, যে-সব দেশের এ পর্যন্ত আইন প্রণয়ন করা হয় নি, তাদের পক্ষেও নতুন আইন প্রণয়নে কাজ দেবে বলে মত দেন এবং তার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষও এই সুযোগ গ্রহণ করেছে।

তাদের প্রধান বক্তব্য হ'ল যে, ভূ-জল উত্তোলন এবং ব্যবহার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন-এর আগে সমীক্ষা বা অনুসন্ধান-এর কাজের দ্বারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-জলের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে।

আইন প্রণয়নের সময় কেবলমাত্র মূল নীতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, যেটার উপর ভিত্তি ক'রে ভবিষ্যতের আরও বিধি-নিষেধের সৃষ্টি প্রয়োজন-মত প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

প্রয়োজনের তাগিদে যখন আরও বেশী পরিমাণে জলের দরকার হবে, তখন যে-সব অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ভূ-জলের প্রচুর ব্যবহার হয়ে গেছে, সেখানে কঠোর বাধা-নিষেধের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু যে-সব অঞ্চলে ভূ-জল ব্যবহার কম হয়েছে, বা একেবারেই করা হয়নি, সেখানে বাধা-নিষেধ অনেক শিথিল করা যেতে পারে। তবে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

জনকল্যাণের দিকে চেয়ে প্রয়োজনমত সংরক্ষিত এলাকার সৃষ্টি করা যেতে পারে, ভূ-তত্ত্ব এবং কূপ-খননের সমীক্ষা দ্বারা। এই সব অঞ্চলে ভূ-জল ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, অথবা বিশেষ বাধা-নিষেধ সহ অনুমতি দেওয়া, যেতে



চিত্র ৬৩। প্রয়োজন অনুযায়ী সার এবং সেচের জল দেওয়ার ফলে ফসলের সমৃদ্ধি। (আখের খেত—পাঞ্জাব)

[আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীমুরারি প্রসাদ গুহ]

পারে, যাতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি না হয়, এবং সময় ও সুযোগ পেয়ে জলপীঠ পূর্বেকার, অথবা প্রায় পূর্বেকার, সীমায় পৌঁছে যায়।

কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধার রক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহারোপযোগী ভূ-জলের সাধারণ পরিকল্পনা সমসাময়িক অবস্থায় তৈরী রাখার প্রয়োজন হতে পারে এবং তার সঙ্গে জলের চাপ এবং কৃত্রিম উপায়ে জলপীঠের উন্নয়ন ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্যও তৈরী রাখা প্রয়োজন। যখনই সম্ভব হবে এই সব প্রয়োজনীয় তথ্য ঐ অঞ্চল বা দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বা দেশের সঙ্গে বিনিময় করা যাবে, যাদের জলাঙ্কভূমি হয়ত দুই সীমানার মধ্যে পড়ে। এতে উভয়ের সমস্যা সমাধান এমনকি আন্তর্জাতিক চুক্তিরও সুবিধা হতে পারবে।

ভূ-জলের সঞ্চয় ভালভাবে সংরক্ষণের জন্য অনেক দেশেই জলপীঠের গভীরতা এবং কতটা জল উঠিয়ে নেওয়া হবে তার উপর কূপ খনন নিয়ন্ত্রণ করে

"যে কোনও দেশের পক্ষে জলও এক পরম সম্পদ। তা দিয়ে চাষবাস, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার মতো বিশাল দেশে পাঁচটি নদী। তারা সেই পাঁচটি নদীর এক ফোঁটা জলও অকারণে সমুদ্রে পড়তে দেয় না। প্রতিটি বিন্দুকে কাজে লাগায় চাষবাসে। সেখানকার চাষীদের সেচের জল কিনতে হয়। মাত্র পাঁচটি নদীর জলকেই সুপরিকল্পিত ব্যবহারে সে-দেশটি শস্যশ্যামলা। অথচ ভারতবর্ষে এত নদী ও জলাশয় থাকতেও কত লক্ষ একর জমি যে কেবলমাত্র সেচের জলের অভাবে ঊষর হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব নেই। যেখানে জল নেই সেখানে জলের ব্যবস্থা হয় না। হয় না তো বছরের পর বছরই হয় না। আবহমান কাল ধরে রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যে গাঁয়ের মেয়েরা মাইলের পর মাইল হেঁটে পানীয় জল নিয়ে আসে রোজ। আবার পূর্বাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে প্রতি বছরই বিহার, বাংলা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ বন্যায় ভাসছে। এই বন্যা এত নিয়মিত এবং অবশ্যম্ভাবী যে এই অঞ্চলের মানুষ একে একরকম নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে যে বন্যা হয় না তা নয়। কিন্তু সেখানে সম্ভাব্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা আগেই গ্রহণ করার ফলে, নিতান্ত অঘটন ঘটলে, বন্যার কবলে মানুষ বড় একটা পড়ে না। বাঁধ, নিকাশী খাল, উন্নতমানের পাম্প ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তির সবকিছুই সেখানে মানুষকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত।"

[**দেশ :** সম্পাদকীয়—৮ নভেম্বর, ১৯৮৬]

থাকেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেছে যে, এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত, কেন না কতটা জল শেষ পর্যন্ত উঠিয়ে নেওয়া হ'ল সেটাই জানার প্রয়োজন বেশী এবং তারই নিয়ন্ত্রণ জরুরী প্রয়োজন।

এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার খবরদারির জন্য উপযুক্ত কারিগরী কৃত্যকের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যার শাখা আপিস থাকবে দেশের সর্বত্র ; কেননা অনুমতির অতিরিক্ত উত্তোলনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই জলের হিসাব-নিকাশে গোলযোগের সৃষ্টি হবে, যার ফলে দেশের কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে জলের প্রয়োজনে বিপর্যয় এনে দেবে। সেরূপ যাতে না হয় তা দেখতে হবে।

নয়া দিল্লীতে ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে ভূ-জলতত্ত্ববিদদের সভায় ভূ-জলের বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, কেননা দেশের কৃষি কার্যসূচীতে এর প্রয়োজনীয়তা খুবই ব্যাপক। বর্তমানে ভারতে বছরে ৫ কোটি একর-ফিট ভূ-জল উত্তোলন করা হয়, যার দ্বারা মোট চাষের প্রায় সিকিভাগ, অর্থাৎ ১৮০ লক্ষ একর, সেচ দেওয়া হয়।

দেশে ভূ-জলতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে আমাদের দেশে কয়েক বছরের মধ্যে, যখন গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের প্রসারের ফলে সিকিভাগ গ্রামেই বিদ্যুৎ এসে যাবে। ভারতের কৃষিতে তখন আরও উদ্দীপনা দেখা দেবে, কেননা বিদ্যুৎ-শক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে এই সব অঞ্চলে ভূ-জল আরও বেশী পরিমাণে উঠিয়ে সেচের কাজে প্রয়োগ করা হবে।

আমাদের দেশে ভূ-জলের তেমন ব্যবহার আগে হয় নি, যদিও আমাদের সঞ্চিত ভূ-জলের পরিমাণ কম নয়। বৃষ্টির জল কতটা অপসারিত হবে, এবং কতটা মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সঞ্চিত ভূ-জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে, তা বহুলাংশে নির্ভর করে মাটির শ্রেণী এবং আবহাওয়ার উপর। আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে গড়ে প্রায় ১১৪ সে.মি., অর্থাৎ যার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৩০০ কোটি একর-ফিট জল। এর মধ্যে প্রায় ৬৫ কোটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, যার ফলে বর্তমানে আমাদের দেশে ভূ-জলের পরিমাণ প্রায় ৩০৫ মিটার গভীরতায় পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ কোটি একর-ফিট। এর সামান্য পরিমাণও অনাবৃষ্টির সময়ে, যেখানে নদীর জল ব্যবহারের সুযোগ নেই, অথবা বিশুষ্ক অঞ্চলে, ব্যবহার করতে পারলে আমাদের খাদ্য-সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হয়ে যাবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বায়ু

জন্মের মুহূর্ত থেকেই বায়ুকে আমরা জীবন-ধারণের প্রধান সহায়রূপে উপলব্ধি ক'রে আসছি। যার অভাবে আমরা মুহূর্তেই অচেতন হয়ে পড়ি, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে নাভিশ্বাস উঠে পড়ে, এহেন বায়ু সম্পর্কে আমরা যে সতত সচেতন থাকব, তাতে আর আশ্চর্য কি ? শৈশবে যদি ক্ষুধার সময় প্রাণপণ চীৎকার ক'রেও মাকে আমার ক্ষুধা সম্বন্ধে সচেতন করতে না পারতাম, তাহলে আজ বায়ুর কাহিনী বলবার বহু পূর্বেই আমার প্রাণবায়ুর কাহিনীই শেষ হয়ে যেত।

আর একটি কথা। আজকাল নানা বক্তার বক্তৃতার বিচিত্র ছন্দে মাঠ-ঘাট, পার্ক, বিধানসভা, লোকসভা, প্রভৃতি মুখরিত। কিন্তু বায়ু না থাকলে, এদের বাণী কি আমাদের কর্ণকুহরে পৌঁছাত ? বিজ্ঞানের কোনো ছাত্র হয়তো বলবেন,—বায়ু না থাকলে, আমরা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যেই কথাবার্তা চালাবার ব্যবস্থা করতাম, রেডিওতে (বা, বেতারে) যেভাবে গান-বাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি শোনা যায়। সেই বিজ্ঞানী হয়তো মাথা নেড়ে আরও বলবেন, বায়ুর সংস্পর্শে শ্বাসক্রিয়ার ফলে আমাদের দেহ অবিরত ক্ষয়ে যাচ্ছে, আর সেই ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্যের সন্ধানে আমাদের প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কাজেই বায়ু না থাকলে, বরঞ্চ আমাদের জীবনযাত্রা আরও সহজ হ'ত, খাদ্যের প্রয়োজন থাকত না ব'লে আমাদের পরিশ্রম তো কমতই, তাছাড়া পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, কাড়াকাড়ি ইত্যাদিও চিরতরে লোপ পেত। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এই দার্শনিক বিজ্ঞানীটির চিন্তা-ধারায় একটি মারাত্মক গলদ রয়ে গেল। একটি ইঞ্জিনে জল ও কয়লা খরচ করলে তবে পাওয়া যায় শক্তি, আর তারই সাহায্যে ইঞ্জিনটি সচল রাখা যায়। তেমনি আমাদের দেহরূপ ইঞ্জিনেও জল ও খাদ্য সরবরাহ করলে তা থেকে দেহের পুষ্টি হয় এবং পরে শ্বাসক্রিয়ার সময় বায়ুর মৃদু-দহন হলে তবেই আমরা পেশী সঞ্চালনের শক্তি পাই। কাজেই বায়ুর অভাবে

শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে আমাদের দেহযন্ত্র বিকল হয়ে পড়তো, এবং তার ফলে আমরা যে অচেতন জড়-পদার্থে পরিণত হতাম, একথাও কি সেই বিজ্ঞানী মহাশয়কে বলে দিতে হবে ?

আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিপতি এই বায়ু সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর চারিদিকে যে গ্যাসীয় আবরণ আছে, তারই নাম বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)। পৃথিবীর আকর্ষণে এটি পৃথিবীর সঙ্গে লেগে রয়েছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, উপরদিকে প্রায় এক হাজার মাইল অবধি বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। উপরের বায়ুস্তর নীচের স্তরের উপর ক্রমাগত চাপ দেয়, কাজেই ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক উপরের স্তরই সবচেয়ে ঘন। যত উপরে যাওয়া যায়, বায়ুস্তর তত পাতলা হয়ে যায়।

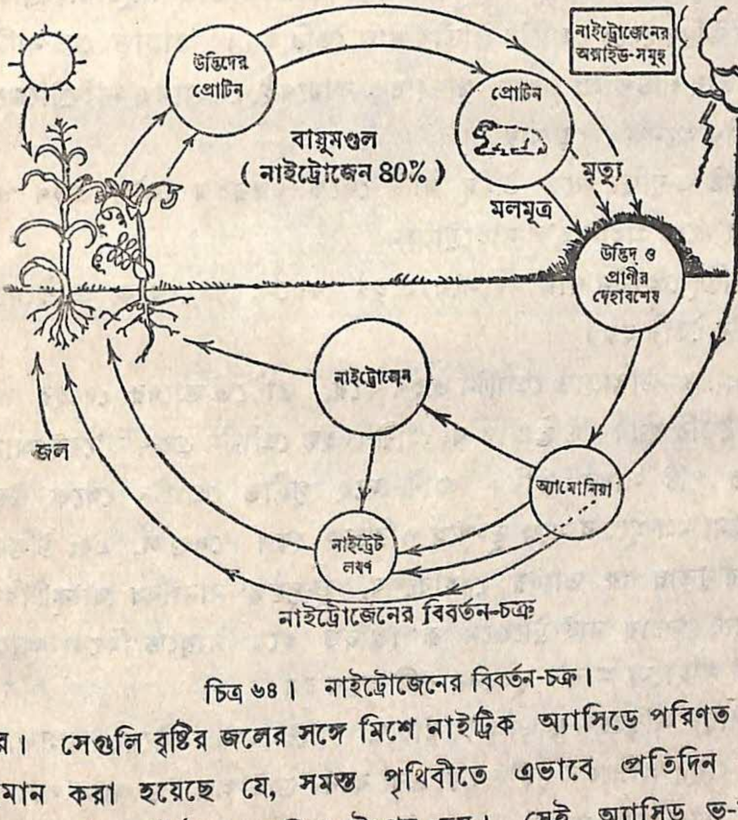
এ রাজ্যের বর্ণসমস্যা নেহাৎ কম নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হ'ল নাইট্রোজেন (৭৭·১৬ শতাংশ), তারপরই স্থান হ'ল অক্সিজেনের (২০·৬০ শতাংশ)। জলীয় বাষ্পের পরিমাণও নেহাৎ কম নয় (১·৪০ শতাংশ)। আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ মাত্র ০·০৪ শতাংশ হলেও তাকে নাগরিকের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা চলে না, বরং মাইনরিটিদের (অর্থাৎ, সংখ্যা-লঘুদের) মধ্যে ইনিই হলেন সবচেয়ে কুলীন। এছাড়া আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি অনেকেই বায়ুরাজ্যের বর্ণ-সমস্যা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞানীর মতে, নাইট্রোজেন নিতান্তই নিষ্ক্রিয়, অপর দিকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন অতিমাত্রায় সক্রিয়। বায়ুতে যদি নাইট্রোজেন না থাকত, তাহলে জীবদেহে, এবং আমাদের আশেপাশে সর্বত্র, দহনক্রিয়া এতো সহজে এবং এতো দ্রুত সম্পাদিত হ'ত যে, আমাদের জীবন ধারণ করাই অসম্ভব হয়ে পড়তো। অতিরিক্ত সক্রিয় অক্সিজেনের সঙ্গে অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন মিশ্রিত আছে বলেই অক্সিজেনের ক্রিয়া বেশ খানিকটা সংযত হয়েছে, এবং তার ফলে আমাদের জীবনযাত্রা এমন সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারছে।

আর একটি কথা। বায়ুমণ্ডলের এই অকর্মন্য নাইট্রোজেনই যদি আমাদের আহার্যের একটি প্রধান অংশরূপে (প্রোটিন) দেখা না দিত, তবে আমরা নিজেরাই যে কবে অকর্মণ্য হয়ে সর্বপ্রকার আনন্দ থেকে

বঞ্চিত হতাম, তা ভাবতেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। আজকাল ডাক্তাররা কথায় কথায় দেহের পুষ্টির জন্য 'হাই-প্রোটিন' সম্বলিত খাদ্য গ্রহণ করার উপদেশ দেন। কিন্তু সে-জাতীয় খাদ্য যে নাইট্রোজেন থেকেই উদ্ভূত, একথা কি ভেবে দেখেছেন? ক্ষুধার্ত বালক যেমন কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ করার অপেক্ষা রাখে না, যখন যা পায় তাই খেয়ে নেয়, আমাদেরও তেমনি নাইট্রোজেন গ্রহণের কোনো নির্দিষ্ট রীতি নেই। তবে প্রধানতঃ দু'টি উপায়ে আমরা বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন পেয়ে থাকি, যেমন—

(১) আকাশে তড়িৎ-ক্ষরণের সময় বায়ুমণ্ডলের কিছু নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নাইট্রোজেনের নানাপ্রকার অক্সাইড উৎপন্ন



চিত্র ৬৪। নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র।

করে। সেগুলি বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। অনুমান করা হয়েছে যে, সমস্ত পৃথিবীতে এভাবে প্রতিদিন প্রায় ২,৫০,০০০ টন নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। সেই অ্যাসিড ভূ-মধ্যে

প্রবেশ ক'রে নানাপ্রকার নাইট্রেট-জাতীয় লবণ উৎপন্ন করে। উদ্ভিদ এসব শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'রে তা থেকে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য তৈরি করে।

(২) আবার, শিম্ব-জাতীয় (leguminous) গাছপালার শিকড়ে এক প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া (bacteria) (বা, ছত্রাক-জাতীয় অণু-উদ্ভিদ), অর্বুদ (nodules) সৃষ্টি ক'রে, তার মধ্যে ঐসব গাছপালার বন্ধুরূপে বাস করে। এরা বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ ক'রে তাই দিয়ে খাদ্য তৈরি ক'রে। এদের কাছ থেকে উদ্ভিদ, কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্যের বিনিময়ে, নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য আদায় ক'রে তা দিয়ে নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করে। এর নাম 'সিম্‌বাইওসিস্' (Symbiosis) বা মিথোজীবিতা। এইরূপ পরস্পর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বায়ুর নাইট্রোজেন থেকে উদ্ভিদ-দেহে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য তৈরি হয়। তাছাড়া যে মাটিতে এ-জাতীয় গাছপালা জন্মায়, স্বাভাবিক কারণেই, সেখানেও নাইট্রোজেনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

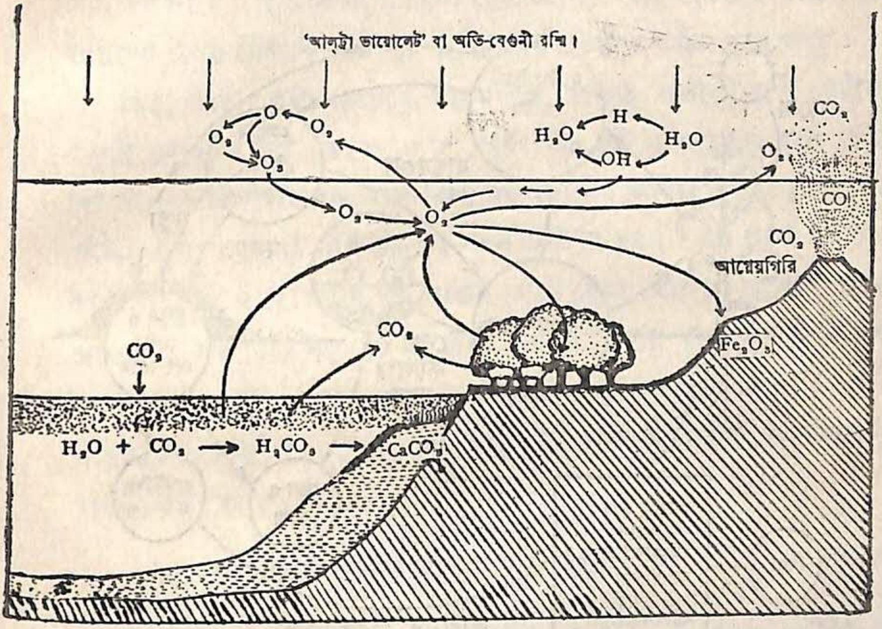
পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে উদ্ভিদ্ মাটি থেকে যতরকম মৌল গ্রহণ করে তাদের মধ্যে প্রধান হ'ল নাইট্রোজেন।

উদ্ভিদ্-প্রোটিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে, তা থেকে প্রাণীদেহের প্রোটিন তৈরি হয়।

প্রাণীরা উদ্ভিজ্জাত প্রোটিন গ্রহণ করে, তাইতে তাদের দেহের রক্ত-মাংস তৈরি হয়। উদ্ভিজ্জাত বা প্রাণী-দেহস্থ প্রোটিন গ্রহণ ক'রেই আমরা দেহের পুষ্টি সাধন করি। প্রাণী-দেহে গৃহীত প্রোটিন থেকে উদ্ভূত আবর্জনা মল-মূত্রের সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠে পরিত্যক্ত হয়। সেগুলি, এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের দেহাবশেষ, ভূ-পৃষ্ঠস্থ নানাবিধ ব্যাক্‌টিরিয়ার ক্রিয়ায়, পুনরায় নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুতে ফিরে আসে। তারই সাহায্যে আবার নূতনের সৃষ্টি সম্ভব হয়।

বায়ুর অক্সিজেন ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। জীবের শ্বাসকার্যের সময় বায়ুর অক্সিজেন গৃহীত হয়, এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়। এতে প্রতি মুহূর্তে বায়ুর অক্সিজেন কমছে, আর কার্বন ডাই-অক্সাইড

বাড়ছে। আবার, নানাপ্রকার পচনকারী ছত্রাক, ব্যাক্‌টিরিয়া প্রভৃতি মৃত জীবের উপর ক্রিয়া করে বলে সেগুলি বিয়োজিত হয়। এতেও প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুতে ফিরে আসে। উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর দেহ পোড়ালেও, অর্থাৎ অক্সিজেন সংস্পর্শে দহনকালেও, কার্বন ডাই-অক্সাইড

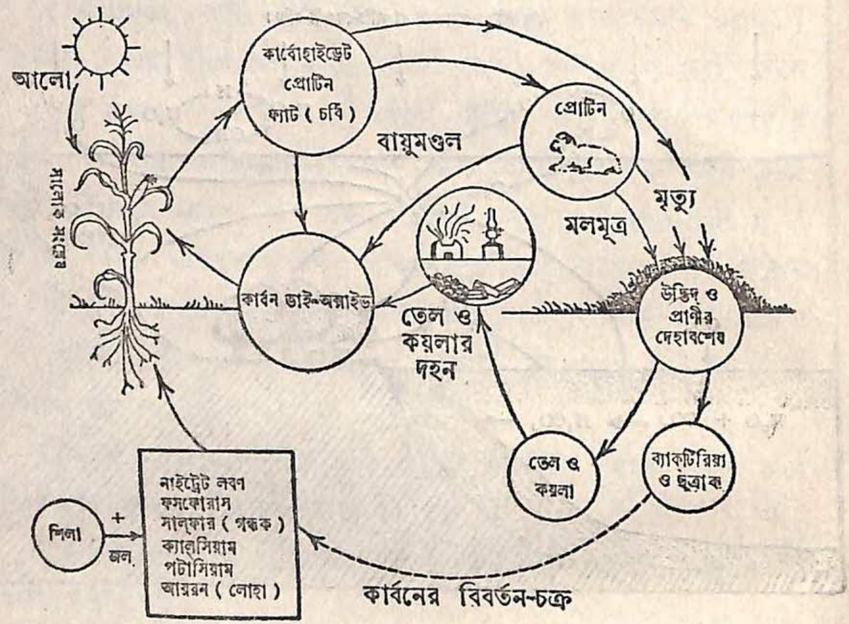


চিত্র ৬৫। অক্সিজেনের বিবর্তন-চক্র।

গ্যাস পাওয়া যায়। তাছাড়া সুদূর অতীতের উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে তৈরি হয়েছে কয়লা ও খনিজ তেল। এদের দহনের ফলেও বায়ুর অক্সিজেন অপসারিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। তবে কি এমন দিন আসবে, যখন বায়ুর অক্সিজেন একেবারে ফুরিয়ে যাবে, আর এতো কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে যে, সব জীব শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে? ভয় নেই, উদ্ভিদ্ আছে বলে সেরকম হতে পারবে না। কারণ, উদ্ভিদ্ এরূপ দূষিত বায়ুকে আবার শোধন ক'রে দেয়।

উদ্ভিদ্ পাতার সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও শিকড়ের

সাহায্যে মাটির রস গ্রহণ করে। সূর্যের আলোয়, উদ্ভিদ্ পাতার সবুজ-কণার (অর্থাৎ, ক্লোরোফিলের) সাহায্যে, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের উপাদান দিয়ে কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য তৈরি করে, এবং অক্সিজেন গ্যাস পরিত্যাগ করে। এর ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ



চিত্র ৬৬। কার্বনের বিবর্তন-চক্র।

ক্রমশ কমছে, আর অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ছে। পৃথিবীতে যদি শুধু উদ্ভিদ্ থাকতো, তাহলে অল্পদিন পরেই বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুরিয়ে যেত, এবং খাদ্যের অভাবে উদ্ভিদও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

দহন ও শ্বাসক্রিয়া, এবং উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়া, সব পাশাপাশি চলছে বলেই বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এই দু'টি গ্যাসের পরিমাণ প্রায় একই রকম থেকে যাচ্ছে।

জল ছাড়াও উদ্ভিদ্ বা প্রাণী কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ, জীবদেহের প্রধান উপাদানই হ'ল জল। সাধারণভাবে জীবিত বস্তুর ৬৫ — ৭৫ ভাগই জল। আর এজন্য জলের আর এক নাম জীবন।

ভূ-পৃষ্ঠের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই জলে ডুবে আছে। পৃথিবীর এই জলের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষিত হবার নয়।

সূর্যের প্রখর তাপে সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল প্রভৃতির জল সর্বদাই বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুর সঙ্গে মেশে। এজন্য ভূ-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে সাময়িকভাবে জলাভাব ঘটে, দেখা দেয় খরা। সেই অবস্থায় উদ্ভিদ্ এবং উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল প্রাণীর জীবন ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

কিন্তু, আবার বর্ষা-সমাগমে, বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়েই মেঘের সৃষ্টি করে, এবং তাই পরে বৃষ্টি আকারে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। সেই জলধারায় খাল-বিল, নদ-নদী সব আবার কূলে কূলে ভরে ওঠে, এবং শুকনো মাটি আবার সরস ও উর্বর হয়। এর ফলে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সহজেই প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। আজকাল বাঁধ দিয়ে বড় বড় জলাধার নির্মাণ ক'রে সেখানে জল সঞ্চয় ক'রে রাখা হয়। প্রয়োজনের সময় তা থেকে জল সরবরাহ ক'রে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সঙ্গে তা থেকে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা হয়।



চিত্র ৬৭। জলের বিবর্তন-চক্র।

জলাভাবে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হওয়া আশ্চর্য নয়, যেমন দেখা যায় রাজপুতনা, সাহারা প্রভৃতি অঞ্চলে।

যুগ যুগ ধরে বায়ুমণ্ডলে এইভাবে জলের আদান-প্রদান চলছে বলেই উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনযাত্রা এতো সহজ হয়েছে।

বায়ু যেন আমাদের দীনবন্ধু দাদার ভাণ্ডার। এ থেকে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী যখন যা দরকার তাই পেয়ে বেঁচে থাকছে। কিন্তু এ ভাণ্ডার কখনও ফুরাবার নয়। এ থেকে যতই খরচ হচ্ছে, প্রকৃতির নিয়মে তা আবার আপনা থেকেই পূরণ হয়ে থাকছে। আর তাইতে পুরাতনের পুষ্টি ও নূতনের সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে।

কিন্তু মানুষের হঠকারিতার ফলে যদি এক্ষেত্রে কোনরকম বিপর্যয় ঘটে, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে ওঠে, কিংবা বায়ুমণ্ডলের কোনো উপাদানের অভাব ঘটে, তবে তার দায়িত্ব হবে সম্পূর্ণরূপে মানুষেরই, আর মানুষকেই তার ফল ভোগ করতে হবে।

নবম পরিচ্ছেদ

পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করার জন্য আমরাই দায়ী

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই পৃথিবীতে জীব প্রধানতঃ তিন রকম—(১) স্বভোজী, অর্থাৎ যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে, যেমন—উদ্ভিদ্; (২) পরভোজী, অর্থাৎ যারা খাদ্যের জন্য প্রধানতঃ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে, যেমন—গরু, মোষ, ছাগল প্রভৃতি শাকাশী প্রাণী, কিংবা প্রধানতঃ তৃণভোজী প্রাণীদের উপরে নির্ভর করে, যেমন—শেয়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী; এবং (৩) মৃতভোজী, অর্থাৎ যারা উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর মৃতদেহ থেকে আহার্য সংগ্রহ করে, যেমন—লাইকেন, ছত্রাক, ব্যাক্‌টিরিয়া ইত্যাদি। এরা কেউই আলাদা ভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। উদ্ভিদ্, প্রাণী এবং পচনকারী ছত্রাক বা জীবাণু সকলেই পরস্পরের সঙ্গে একটি খাদ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, এবং একটি জীবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই জীবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নির্ভর করে তাদের পরস্পরের সম্পর্কের উপর, এবং সেই সঙ্গে ভৌত পরিবেশের উপর, অর্থাৎ মাটি, জল ও বায়ুর উপর। একের ক্ষতি হলে, অন্যের উপরেও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে পরিবেশকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এবং সেই কারণে জীবগোষ্ঠীর উপরে বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু মানুষ তার নিজের কর্মদোষে এই জীবগোষ্ঠীর (সে নিজেও যার অন্তর্ভুক্ত) বিভিন্ন জীবের মধ্যে সম্পর্ক এবং ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। এর ফলে বহু উদ্ভিদ্ ও প্রাণী চিরতরে লোপ পাচ্ছে, এবং তার ফলে মানুষের নিজের অস্তিত্বই এখন বিপন্ন হয়ে পড়ছে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা এই যে, মানুষের হঠকারিতার ফলে, পৃথিবীর পরিবেশের স্থায়ী বিকৃতি ঘটছে, আর সেজন্য তার জীব পালন করার ক্ষমতাও দিন দিন কমে আসছে। এই রকম চলতে থাকলে, অদূর ভবিষ্যতেই এর পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে প্রধানতঃ তিনটি কারণে :—

আমেরিকার 'ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড'-এর সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট, এবং পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা, নরম্যান মায়ার সম্প্রতি বলেছেন,—

"আমরা এখন দৈনিক কম করেও একটি ক'রে প্রজাতি হারিয়ে ফেলছি। বর্তমান দশকের শেষে এই সংখ্যা হয়তো গিয়ে দাঁড়াবে প্রতি ঘণ্টায় একটিতে। অর্থাৎ, তখন প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত হবে উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর কোন না কোন একটি প্রজাতি।

পৃথিবীতে এখন বাস করছে, পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ্। এইভাবে চললে, আগামী ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান তালিকা থেকে হয়তো আমাদের দশ লক্ষ প্রজাতিকে বাদ দিতে হবে। পরবর্তী তিন থেকে পাঁচ দশকে অবস্থাটি আরও শোচনীয় আকার ধারণ করতে পারে। যদি ওই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না করা যায়, এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের আগ্রাসন এখনকার মতই চলতে থাকে, তাহলে তাবৎ প্রজাতির এক-চতুর্থাংশ, হয়তো বা এক-তৃতীয়াংশ, এমন কি অর্ধাংশও চিরকালের মতো অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। যার অর্থ, আমাদের উত্তর-পুরুষরা তখন বাস করবে, প্রাণান্তকর এক পরিবেশে।"

১। যত দিন যাচ্ছে, প্রাকৃতিক পরিবেশে [অর্থাৎ, অজৈব (বা, ভৌত) এবং জৈব পরিবেশে] তত বিপর্যয় ঘটছে, এবং তারই দরুন প্রয়োজনীয় উপাদানের বা কাঁচামালের (অর্থাৎ, খাদ্যের এবং পানীয়ের) অভাব ঘটছে। এর ফলে বিভিন্ন জীবের পক্ষে বেঁচে থাকাই এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

২। অত্যধিক জন-বিস্ফোরণের ফলে নানাভাবে প্রকৃতির উপর চাপ পড়ছে, এবং প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। গাছপালা পশু-পাখি বিনষ্ট হচ্ছে, খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছে, আর সেজন্য অপুষ্টি-জনিত নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

অন্যদিকে বড় বড় শহরে জমছে জঞ্জালের পাহাড়। যত দিন যাচ্ছে, এই পাহাড়-প্রমাণ জঞ্জাল অপসারণ এক গুরুতর সমস্যা হয়ে হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর সেজন্যই সংক্রামক রোগের প্রকোপও ক্রমশ বাড়ছে।

৩। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শিল্প-বিজ্ঞানে

প্রভূত অগ্রগতি করেছে, একথা ঠিক। কিন্তু এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে এমন পার্শ্ব-প্রক্রিয়া ঘটছে, যার ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতেই এর পরিণাম হবে অত্যন্ত মারাত্মক। যেমন—একদিকে কল-কারখানা, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, স্টীমার প্রভৃতির সংখ্যা যত বাড়ছে, জল-দূষণ এবং বায়ু-দূষণের পরিমাণও তত বাড়ছে। অপরদিকে গাছপালার সংখ্যা যত কমছে, বায়ু শোধন করার কাজেও তত বেশী করে ব্যাঘাত হচ্ছে। আবার, ফসলের পক্ষে অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আমরা নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার করছি। কিন্তু এর ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, এবং এভাবে আমরা যে কত দুর্লভ প্রাণী, পাখি আর গাছপালা নিশ্চিহ্ন করে ফেলছি, তার হিসেব কে জানে!

এ বিষয়ে ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্য সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে যা বলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।* ঐ প্রবন্ধের কিছু অংশের উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি :—

সবুজ বিপ্লব, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পদার্থ :

বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য-সংস্থানের তাগিদে জন্ম দিয়েছে 'সবুজ-বিপ্লব'-এর। আর সেই সুবাদে এসেছে অধিক ফলনশীল বীজ, যার জন্য দরকার প্রচুর জল ও সার। অধিক সারের যোগান পেয়ে আগাছাও বাড়ছে দ্রুতগতিতে। আর আগাছা ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য ছড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন রকমের পেস্টিসাইড ও ফাঙ্গিসাইড বা কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক পদার্থ। এই খাতে খরচ ভারতে বেড়েই চলেছে।

সারণী—১ : ভারতে কীটনাশক খাতে খরচ।

সাল			খরচ (কোটি টাকা)
১৯৭০-৭১	...	...	৩১
১৯৭৭-৭৮	...	...	৭৪
১৯৭৮-৭৯	...	...	৯১

* জ্ঞান বিচিত্রা—জুলাই, ১৯৮৬, ২২ পৃষ্ঠা।

বর্তমানে ভারতে কীটনাশক খাতে খরচ একশত কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে, এবং বছরে প্রায় এক লক্ষ টন কীটনাশক পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতে ব্যবহৃত কীটনাশক পদার্থের অন্তত ৭০ শতাংশই মারাত্মক বলে গণ্য, এবং পশ্চিমী দেশগুলিতে নিষিদ্ধ। বিভিন্ন কীটনাশক ও ছত্রাক-নাশক পদার্থ জল, মাটি ও বায়ুকে দূষিত করে চলেছে, এবং খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যাপক জনস্বাস্থ্য সমস্যা তৈরী করছে।



চিত্র ৬৮। পাখির ছানাটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবছে—
বাঃ! কী সুন্দর এই পৃথিবী!
কিন্তু সেতো জানেনা, তার সামনে রয়েছে, কী প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ!

বাজারে টাটকা সতেজ শাকসবজি দেখে ক্রেতারা স্বভাবতই আকৃষ্ট হন। কিন্তু এদের চেহারার চেকনাই-এর পেছনে যে ইতিহাস আছে তা মোটেই সুস্থ বা সুখকর নয়। প্রচুর রাসায়নিক সারের যোগান পেয়ে এবং ক্ষতিকারক কীটনাশক পদার্থের ছত্রছায়ায় এদের বৃদ্ধি ঘটে, আর কীটনাশক পদার্থ গায়ে মেখেই এরা বাজারে হাজির হয়। প্রলোভিত

ক্রেতারা উচ্চমূল্যে এদের গ্রহণ করে অজান্তেই নানারকম শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির শিকার হন।

সারণী—২ : ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা খাদ্য-সামগ্রীতে কীটনাশক পদার্থ।

খাদ্যসামগ্রী	পরীক্ষিত সংখ্যা	দূষিত সংখ্যা	কীটনাশক পদার্থ
গম	৬৫৯	১৯০	ডি. ডি. টি., বি. এইচ. সি., ম্যালাথায়ন।
ধান	৪	৪	ডি. ডি. টি., বি. এইচ. সি.।
ডাল	৩২	১৬	ঐ
তেল এবং তেল-বীজ	৩৯	২৯	ডি. ডি. টি.।
শাকসবজি	৭২৭	৫১৪	ডি. ডি. টি., বি. এইচ. সি., প্যারাথায়ন। ম্যালাথায়ন।
আঙ্গুর	৪৪	৩৬	
দুধ	১৫	১১	ডি. ডি. টি., অ্যাল্ড্রিন।
ডিম	২১	১৪	ডি. ডি. টি., বি. এইচ. সি.।
মাংস	১৮	৫	ডি. ডি. টি., অ্যাল্ড্রিন।

ডি. ডি. টি., অ্যাল্ড্রিন, ডাই-অ্যাল্ড্রিন, এনড্রিন, বি. এইচ. সি., প্যারাথায়ন, ম্যালাথায়ন প্রভৃতি বারোটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্যবিরোধী কীটনাশক পদার্থকে "Dirty Dozen" আখ্যা দিয়ে এদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালিয়েছেন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যার নাম 'পেস্টিসাইড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক' (Pesticide Action Network), সংক্ষেপে

PAN International। গবেষকরা জানিয়েছেন যে, ভারতবাসীদের দেহের মেদে ডি. ডি. টি.র পরিমাণ বিশ্বে সর্বাপেক্ষা বেশী।

সারণী—৩ঃ মানুষের মেদে ডি. ডি. টি.।

দেশ	ডি. ডি. টি. (পি. পি. এম.)
অস্ট্রেলিয়া	১.৮
ইংল্যাণ্ড	৩.৩
পশ্চিম জার্মানী	২.৩
ইস্রাইল	১৯.২
ভারত	১২.৮—৩১

অতিমাত্রায় ব্যবহৃত নাইট্রোজেন সম্বলিত সার বিভাজনের মাধ্যমে নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (গ্যাস) তৈরী করে। নাইট্রোজেনের অক্সাইড আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রপোস্ফিয়ারে বিষাক্ত ওজোন, অ্যাল্‌ডিহাইড, পারক্সো-অ্যাসাইড নাইট্রেট তৈরী করে।

আগাছা নির্মূলের জন্য ব্যবহৃত হয় বিষাক্ত ২, ৪-ডাই-ক্লোরো-ফিনক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (2, 4-Dichloro-phenoxy-acetic acid, বা, 2, 4-D) এবং ২, ৪, ৫-ট্রাই-ক্লোরো-ফিনক্সি-অ্যাসেটিক অ্যাসিড (2, 4, 5-Trichloro-phenoxy-acetic acid, বা, 2, 4, 5-T)। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। আগাছার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছিল ভিয়েতনামী গেরিলারা পরাক্রমশালী মার্কিন সেনাদের সঙ্গে। মার্কিন সেনারা কিছুতেই ভিয়েতনামীদের কাবু করতে পারছিল না। তাই তারা আগাছা নির্মূলের জন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে দিল ৫০ মিলিয়ন লিটার 'এজেণ্ট ওরেঞ্জ'। সে সত্তরের দশকের কথা। 'এজেণ্ট ওরেঞ্জ' আসলে সমপরিমাণ 2, 4-D এবং 2, 4, 5-T-এর মিশ্রণ। আগাছা নির্মূল হল ঠিকই, কিন্তু দেখা দিল ব্যাপক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ক্যান্সার ও মানসিক রোগের শিকার হ'ল শত শত মানুষ। জন্ম হ'ল শত শত বিকলাঙ্গ ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর।



চিত্র ৬৯। অতিরিক্ত ডি. ডি. টি., বি. এইচ্. সি. প্রভৃতি কীটনাশকের প্রভাবে পেলিক্যান পাখির ডিমের খোলস এতো পাতলা ও ভঙ্গুর হয়ে গেছে যে, ডিমে তা দেওয়ার সময়, মা-পাখির দেহের চাপে, ডিম ভেঙ্গে গেছে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে, কীটনাশক পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় প্রতি বছর ২২ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটছে, আর অসুস্থ হচ্ছেন প্রায় ৫০ লক্ষ লোক। যথেষ্ট কীটনাশক পদার্থ ব্যবহারের ফলে প্রকৃতি খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলের মাধ্যমে যে জৈব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করে তা হয়ে পড়েছে একদিকে বিপর্যস্ত; অন্যদিকে কীটনাশক পদার্থের প্রতি কীটপতঙ্গের সহনশীলতাও বেড়ে চলেছে, ফলে কীটনাশক পদার্থের প্রয়োগ মাত্রাও বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন ধানের ক্ষেতে অতিমাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগের ফলে ক্ষেতের ব্যাঙ, কেঁচো, সাপ, ছোটো ছোটো মাছ, এমন কি কাঠঠোকরা, চড়াই, বুলবুল, ফিঙ্গে প্রভৃতি প্রাণীও মারা যাচ্ছে। এরা কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই পোকামাকড়কে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে পোকা দমন করে।"

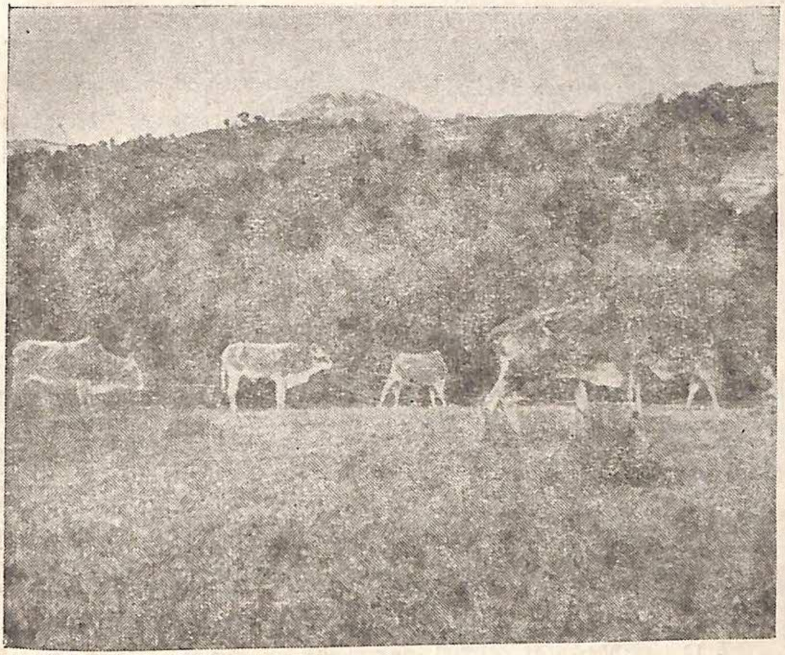
ভৌত পরিবেশের কথা ঃ

ভৌত পরিবেশে কীরূপ বিপর্যয় ঘটছে সে বিষয়ে এখন একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাক।

১। **মাটি**—ডাঙ্গার প্রাণীরা হয় মাটির উপরে, নয়তো মাটির নীচে বিবরে, কিংবা গাছের উপরে, বাস করে; এবং তারা সকলেই প্রকৃতির বুকে, নির্বাচিত স্থানে, বাসা বানিয়ে সেখানে থাকে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমাগত বন কেটে বসতি গড়ে তুলছে। এইভাবে গড়ে উঠছে গ্রাম-গঞ্জ-শহর। আর জনসংখ্যা যত বেড়েছে, মানুষের আগ্রাসী মনোভাবও তত বেড়েছে, শুরু হয়েছে এক অশুভ প্রতিযোগিতা। কে কার চেয়ে বেশী জমি দখল ক'রে নিতে পারবে, তারই প্রতিযোগিতা। এজন্য একের পর এক বনভূমি বিনষ্ট হয়েছে। আর সেই সব জায়গায় গড়ে উঠেছে বড় বড় শহর-বন্দর, কল-কারখানা প্রভৃতি। এর ফলে একদিকে যেমন গাছপালা ধ্বংস হয়েছে, অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন প্রাণীর বাসস্থান নির্মাণের জায়গা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। তাদের পক্ষে বেঁচে থাকাই একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

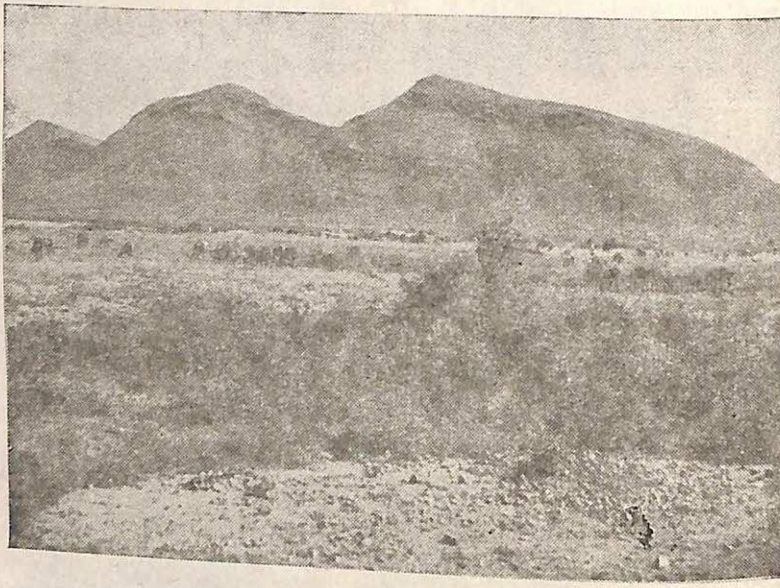
ভূমিক্ষয়ের প্রথম পর্ব—



চিত্র ৭০। অবাধ গোচারণের ফল —আগে যেখানে সরল বৃক্ষের বন ছিল (দূরে তাদের কিছু কিছু নমুনা এখনও দেখা যাচ্ছে), আজ সেই অঞ্চল একেবারে বৃক্ষহীন। অবাধ গোচারণের ফলে তৃণভূমিও প্রায় শেষ অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। (শিলং—আসাম)। [আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীমুরারি প্রসাদ গুহ]

এ দেশের বেশীর ভাগ মানুষই ভূমি-নির্ভর, এবং অত্যন্ত গরীব। সুতরাং, তাদের ভালমন্দ, বেঁচে থাকা, সবকিছুই নির্ভর করে প্রধানতঃ জমির ভালমন্দের উপরে। প্রয়োজনের তাগিদে আমরা অনেক জায়গায় বনভূমির সব গাছপালা কেটে ফেলেছি, অবাধে গোচারণ ক'রে তৃণভূমির আস্তরণ নষ্ট ক'রে ভূমিক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করেছি, নদীতে বাঁধ দিয়ে তার গতিরোধ করেছি, নদীর গতিপথ বদলে দিয়েছি, এমনকি সমুদ্রে বাঁধ বেঁধে জমি পুনরুদ্ধার করেছি—এইরকম আরও কত কি আমরা করেছি! এইভাবে, বলতে গেলে, একটা বিরাট এলাকার ভৌগোলিক চেহারাটাই আমরা পাল্টে দিয়েছি। পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে, অর্থাৎ ক্রমাগত ঘটেই চলেছে।

ভূমিক্ষয়ের দ্বিতীয় পর্ব—



চিত্র ৭১। উপরের সবুজ আস্তরণ বিনষ্ট হওয়ার পর, জল ও বাতাসের ক্রিয়ায়, মূল্যবান মৃত্তিকাস্তর অপসারিত হওয়ার ফলে ধ্বংসের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। অদূরে, উপত্যকার তৃণভূমি শেষ অবস্থায় পৌঁচেছে, তবুও অবাধ গোচারণ চলছে—ভূমিক্ষয়ের ফলে এই মাটিও একদিন বন্ধ্যা হয়ে যাবে। দূরে, ওর্নিপেটা পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে। (অন্ধ্রপ্রদেশ)

[আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীমুরারি প্রসাদ গুহ]

মানুষের এই কৃতকর্মের ফলে যে শুধু জীবগোষ্ঠীর মধ্যেই বসবাসের এবং জীবন-ধারণের নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তা নয়, এজন্য মানুষের জীবনও ক্রমশ সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে।

নাগরিক সভ্যতার মোহে আমরা নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস করেছি, সবুজের আস্তরণ বিনষ্ট করেছি। কিন্তু প্রকৃতি আমাদের ক্ষমা করেনি, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমাদের বাধ্য করছে। কারণ, এরই ফলে দারুণ অভিশাপের মতো কখনও নেমে আসছে প্রচণ্ড খরা, আবার কখনও ধেয়ে আসছে বিধ্বংসী বন্যা। আর প্রতি বছরই

একটু একটু ক'রে ভূমিক্ষয় হওয়ার দরুণ, উর্বরা মাটি ক্রমশ হয়ে উঠছে অনুর্বর, চাষের অযোগ্য, কিংবা একেবারে বন্ধ্যা। তারপর এক দিন তা হয়তো একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

> "ভূমি সংরক্ষণ বিষয়টি আজ আমাদের ভাবনার বিষয়। গাছপালা কমে যাওয়ার ফলে গাছের শিকড় আজ উর্বর মাটিকে (Top-soil) আর ধরে রাখতে পারছে না। ফলস্বরূপ বৃষ্টি ও বাতাসের মাধ্যমে মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে ও আস্তে আস্তে উর্বর জমি মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে।
>
> কয়েক বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে যে, কয়েকটি সরকারী ও বে-সরকারী সংস্থা কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ আহরণের জন্য 'Open cast' মাইনিং-এর সাহায্য নিচ্ছেন, এবং খনিজ আহরণের পর জমিগুলো পূর্বাবস্থায় ফিরে নিয়ে যাওয়ার কোনরূপ চেষ্টা করছেন না। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বনভূমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার উপর রয়েছে অসংখ্য ইট-ভাটা ও বালির খাদ। যা আস্তে আস্তে কিন্তু খুবই নির্দিষ্টভাবে উর্বর জমির বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে।"
>
> —ভবানী মুখার্জী
>
> [পরিবেশ-মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ]

অন্যদিকে বন্যাতাড়িত পলি জমার ফলে, প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত জলাধারগুলি মেয়াদের অনেক আগেই ভরে উঠছে, এবং অকেজো হয়ে পড়ছে। আর বড় বড় বহু নদীর নাব্যতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

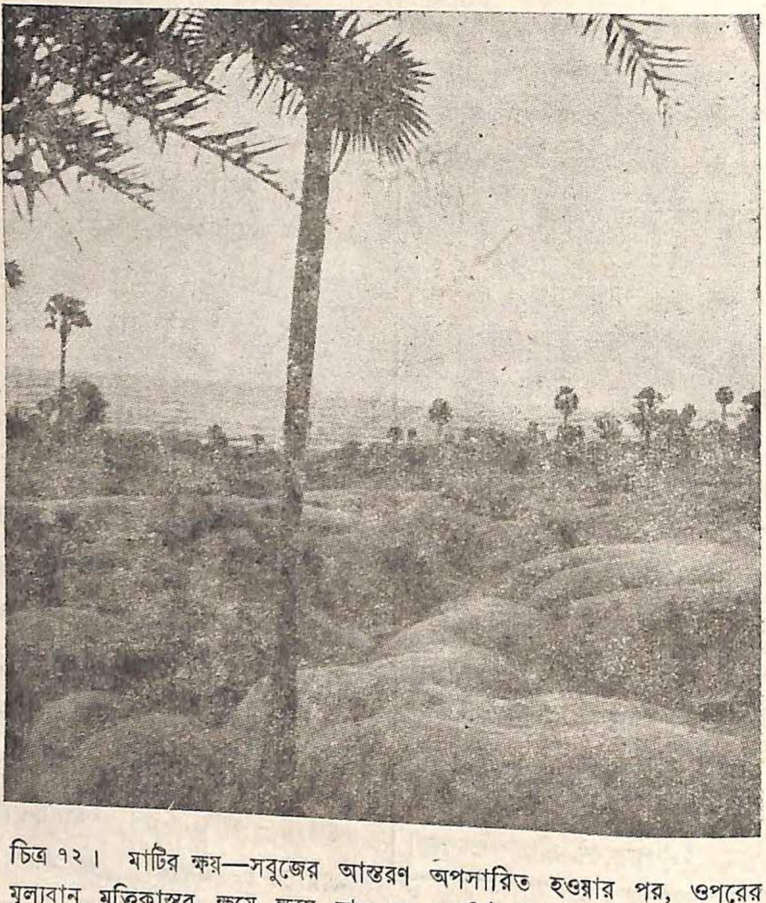
আর একটা কথা। বায়ুতে যে পরিমাণ অক্সিজেন আছে, তার একটা বিরাট অংশ অবিরত ক্ষয় হচ্ছে জীবের শ্বাসক্রিয়ার এবং নানাবিধ দহন-ক্রিয়ার ফলে। কিন্তু এর প্রায় সবটাই আবার প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে বনভূমি ও তৃণভূমিতে, উদ্ভিদের অঙ্গার - আত্তীকরণ - প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ইদানীং যে মাত্রায় বনভূমি ও তৃণভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে, তাতে ভয় হয় যে, শীগ্‌গিরই হয়তো বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের অভাব ঘটবে। আর তাহলে তখন অধিকাংশ জীবের পক্ষেই বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠবে।

২। **জল**—জীবন ধারণের জন্য জল একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। তাই জলের আর এক নাম জীবন।

বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন যে, এই পৃথিবীতে জীব-জগতে

প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ ঘন কিলোমিটার মিষ্টি জলের প্রয়োজন। এই জল প্রধানতঃ পাওয়া যায় পুষ্করিণী, খাল-বিল, হ্রদ, নদ-নদী প্রভৃতি থেকে।

ভূমিক্ষয়ের শেষ পর্ব—



চিত্র ৭২। মাটির ক্ষয়—সবুজের আস্তরণ অপসারিত হওয়ার পর, ওপরের মূল্যবান মৃত্তিকাস্তর ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাও বা অবশিষ্ট ছিল তাও বৃষ্টির জলে ধুয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। চারিদিকে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় অসংখ্য খাত। বৃষ্টির জল এদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হলেই খাত কাটার কাজ শুরু হয়ে যায়, এবং তার ফলে নূতন ক'রে খাতগুলি ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হয়।
[ওয়ালটেয়ার—অন্ধ্রপ্রদেশ] [আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীমুরারি প্রসাদ গুহ]

গ্রীষ্মকালে এসব অনেক শুকিয়ে যায়, কিন্তু প্রতিবছর বর্ষাকালে বৃষ্টি-মারফৎ প্রায় ৩৭,০০০ ঘন কিলোমিটার টাটকা জল আবার ফিরে পাওয়া যায়।

সুতরাং, জীব-জগতের প্রয়োজন মিটিয়েও বেশ খানিকটা উদ্‌বৃত্ত থাকার কথা। অবশ্য এই জলের কিছুটা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কিছুটা বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মিশে যায়, আর বেশ খানিকটা নদী-পথে বয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এইসব অপচয়ের কথা মনে রেখেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বর্তমানে জীব-জগতে মিষ্টি জলের অভাব হওয়ার কোনো কারণ নেই।

শুনতে হয়তো অবাক লাগবে যে, এই মিষ্টি জলের পরিমাণ মোট জলের ৩ শতাংশ মাত্র। সে তুলনায় সমুদ্র-জলের পরিমাণ অনেক অনেক বেশী (প্রায় ৯৭ শতাংশ)। অবশ্য কিছু জল সঞ্চিত আছে আমাদের নাগালের বাইরে ; যেমন—ভূগর্ভে সঞ্চিত জল (০·১ শতাংশ), এবং হিমবাহে আবদ্ধ জল (২·১ শতাংশ)। এ সবের সদ্ব্যবহার খুবই কঠিন এবং ব্যয়-সাপেক্ষ।

খুবই দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষের অবিবেচনা-প্রসূত অন্যায় কাজের ফলে, মিষ্টি জলের এই সামান্য পুঁজিও ক্রমশ

> “জলের আরেক নাম জীবন। এই জীবনদায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ আজ ভীষণ-ভাবে কলুষিত। গৃহস্থালী, কলকারখানা থেকে নির্গত অশোধিত জল আমাদের নদ-নদী, সরোবর, পুকুর ইত্যাদি ক্রমশঃ ব্যবহারের অযোগ্য ক'রে তুলছে। অধিক ফসল ফলাতে আজ আমরা বিপুল পরিমাণে ব্যবহার করছি রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ। এই দ্রব্যগুলি যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ব্যবহার না করার ফলে কৃষিভূমি হইতে নির্গত জল আমাদের নদ-নদীকে দূষিত করছে। D. D. T., B. H. C. প্রভৃতি কীটনাশক দ্রব্যগুলির বিশেষ ত্রুটি হল যে, এরা কীটের বিনাশ ঘটিয়েও পরিবেশে বহুদিন থেকে যায় এবং জল ও বায়ুর মাধ্যমে বহুদূরে গিয়ে সেখানকার পরিবেশ দূষণ করে। এই পর্যায়ের কীটনাশক দ্রব্যগুলি আমাদের খাদ্যের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের শরীরে স্থায়ী বাসা বাঁধে, তাছাড়া এগুলো নদী-নালা-পুকুর ইত্যাদিতে মাছের বিশেষ ক্ষতি করে। তাই আজ চিন্তা করা হচ্ছে, কি ভাবে আমরা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করতে পারি, যাহা কীটের বিনাশ করে পরিবেশ থেকে আপনা-আপনি বিলীন হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমাদের দেশে কিছু অগ্রগতিও হয়েছে।”
>
> —ভবানী মুখার্জী
>
> [পরিবেশ মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ]

কমে আসছে। কারণ, বড় বড় শহরের মলমূত্রসহ নর্দমার নোংরা জল, কল-কারখানার বর্জিত দূষিত পদার্থ, জীবজন্তুর মৃতদেহ প্রভৃতি নিক্ষেপের ফলে, অধিকাংশ নদ-নদীর জলই ক্রমশ দূষিত এবং পানের অযোগ্য হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, আজকাল অধিকাংশ স্থানেই শস্যক্ষেত্রে ব্যাপক-ভাবে কীটনাশক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করা হচ্ছে, আর বৃষ্টির জলে ধুয়ে সেগুলি খাল-বিল বা নদ-নদীতে গিয়ে পড়ছে। তার ফলে এসব জল ক্রমশ দূষিত এবং পানের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এই রকম দূষিত জল পান করার ফলেই যে নানারকম ব্যাধির প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাছাড়া এরকম জলে মাছের পক্ষেও বেঁচে থাকা কঠিন।

আর একটি কথা। আমাদের দেশে পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, নদ-নদী প্রভৃতি সর্বত্রই বাসন মাজা, কাপড়-কাচা, স্নান করা, গরু-মোষকে স্নান করানো প্রভৃতি সবই একসঙ্গে চলে। এর ফলে নানারকম রোগ-জীবাণু খুব সহজেই সংক্রামিত হতে পারে; যেমন—আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, ভাইর্যাল জণ্ডিস (বা, ন্যাবা) প্রভৃতি। স্বাভাবিক জীবন-যাপনের পক্ষে এটাও একটা গুরুতর সমস্যা। আর এই সমস্যা সৃষ্টির জন্য আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহুলাংশে দায়ী।

৩। বায়ু—বায়ু ছাড়া আমরা এক মূহূর্তও বেঁচে থাকতে পারি না। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, একই বায়ু আমরা সকলেই গ্রহণ করতে বাধ্য হই। যে বায়ু আমি নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিত্যাগ করলাম, আমার পার্শ্ববর্তী বন্ধুটি, কিংবা আমার ছোট্ট ছেলেটি, হয়তো সেই বায়ুই গ্রহণ ক'রল প্রশ্বাসের সঙ্গে। আমার বাড়িতে যে বায়ু বইছে, অমার প্রতিবেশীর বাড়ীতেও সেই বায়ুই প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র কোনো প্রভেদ নেই। সকলেই তা গ্রহণ করছে সমানভাবে, নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে। তুই বাড়ির মধ্যে, কিংবা তুই দেশের মধ্যে, দেওয়াল তুলে বায়ুর সীমানা নির্দেশ ক'রে দেওয়া যায় না, কিংবা বায়ুর প্রবাহ বন্ধ ক'রে দেওয়া যায় না। বায়ু-দূষণের প্রশ্নটি তাই জল-দূষণের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জল-দূষণের প্রশ্নটি অনায়াসে একটি

নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যায়। তাছাড়া পানীয় জল সহজেই শোধন ক'রে নেওয়া যায়। কিন্তু বায়ুর বেলায় তা সম্ভব হয় না। কারণ,



চিত্রঃ৭৩। কয়লার উনুন থেকে উৎসারিত ধোঁয়া বাতাসকে কলুষিত করছে।

বায়ু-দূষণ কোনো নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। দূষিত বায়ু অতি সহজেই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় প্রবেশ করতে পারে, যেমনটি সম্প্রতি ঘটেছিল ভূপালে।

আমরা সকলেই জানি, গভীর রাত্রির অন্ধকারে, সার-কারখানার আধার থেকে বিষাক্ত গ্যাস [মিথাইল আইসো-সায়ানাইড, সংক্ষেপে 'মিক্' (MIC)] লিক্ ক'রে বেরিয়ে ভূপালের একটা বিস্তীর্ণ এলাকার বাতাসকে বিষাক্ত ক'রে দেয়, এবং শত শত ঘুমন্ত মানুষকে মৃত্যুর মুখে

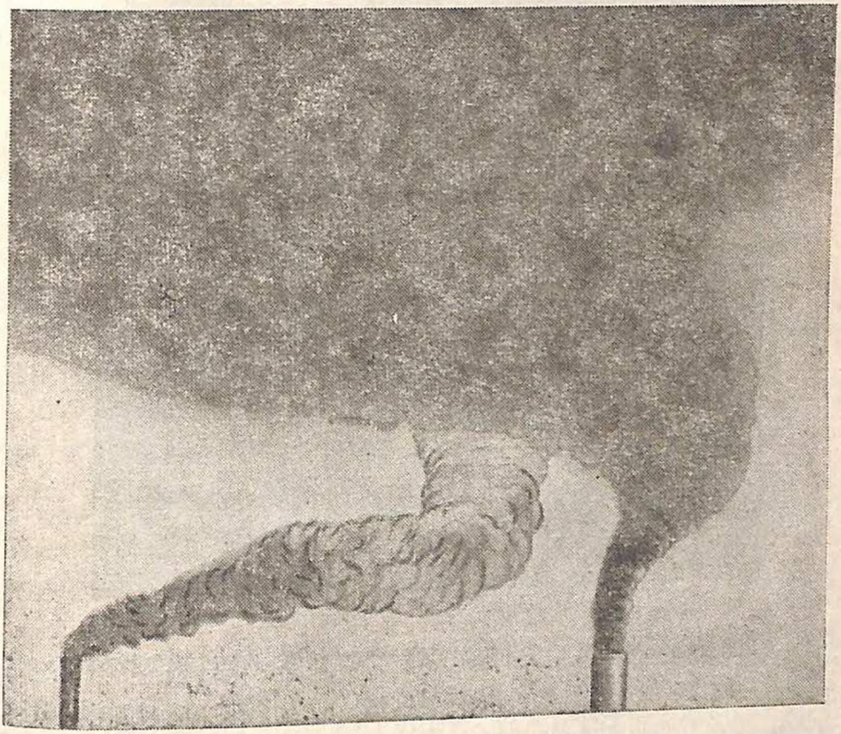
ঠেলে দেয়। একটি খবরে প্রকাশ, এই দুর্ঘটনায় প্রায় দু'হাজার মানুষ প্রাণ হারায়, এবং দশ হাজার মানুষ ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া গরু-মোষ, ছাগল-ভেড়া যে কত মারা যায়, তার কোনো হিসেব নেই। কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

> "কলকারখানা, পেট্রোল ও ডিজেল চালিত যানবাহন ও উনুন থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ সর্বক্ষণ আমাদের বাতাসকে করছে দূষিত। বাতাস দূষণ নিবারণের আইনের সাহায্যে বায়ু-দূষণ নিবারণের চেষ্টা হচ্ছে, এবং এ বিষয়ে বিগত কয়েক বৎসরে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, নতুন কয়লা-চালিত বিদ্যুৎ কারখানাগুলি পুরোনো উনুনগুলি থেকে অনেক কম ধোঁয়া ছাড়ে, কারণ এই কারখানাগুলিতে ইলেক্‌ট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর বসানো হয়েছে। সম্প্রতি যান-বাহনের ধোঁয়া নিবারণের জন্য কলকাতা শহরাঞ্চলে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, এবং অন্যান্য কলকারখানার উপরও তাদের নির্গত বায়ু ও গ্যাসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কড়া দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।"
>
> —ভবানী মুখার্জী [পরিবেশ-মন্ত্রী, পঃ বঃ]

আবার, আমরা এও জানি যে, তাপ ও শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গত দু'শ বছর ধরে জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহৃত হচ্ছে, আর পেট্রোলিয়াম-জাত নানাপ্রকার জ্বালানি (যেমন—পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদি) ব্যবহৃত হচ্ছে প্রায় একশ' বছর ধরে। বর্তমানে এইসব জ্বালানির দহনের ফলে উৎপন্ন ধোঁয়াই হ'ল বায়ু-দূষণের সর্বপ্রধান কারণ। রান্না-ঘরের উনুন, কল-কারখানার চিমনি, স্টীম-ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন প্রভৃতি থেকে অবিরত যে-সব ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে, সেগুলি বাতাসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে বাতাস অবিরত কলুষিত হচ্ছে। কারণ, এর ফলে বাতাসের সঙ্গে মিশছে ভুসোকালি (soot) বা কার্বন-কণা (carbon-particles), কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি। এছাড়া অনেক কারখানা থেকেই নির্গত হচ্ছে ক্লোরিন, নাইট্রোজেনের অক্সাইড-সমূহ, সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস।

সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উপরের বায়ুস্তরে গিয়ে জলীয় বাষ্পের

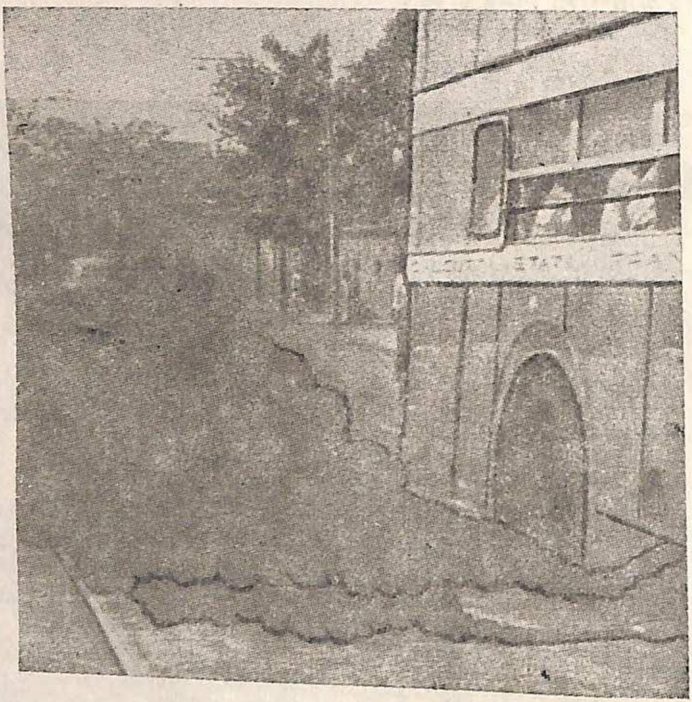
সঙ্গে বিক্রিয়া ক'রে তৈরি করে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড কুয়াশা এবং বৃষ্টি-বিন্দুর সঙ্গে মিশে নেমে আসে হ্রদের জলে, বনাঞ্চলে, কৃষিজমিতে এবং লোকালয়ে। এর ফলে মাছের উৎপাদন কমছে, বনাঞ্চলের গাছপালা বিনষ্ট হচ্ছে।



চিত্র ৭৪। শিল্প-নগরীতে কল-কারখানার চিমনি থেকে উৎসারিত ধোঁয়া অবিরত বাতাসকে কলুষিত করে।

উপরিউক্ত বিষাক্ত গ্যাসসমূহ আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং, ফ্যাক্টরি বা কলকারখানার পরিবেশ যাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয়, এবং সর্বদা দূষণ-মুক্ত থাকে, সেদিকে সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার।

শীতকালে বড় বড় শহরের বয়ুমণ্ডলের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। কারণ, তখন সৃষ্টি হয় 'ধোঁয়াশা' (ধোঁয়া+কুয়াশা)। এ জিনিস স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, বিশেষ ক'রে যারা হাঁপানিতে ভোগেন।*



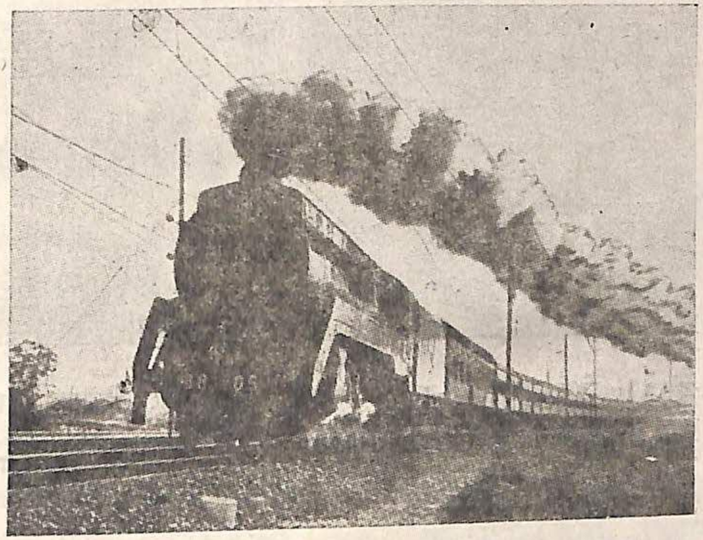
চিত্র ৭৫। শহরের রাস্তায় যাত্রীবাহী বাসের ধোঁয়া অহরহ বাতাসকে কলুষিত করে। ['দেশ' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।]

---

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫ সালে সমগ্র ভারতে প্রায় দশ কোটি টন কয়লা ও তিন কোটি টন তেল পুড়িয়ে প্রায় এক কোটি টন অ্যাসিড বাষ্প বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর প্রায় ৪০ শতাংশ এসেছে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে।

আগে কুয়াশা বলতে বোঝাত, হিতকর জলকণা, কিন্তু এখন তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অ্যাসিড-কণা। এইরূপ অ্যাসিড মিশ্রিত কুয়াশা গাছপালা, ঘরবাড়ি, কাগজপত্র, খাদ্যশস্য, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই কারণে দীর্ঘস্থায়ী কুয়াশা এখন পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

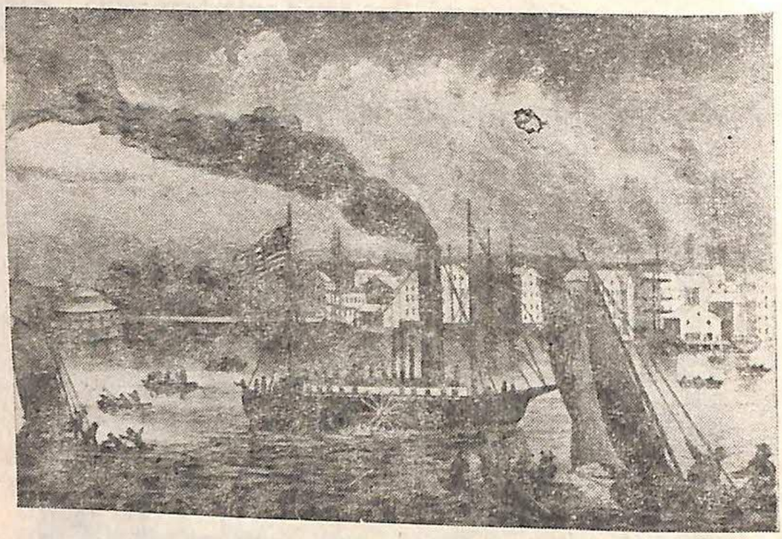
এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার যে, আমাদের অসাবধানতার ফলেই নানা প্রকার বায়ু-বাহিত ব্যাধির জীবাণু যেমন—ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা প্রভৃতি) বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগ সংক্রমিত করে। শহরের ঘিঞ্জি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশও এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। সুতরাং, এসব বিষয়েও আমাদের প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।



চিত্র ৭৬। রেল-ইঞ্জিনের ধোঁয়া বাতাসকে কলুষিত করে।

ক্রমাগত বায়ু-দূষণের ফলে কিছু সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ঘটারও সম্ভাবনা আছে। যেমন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, ১৮৬০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত, গত একশ' বছরে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ আগের চেয়ে প্রায় ১৪ শতাংশ বেড়ে গেছে। এজন্য আমাদের যে শুধু আগের চেয়ে বেশী ক'রে শ্বাসকষ্ট অনুভব করতে হচ্ছে, তা নয়, এর ফলে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতাও ক্রমশ বাড়ছে। ক্রমাগত এইরকম হতে থাকলে, অদূর ভবিষ্যতেই এমন একদিন আসবে, যখন মেরু-প্রদেশের বরফের টুপি (Ice-cap) এবং হিমবাহ সব গলে যাবে, আর সেই জল জমে সমুদ্রের জল-তল এতটা উঁচুতে উঠে যাবে যে,

অনেক মহাদেশই তখন জলের নীচে তলিয়ে যাবে। কী সাংঘাতিক কথা!



চিত্র ৭৭। শিল্প-নগরীর কল-কারখানার ধোঁয়ার সঙ্গে মিশছে স্টীমারের ধোঁয়া।

এইসব কারণে বায়ু-দূষণ নিবারণের জন্যে আমাদের সকলেরই সমবেতভাবে চেষ্টা করা দরকার।

বাতাসের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যবস্থার কথা বিজ্ঞানীরা বলেছেন :—

(১) কলকারখানা থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস শোধন, এবং তা থেকে ভাসমান কঠিন পদার্থ অপসারণ। এরই নাম—Air Pollution Control System.

(২) পেট্রোল ও ডিজেল-চালিত যান থেকে নির্গত দূষিত গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ ও শোধন, যাতে তার মধ্যে কার্বন-কণা এবং কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ যথাসম্ভব কম থাকে।

(৩) গৃহস্থালীর কাজে যথাসম্ভব ধোঁয়াহীন জালানীর ব্যবহার ; যেমন—গুল-কয়লা, কেরোসিন কিংবা জ্বালানি গ্যাস (Light-Petroleum Gas)।

(৪) ধোঁয়াহীন উনুনের ব্যবহার। এতে জ্বালানীর সদ্ব্যবহার হয়, বেশী তাপ পাওয়া যায়, এবং বায়ু-দূষণ কম হয়।

(৫) ব্যাপকভাবে শিল্পাঞ্চলে এবং অন্যত্র বৃক্ষ-রোপণ এবং সামাজিক বন-সৃজন, যাতে বায়ুমণ্ডল থেকে আরও বেশী করে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অপসারিত ক'রে তার বদলে অক্সিজেন ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়।

এই বৃহৎ কর্ম-যজ্ঞে সর্বস্তরের সব মানুষের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

জৈব পরিবেশের কথা :

ভৌত পরিবেশের সঙ্গে জৈব পরিবেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এজন্য ভৌত পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জৈব পরিবেশেরও নানারকম পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। সুতরাং, এ বিষয়েও একটু আলোচনা করা দরকার।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শিকারী চিতাবাঘ এক সময় উত্তর ভারতের একটি প্রধান মাংসাশী বন্য-প্রাণী ছিল। এরা সাধারণতঃ কৃষ্ণসার হরিণ (Black buck) শিকার ক'রে খেত। চিতাবাঘের সুন্দর চামড়ার লোভে, কিংবা নিছক শিকার করার আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে, এদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এজন্য এই রকম চিতা এক সময় প্রায় লোপ পেয়ে যায়। এর ফলে কৃষ্ণসার হরিণের সংখ্যা ধীরে ধীরে এতো বেড়ে যায় যে, তারা একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘাসপাতা গাছপালা সব খেয়ে উজাড় ক'রে দেয়। এর ফলে সেখানে দেখা দেয় খাদ্যাভাব। তাই এদের সংখ্যা আবার ক্রমশঃ কমতে থাকে। আর খাদ্যাভাবের দরুণ, নিতান্ত বাধ্য হয়েই তারা তখন অন্যান্য এলাকার দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কিন্তু এদিকে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। তৃণভূমির সবুজ আস্তরণ বিনষ্ট হওয়ায়, সেখানে আরম্ভ হ'ল ভূমিক্ষয়। তারপর ধীরে

ধীরে সেই অঞ্চল একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেল। কী ভয়ানক ব্যাপার!

উল্লেখ্য যে, অবাধ গোচারণের ফলে একই ভাবে একটা বিরাট এলাকার ঘাসের আস্তরণ বিনষ্ট হয়। তখন সেখানে আরম্ভ হয় ভূমিক্ষয়। এর ফলে সেই এলাকাটি এক সময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে, এরূপ সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং, এ বিষয়ে সকলেরই সচেতন এবং সাবধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।*

এই প্রসঙ্গে ডেভিড অ্যাটেনবরোর বর্ণনা মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। "দ্য লিভিং প্ল্যানেট, এ পোর্ট্রেট অব দি আর্থ" গ্রন্থে তিনি বলেছেন,—

"ঘাসের প্রয়োজন কিছু বৃষ্টির। আফ্রিকার 'সাভানা'র মধ্য দিয়ে তোমরা যখন এগিয়ে চলেছ উত্তরে, বৃষ্টিপাত কমছে এবং জমি শুষ্কতর হচ্ছে। কাঁটা-ঝোঁপঝাড়গুলো এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছিটানো এবং ঘাসের পরিমাণ কম। তোমরা আর হরিণের দলকে দেখার আশা করবে না। এমন কি, পায়ের নীচে শুকনো বালিতে জীবজন্তুর পদচিহ্নও দুর্লভ। তোমরা তখন অন্য পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছ—সেটি মরুভূমি।"

---

* The Statesman (21.10.85):

Nairobi, October 20.—Researchers trying to halt the spread of Africa's deserts are looking for help from one of the few creatures that thrive there—the camel, reports A.P.

The researchers maintain that camels gradually should replace cattle in areas threatened with becoming deserts, because they are far less destructive to the environment during droughts, yet produce more milk.

"Historically, camels arrived in a region only after the desert was created," said Mr. Daniel Stiles, a Nairobi-based desertification expert working for the U. N., "perhaps if the camel were to arrive before, the desert wouldn't follow."

While cattle expose the earth by eating grass and tearing the ground with their hooves, camels eat mostly shrubs and tree-leaves and have padded feet.

A Kenyan, who is chief technical adviser to UNESCO'S integrated project on arid lands, said, the camel appeared to be the ideal animal for herdsmen in dry areas not yet overtaken by desert.

When drought hit northern Kenya in 1984, he said, virtually all the camels survived while half the goats and cattle in some areas died.

শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,—"যুগ যুগ ধরে ব্যাঘ্রকুল কি শিশু, কি যুবা বা কি বৃদ্ধ সকলেরই সমান কৌতূহলের বস্তু। কিন্তু এ প্রাণিকুলের আহার্য. বাসস্থান প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির ওপরে আমরা মানুষেরা চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছি। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে ও প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টিকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার সঙ্কল্প নিয়ে গঠিত হয়েছে 'ব্যাঘ্র প্রকল্প'। ব্যাঘ্র প্রকল্প তাই কেবলমাত্র বাঘকে বাঁচানোর প্রকল্পমাত্র নয়, এটা বস্তুতপক্ষে একটা প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রকল্প। তার মাধ্যমে প্রকৃতির সুষ্ঠ ও অপরিহার্য ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। কারণ জীব-বিজ্ঞানরূপ পিরামিডের শীর্ষ বিন্দুতে রয়েছে এ বাঘ। কাজেই এ প্রাণী অন্য যে সকল প্রাণীর উপর নির্ভরশীল তাদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত নিয়ে সৃষ্ট এ বিরাট এ জটিল সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার মধ্যেই ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছে। মানুষের ক্ষমাহীন অবহেলার ফলে এক সময় চরম মুল্য দিতে হয়েছিল, যখন জাভা দেশীয় গণ্ডার ও বন্য মহিষ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল থেকে লুপ্ত হল। সুন্দরবনের বাঘকে যাতে সেই অবহেলার যুপকাষ্ঠে বলি হতে না হয় তারই সময়োপযোগী পদক্ষেপ হচ্ছে এ ব্যাঘ্র প্রকল্প।"*

ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় মাংসের জন্য ব্যাঙের পিছনের দু'টি ঠ্যাংয়ের খুব চাহিদা আছে। এজন্য আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার ব্যাঙ ধরে তাদের ঠ্যাং বিদেশে চালান দেওয়া হয়। আর সাধারণতঃ এইসব ব্যাঙ ধরা হয় ধানখেতের আশেপাশের জলা জায়গা থেকে।

> আনন্দবাজার পত্রিকা (৬।৩।৮৭)
> ব্যাঙ রফতানি বন্ধ :
> নয়াদিল্লী, ৫ মার্চ—দেশ থেকে ব্যাঙের ঠ্যাং রফতানি বন্ধ করে দেওয়া হল। এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন ১৯৭২-এর বিশেষ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাঙকে 'সংরক্ষণের জন্য বিশেষ মর্যাদা' দেওয়া হল। বন ও পরিবেশ মন্ত্রক আজ এখানে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, চাষের কাজে অনিষ্টক্যরী বিভিন্ন পোকামাকড় এবং মশা নিয়ন্ত্রণে ব্যাঙের উপযোগিতা ভালভাবেই প্রমাণ হয়ে গেছে। —ইউ. এন. আই

* রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা (১০ নভেম্বর, ১৯৮৫): ব্যাঘ্র-অভয়ারণ্য—কল্যাণ চক্রবর্তী, দ্রস্টব্য।

"বছর পাঁচেক আগে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গায় এক ব্যাপক সমীক্ষা চালিয়ে 'সেণ্টার ফর স্টাডি অব ম্যান অ্যাণ্ড এনভায়রণমেণ্ট' যে বিপজ্জনক তথ্য পেয়েছেন তাতে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল। হৃষীকেশ থেকে গঙ্গাসাগর ইস্তক প্রায় দু' হাজার কিলোমিটার দীর্ঘপ্রবাহে কি পরিমাণ আবর্জনা আর দস্তা সীসা পারদ জাতীয় ভারী ধাতু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ নিয়মিত মিশ্রিত হচ্ছে তার যথাযথ পরিমাপ এখনো হয়নি। গঙ্গাকুলীন দু'একটি শহরের সরকারী খতিয়ান দিলেই কিছুটা অনুমান করা যাবে। কানপুরে ছেষট্টিটি কারখানা নির্বিচারে তাদের বর্জ্য পদার্থ ঢেলে চলে। বারাণসীতে প্রতিদিন ৬ কোটি লিটার দূষিত পদার্থ গঙ্গায় পড়ছে। কলকাতা শহরতলীতে চল্লিশটিরও বেশী কারখানা প্রতিদিন ৩ লক্ষ ৭৯হাজার কিলোগ্রাম যোগান দিচ্ছে। ফলত নিম্নবঙ্গ হয়ে উঠেছে জলভাগাড়। এ রাজ্যের অন্তত ৪ কোটি ৭০ লক্ষ জন স্বাস্থ্য আজ সমূহ বিপন্ন।"

[সম্পাদকীয়—'দেশ'—১৫ চৈত্র,১৩৯২ ; ২৯ মার্চ, ১৯৮৬]

নানারকম পোকা-মাকড়, মশা, মশার বাচ্চা প্রভৃতি ব্যাঙের প্রিয় খাদ্য। ব্যাপক হারে ব্যাঙ ধ্বংস করার ফলে ফসলের পক্ষে অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের সংখ্যা বাড়ছে। তার ফলে ফসলের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া মশার সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়ছে। এদিকে মশার উপদ্রব যত বাড়ছে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপও তত বাড়ছে। খুবই চিন্তার বিষয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এজন্য বিজ্ঞানীরা সাবধান ক'রে বলছেন যে বিদেশে ব্যাঙের ঠ্যাং রপ্তানী করা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। নতুবা, পরে এজন্য আমাদের অনুতাপ করতে হবে।

আমরা জানি, এক সময় গঙ্গায় প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বর্ষাকালে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ মাছ গঙ্গার মোহনা দিয়ে ঢুকে পড়তো, আর স্রোতের বিরুদ্ধে উজিয়ে যেত। এই অবস্থায় শত শত ইলিশ মাছ জেলেদের জালে ধরা পড়তো। আর সুস্বাদু ইলিশ মাছ খেয়ে তৃপ্তিলাভ ক'রত এদেশের হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু এখন আর তা হয় না। এর কারণ কী?

বিজ্ঞানীরা বলেন, গঙ্গা এখন অনেক বুঁজে গেছে ব'লে জলের প্রবাহ এখন কমে গেছে, সেরকম স্রোত আর নেই। তাছাড়া গঙ্গা নদীর

দুই তীরে ৪৮-টি বড় শহর এবং ৬৬-টি ছোট শহর গড়ে উঠেছে। আর সেই শহরে গজিয়ে উঠেছে ছোট বড় অসংখ্য কারখানা। এই ১১৪-টি শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের মল-মূত্র, নর্দমার নোংরা জল, কল-কারখানার নানারকম আবর্জনা এবং দূষিত পদার্থ সবই নিক্ষেপ করা হচ্ছে গঙ্গায়। তাছাড়া গঙ্গার তীরে অবস্থিত হাজার হাজার ক্ষেত-খামারে যে-সব কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে, বৃষ্টির জলে ধুয়ে সে-সবও গিয়ে পড়ছে গঙ্গায়। এর ফলে পবিত্র গঙ্গা এখন হয়ে পড়েছে দারুণ অপবিত্র, বিষাক্ত এবং যাবতীয় রোগের আধার।

বস্তুতঃ গঙ্গার জল এখন এমন নোংরা এবং দূষিত হয়ে পড়েছে যে, ইলিশ মাছের ঝাঁক আর গঙ্গায় প্রবেশ করছে না। মৎস্যজীবী এবং মৎস্যভোজী সকল মানুষের পক্ষেই এ এক দারুণ দুঃসংবাদ।†

ভারতবাসী প্রতিটি হিন্দুর কাছে গঙ্গা এক পবিত্র নদী। আমরা বলি, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। আমাদের অনেকেরই ধারণা, গঙ্গায় একবার অবগাহন করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়। তাইতো বিভিন্ন শুভ যোগে, পূজা-পার্বণে গঙ্গাস্নানের ধুম পড়ে যায়। আর তাইতো গঙ্গার কূলে কূলে গড়ে উঠেছে কত তীর্থক্ষেত্র, যেমন—হরিদ্বারে, বারাণসীতে, কলিতীর্থ কালীঘাটে, এবং গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে! পুরাকালে গঙ্গা কেমন ছিল তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, গঙ্গার উৎসমুখ থেকে যতই মোহনার দিকে যাওয়া যায়। গঙ্গার

---

† আনন্দবাজার পত্রিকা (৫ আগষ্ট, ১৯৮৫):

ইলিশ নিরুদ্দেশ—গঙ্গা এবং রূপনারায়ণে এ বছর ইলিশের ঝাঁক প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। গত আষাঢ় মাস থেকে কয়েক হাজার মৎস্যজীবী নৌকা, জাল, দড়ি নিয়ে ইলিশের সন্ধানে গঙ্গা ও রূপনারায়ণ নদের বুকে দিন রাত তল্লাসি করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু ইলিশের পাত্তা নেই। ....

ইলিশের তেমন পাত্তা না মেলায় অনেকেই বাধ্য হয়ে জাল দড়ি গুটিয়ে বাড়ি ফিরে আসছেন।......

এর কারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ মৎস্যজীবীদের অভিমত, এবারে তেমন বর্ষা নেই। ওপর দিক থেকে বর্ষার মিষ্টি জল সাগরের দিকে নামলে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ নদীতে ঢুকে পড়ে। তাছাড়া দুদিকে কলকারখানা থেকে দিনরাত ময়লা জল গঙ্গায় পড়ছে। দুর্গন্ধ, ময়লা জল ইলিশ সহ্য করতে পারে না। গঙ্গায় ইলিশ না পাওয়ার আর একটি কারণ, সাগরের কাছে বিভিন্ন নদনদীর মোহনায় পলি জমায় গভীরতা কমেছে, ফলে সাগর থেকে মাছ নদীতে ঢুকতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে।

জল তত বেশী কলুষিত, তত বেশী জীবাণুসম্বলিত। এজন্য বর্তমানে গঙ্গায় স্নান করলে, কলুষমুক্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং এর ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করার সম্ভাবনাই বেশী। এজন্য বিজ্ঞানীরা এখন খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

৩১ মে, ১৯৮৬, তারিখের **"দেশ"**-এ চিঠিপত্র বিভাগে **"প্রসঙ্গ গঙ্গা"** এই শিরোনামসহ শ্রীসৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

"আমি অভিযাত্রী নই, তবে ১৯৫৫ সাল থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছি হিমালয়ের টানে বেরিয়ে পড়েছি। হাঁটাপথে নানা জায়গায় ঘুরপাক খেয়েছি। গঙ্গার তথাকথিত উৎস গোমুখ দর্শন করেছি কয়েকবার। গিয়েছি অন্য কয়েকটি নদীর উৎসমুখে, কয়েকটি হিমবাহে। এসব দেখেছি বলেই প্রশ্ন জেগেছে—গোমুখ কি গঙ্গার উৎস? গোমুখ তো ভাগীরথীর মতো একটা স্বতন্ত্র নদী? আবার মন্দাকিনী, জাহ্নবী এদেরও তো গঙ্গা বলা হয়। অথচ এদেরও আলাদা আলাদা উৎস আছে। গঙ্গা যদি একটাই নদী হয় তাহলে তার এতগুলো উৎস হয় কি করে। আসলে গঙ্গা কয়েকটি স্বতন্ত্র নদীর মিলিত জলধারার নাম। তাই—'Ganges has a number of sources and these are traced to the various glaciers of Garhwal and Kumaun Himalaya.' কিন্তু চিরপ্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আমরা ভাগীরথীর ধারাকেই গঙ্গা বলে থাকি। পুরাণের গল্পই আমাদের এই ধারণাকে গড়ে দিয়েছে। আর তাই গোমুখকে আমরা গঙ্গার উৎস বলে মনে করি। তিনটি প্রধান নদীর জলধারার মিলনে গঙ্গার প্রকৃত রূপটা গড়ে উঠেছে—ভাগীরথী, মন্দাকিনী ও অলকানন্দা। তিনটির মধ্যে অলকানন্দার জলধারার পরিমাণই বেশি। নিচের দিকে নামতে নামতে বিভিন্ন জায়গায় এদের একের সঙ্গে অপরের সঙ্গম হয়েছে। তাছাড়া পিণ্ডারী, বিষ্ণু, ধৌলী ইত্যাদি আরও অনেক নদী মূল ধারার সঙ্গে মিশেছে। বিভিন্ন নদীর সম্মিলিত জলধারায় উৎপন্ন এই গঙ্গাকে আমরা প্রথম পাই দেবপ্রয়াগের পর থেকে। 'গম' ধাতু নিষ্পন্ন 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ হলো যার গতি বা প্রবাহ আছে। এই অর্থে যে-কোন নদীই গঙ্গা। হিমালয়েও বহু জায়গায় এই অর্থেই 'গঙ্গা' শব্দের ব্যবহার আছে। পাহাড়ীরা যে-কোনো নদীকেই গঙ্গা বলে।

তাই নদীর নামের সঙ্গে 'গঙ্গা' যোগ করে দেয়, যেমন—বিষ্ণুগঙ্গা, পিণ্ডারগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা ইত্যাদি।"......

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় আরও লিখেছেন—"গঙ্গার জলে স্নান করলে আগে দেহ ব্যাধিমুক্ত হতো। স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ড অংশে গঙ্গাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—'সর্বস্থ সর্বব্যাধিনাং ভিষকশ্রেষ্ঠৈ নমোঽস্তুতে।' (২৭/১৩৯)। এ-কথা যে পুরাণকারের কল্পনা নয়, এই শতকের একেবারে প্রথমে একজন সাহেব তা প্রমাণ করেছিলেন। এখন গঙ্গার জল খেলে কলেরা হয়। কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে E. H. Haukins তাঁর 'The cause and Prevention of cholera' নামক পুস্তিকায় লিখেছিলেন—'Since I originally wrote pamphlet I have discovered that the water of the Ganges and the Yamuna is hostile to the growth of the cholera microbe not only owing to the absence of food materials but also owing to the actual presence of antiseptic that has the power of destroying these microbes'......

গঙ্গার জলধারার এবং গঙ্গামৃত্তিকার আরো অনেক উপকারিতা ছিল। আর এখন সেই গঙ্গার কী দশা! দশম দশা আসতে আর দেরি নেই। গত বিশ্বযুদ্ধ বাধার দু-এক বছর আগেও দেখেছি প্রায়ই আউট্‌রাম ঘাটের কাছে মাটিকাটা ড্রেজার দাঁড়িয়ে থাকতো। কোথাও পলি বেশী জমে উঠলেই তুলে ফেলতো। আর এখন মা গঙ্গার বুকে এখানে ওখানে চড়ার ক্ষতের দুঃসহ যন্ত্রণা। ইংরেজরা গঙ্গাকে মা বলতো না, ভগবতীও বলতো না। কিন্তু তার মাহাত্ম্য বুঝতো। আর আজ আমরা স্বাধীন ভারতবাসী আমাদের স্বার্থ লাভ আর ভক্তির আদিখ্যেতায় ভগবতী গঙ্গার ভাগ্যকে চরম ঘোলাটে করে তুলেছি। তবে এখন আমাদের টনক নড়েছে। কমিটি হয়েছে। প্রচুর টাকা খরচ করে গঙ্গাকে বাঁচানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু দেশের ব্যাপার স্যাপার দেখতে-দেখতে তো চুল পেকে গেলো। ফাটা ডিমে তা দিয়ে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার খেলা। হবে কি কিছু? না হলে গঙ্গা যদি মরে আমাদের সমূহ সর্বনাশকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

এইসব কারণে গঙ্গার নাব্যতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং গঙ্গায় জলের প্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্যে, নদীর মোহনার পলি পড়া বন্ধ করার জন্যে, এবং

গঙ্গার জল যথাসম্ভব দূষণমুক্ত রাখার জন্যে, অবিলম্বে সকলেরই সমবেত-ভাবে চেষ্টা করা দরকার। নতুবা সমূহ বিপদ!

এই প্রসঙ্গে ১৯৮৬ সালের ১৬ই জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হরিদ্বার থেকে সাগর : গঙ্গার জল দূষিত :

"সারা বছর গঙ্গা-জল সব চাইতে পরিষ্কার থাকে সাগর দ্বীপের কাছে। কিন্তু মকর সংক্রান্তির সময় তিন-চারদিন সাগর দ্বীপের জলও দূষিত হয়। তবে সমুদ্রের নোনা জলের প্রভাবে ওই দূষিত জল স্বল্প সময়ের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক হয়ে থাকে। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) কেন্দ্রীয় পরিবেশ দফতরের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাকরণে সাংবাদিকদের ওই কথা বলেন। তিনি বলেন, জলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার জল দূষিত। ওই জলে স্নান করা উচিত নয়। তিনি প্রসঙ্গত বলেন, কানপুর এবং কাশীতে গঙ্গার জল সব চাইতে বেশি দূষিত। ওখানে যাত্রীদের স্নান করা উচিত নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গঙ্গোত্রী, গোমুখী এবং গঙ্গাসাগর ছাড়া অন্য সমস্ত জায়গায় গঙ্গার জল দূষিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুণ্যার্থীরা স্নান করার সময় এসব কথা ভাবেন না। কারণ পুরাকাল থেকেই প্রচলিত ধারণা হলো, গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করলেই পাপ দূর হয়। এই বিশ্বাস নিয়েই যুগ যুগ ধরে ভারতের মানুষ গঙ্গাস্নান করে আসছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দূষণ পর্ষদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ দপ্তর সাগর দ্বীপে মকর সংক্রান্তির সময় সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পান সেখানেও তিন দিন গঙ্গার জল ভীষণভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। মকর সংক্রান্তির দু'সপ্তাহ আগে এবং পরে জল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে জল বেশ ভাল। কাজেই মকর সংক্রান্তিতে অসংখ্য মানুষ স্নান করার ফলেই সাগরের জল দূষিত হয়ে থাকে বলে সমীক্ষকরা মনে করেন। সমীক্ষকদের মতে, ওই সময় যাত্রীরা দ্বীপের বিভিন্ন দিকে মলমূত্র ত্যাগ করে থাকেন। তার ফলেই জল দূষিত হয়। এজন্য তাঁদের সুপারিশ, পায়খানাগুলি সরিয়ে এভাবে করা হোক যাতে জল দূষিত হয়ে না পড়ে। এছাড়া, স্নানের সময় সাগর দ্বীপের এক কিলোমিটার জলে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া। মাটির বাঁধ তৈরীর কথাও বলা হয়েছে।"

তাছাড়া অন্যান্য নদীর বেলায়ও যাতে এরকমটি না হয়, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। এজন্য দরকার বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা।

এই প্রসঙ্গে, ১৯৮৫ সালের ৫ই আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় যে প্রতিবেদনাটি প্রকাশিত হয়েছে, তাও বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে—

গঙ্গা শোধনে বহুমুখী প্রকল্প :

নয়াদিল্লী, ৪ আগষ্ট—গঙ্গাকে শোধন করার জন্য সরকার এক বহুমুখী প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ হবে সপ্তম যোজনায়। এই পর্যায়ে আনুমানিক আড়াইশ' কোটি টাকা খরচ করা হবে। সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল দু'টি। এক, গঙ্গার দূষণ কমিয়ে আনা, এবং দুই, গঙ্গাতীরবর্তী শহরগুলিতে আবর্জনা কাজে লাগানোর কারখানা স্থাপন করা। প্রথমে গঙ্গার ধারে ২৯টি প্রথম শ্রেণীর শহরকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে। পরে অন্যান্য শহরগুলিকেও আনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিজে এই প্রকল্পের কাজটি তদারকি করছেন। পবিত্র গঙ্গা শোধন করার কাজকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন।

প্রথমে জোর দেওয়া হয়েছে প্রথম শ্রেণীর শহরগুলির উপরই, কেননা গঙ্গার তীরের শহরগুলির মোট জনসংখ্যার ৮২·৩ শতাংশই থাকেন প্রথম শ্রেণীর শহরে। মোট আবর্জনার ৮৮·৫ শতাংশ প্রথম শ্রেণীর শহরের। ২৯টি প্রথম শ্রেণীর শহরের মধ্যে ১৫টিতে আবর্জনা কাজে লাগানোর কারখানা রয়েছে।

গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান (GAP)-এর সূত্রে জানা গিয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে যে সব শহরে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই সেখানে ব্যবস্থা করা হবে। —**ইউ এন আই**

এটি যে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং, এর সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য সকলেরই সমবেতভাবে চেষ্টা করা দরকার।

বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা বায়ু-দূষণের পরিণাম যে কীরূপ ভয়ংকর হতে পারে, তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল ভূপালের গ্যাস-দুর্ঘটনা।

প্রখ্যাত সাংবাদিক তুষার মাইতি ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের "দেশ" পত্রিকায় এ সম্পর্কে লিখেছেন,—

"তারিখটা ১৯৮৪ সালের ২ এবং ৩ ডিসেম্বর। রবিবার গভীর রাত। ইংরেজি

মতে তিন তারিখ পড়ে গিয়েছে। সেদিন রাতে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপাল শহরে মৃত্যু নেমে এসেছিল চোরের মতো। ইউনিয়ান কারবাইড কারখানা থেকে ঘন কুয়াশার মতো গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায়। বিষাক্ত গ্যাসের কবলে মারা যান অন্ততঃ আড়াই হাজার মানুষ। মৃতের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। সম্ভবও নয়। এছাড়া গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়েছেন অন্ততঃ এক লক্ষ লোক। শহরের দশ লক্ষ বাসিন্দার চার ভাগের এক ভাগই শ্বাসের সঙ্গে অল্পবিস্তর গ্রহণ করেছেন এই গ্যাস। অসুস্থদের মধ্যে ভূপালের হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন অনেকে।

মৃত্যুর দূত সেই বিষাক্ত গ্যাস সে রাতে বাছবিচার করেনি। স্ত্রী, পুরুষ, যুবক, যুবতী, শিশু, বৃদ্ধ সকলেই এর শিকার হয়েছেন। যদিও পরে দেখা গেছে, যেসব এলাকায় গ্যাসের প্রভাব অনুভূত হয়েছে মারাত্মকভাবে, সেখানে বেশির ভাগই গরীব বস্তীবাসী। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো কারখানায় এত বড় তুর্ঘটনা ঘটেনি।

ভূপালের এই কারখানায় তৈরি করা হত বিভিন্ন কীটনাশক। যে মূল রাসায়নিক থেকে কীটনাশকগুলি তৈরী করা হত তার নাম মিথাইল আইসো-সায়ানেট বা সংক্ষেপে 'মিক' (MIC)। 'মিক' এমনিতে তরল, স্ফুটনাঙ্ক ৩৯·১ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। উদ্বায়ী তরল, অর্থাৎ সহজেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এই মিক সঞ্চিত ছিল ইউনিয়ান কারবাইড কারখানার ট্যাংকে। সেদিন রাতে এই মিকের বাষ্প ট্যাংক থেকে লিক করে ছড়িয়ে পড়ে ভূপালে। শহরের প্রায় চল্লিশ বর্গ মাইল এলাকা গ্যাসের কবলে পড়ে। ভূপাল সে রাতে বস্তুত এক গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়।

গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার পর সেই শীতের রাত্রিতে হাজার হাজার মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। পালাতে থাকেন যে যেদিকে পারেন। ভালো করে শ্বাস নিতে পারছেন না, দেখতে কষ্ট হচ্ছে, তবু ছুটে যাচ্ছেন যেদিকে তু'চোখ যায়। যাদের নিজেদের গাড়ি রয়েছে তাঁরা গাড়িতে করে পরিবারের লোকজন নিয়ে পালিয়েছেন, একটি অটোরিকশায় দশ এগারো জন করে চেপে লোকে শহর ছেড়ে গিয়েছেন, লরি বোঝাই করে মানুষ পালিয়ে গিয়েছেন।

তবে যেতে পারেননি অনেকেই। যাঁরা পারেন নি সাদা ঘন গ্যাস এসে তাদের গ্রাস করে নেয়। অনেকে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়েন। বাকিরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। গ্যাসের দাপটে শিশুরাই প্রথমে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, আর্তনাদ

করতে করতে মারা যায়, দৌড়তে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে বয়স্ক পুরুষ। আর ওঠেনি। বহু মানুষ ঘুম ভেঙে উঠে কাঁদতে শুরু করেন, চোখে অন্ধকার দেখেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ।

এইভাবে সমস্ত রাত্রি ধরে। রাত্রি শেষ হয় এবং তারপর এক ঝকঝকে রৌদ্রমাখা সকাল। কিন্তু সেই সকালের মধ্যেই ভূপাল মৃতের নগরীতে পরিণত। শহরের বিভিন্ন এলাকায় শ'য়ে শ'য়ে পড়ে থাকে মানুষের লাশ। কোথাও একই পরিবারের সকলে; কোথাও মা জড়িয়ে থাকেন পুত্রকে, স্বামী পালিয়ে গিয়েছেন। কোথাও বা সদ্য সন্তানের জন্ম দেওয়া স্ত্রীকে ছেড়ে যাননি স্বামী। তাই তিনজনই পাশাপাশি চিরনিদ্রায় শায়িত। শুধু মানুষ নয়, গরু, মোষ, ছাগল, কুকুরের মৃতদেহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকে শ'য়ে শ'য়ে। হাসপাতালে বন্যার মতো এসে পড়ে অসুস্থ মানুষের ভিড়।"

আনন্দবাজার পত্রিকা [২৭শে নভেম্বর, ১৯৮৬]

স্টাফ রিপোর্টার: পরিবেশ-মন্ত্রী ভবানী মুখার্জী বলেন,—পরিবেশ দফতরের গুরুত্ব সম্পর্কে এমনকি প্রশাসনের উচ্চস্তরেও চেতনা প্রসারের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। '৮৪—'৮৫ সালে পরিবেশ দফতরকে বাজেটে কার্যত কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। চলতি বছরে অবশ্য এক কোটি টাকার মত দেওয়া হয়েছে। ওই টাকা দিয়ে রাজ্যের শিল্পাঞ্চলে হলদিয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, ব্যারাকপুর, হাওড়া এবং শিলিগুড়িতে ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে।

কারখানা মালিকরা বৈঠকে বসে বলেন ধোঁয়া এবং বিষাক্ত গ্যাস ও কেমিক্যাল্স ছাড়ার আগে প্রয়োজনীয় পরিশোধন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, কারখানাগুলি নিয়ম মেনে চলছেন না। যাঁরা নিয়ম ভঙ্গ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রসঙ্গত তিনি জানান, উল্টোডাঙ্গা অঞ্চলে বিহার থেকে শ্রমিকরা এসে তিন থেকে পাঁচ টাকা দিন-মজুরিতে কাজ করেন। পাঁচ বছর পর এঁরা টি. বি. রোগে ভুগতে ভুগতে দেশে ফিরে যান। এরপর আর কাজে ফিরতে পারেন না। বিষাক্ত কেমিক্যাল্স নিয়ে কাজ করার এই পরিণতি!

এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একটি শিল্প-সমৃদ্ধ শহরে এখন মৃত্যু আকাশে, মৃত্যু বাতাসে।

এজন্য কোনরকম অবহেলার সুযোগ এখানে নেই। ভূপালের গ্যাস-দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সকলেরই এবিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার, এবং সবসময় সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, যাতে ভবিষ্যতে এই প্রকার বায়ু-দূষণ জনিত দুর্ঘটনা আর কখনও না ঘটতে পারে।

দশম পরিচ্ছেদ

পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা

সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই গাছপালা আমাদের দিয়েছে ফল-মূল, শস্য, পূজার পুষ্প, যজ্ঞের সমিধ, সোমরস এবং বসনের ও বাসগৃহের নানা উপাদান। পরবর্তীকালে আমরা পেয়েছি জ্বালানির এবং আসবাবপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ। আরও পরে শিল্প-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি বস্ত্র, কাগজ, চিনি, সুরাসার প্রভৃতির কাঁচামাল। বনভূমি থেকে আমরা পাই ধূনা, রজন, লাক্ষা, কর্পূর, রবার, মসল্লা প্রভৃতি। এছাড়া ভেষজ ওষুধের উপাদান হিসেবে কতরকম গাছ-গাছড়ারই না প্রয়োজন হয়। শুধু তাই নয়, উদ্ভিদের উপর নির্ভর ক'রেই বেঁচে থাকে নানা প্রকার প্রাণী। অথচ কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষের দল, নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, অবিবেচকের মতো গাছপালা কেটে বনভূমি নির্মূল ক'রে ফেলছে। এর ফলে মানুষ নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছে।

গভীর অরণ্যে থাকে ঘাস, লতা-গুল্ম, গাছ-গাছালি, নানাপ্রকার পাখি এবং নানাপ্রকার বন্য পশু। আর উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণীর রয়েছে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। একের অভাবে তাই অন্যের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, দেশের বনভূমির আয়তন দেশের সমগ্র ভূভাগের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ, ৩৩·৩ শতাংশ) হওয়া দরকার। এর চেয়ে কম হলে তা একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, বন না থাকলে, বন্য-প্রাণী থাকবে কোথায়! দুঃখের বিষয়, সমগ্র ভারতে বনভূমির পরিমাণ এখন প্রায় ২০ শতাংশ, আর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৩ শতাংশ মাত্র। আমরা জানি, বনভূমির পরিমাণের সঙ্গে আবহাওয়ার আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ভূমিক্ষয় প্রভৃতি, অর্থাৎ ভৌত পরিবেশ, এবং সেই সঙ্গে জৈব পরিবেশ, অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত। দীর্ঘকাল ধরে নির্বিচারে বন ধ্বংস করার ফলে এদেশে প্রাকৃতিক পরিবেশে যে-সব বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে আছে খরা, বন্যা, ভূমিক্ষয় এবং সর্বোপরি পরিবেশ

দূষণ। এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হ'ল ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ এবং বন-সৃজন।

একটি গাছ একটি প্রাণ, এবং তা আরও অনেক প্রাণের প্রধান সহায়। কলকারখানার ধোঁয়া, মোটরগাড়ির ধোঁয়া, উনুনের ধোঁয়া—এমনি অনেক কিছু সদা-সর্বদা বাতাসে মিশে তাকে দূষিত ক'রে তোলে। কিন্তু গাছ বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ ক'রে, এবং তার বদলে প্রাণদায়ী অক্সিজেন গ্যাস ফিরিয়ে দিয়ে, বাতাসকে আবার নির্মল ক'রে দেয়। গাছের শিকড় মাটিকে শক্ত ক'রে ধরে রাখে বলে বৃষ্টিতে বা বন্যায় মাটি সহজে ক্ষয়ে বা ধুয়ে যেতে পারে না। এজন্য গাছ ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, এবং পাহাড়ে ধ্বস নামা বন্ধ করে। তাছাড়া মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করে, এবং মাটিতে হিউমাস (Humus) গঠন ক'রে, মাটির উর্বরতা বাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বাতাসে জলকণার পরিমাণ বাড়িয়ে তাকে আর্দ্র রাখে। তাই গাছের এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মেঘকে আকর্ষণ করার—যেখানে গাছপালা বেশী সেখানে, অর্থাৎ বনাঞ্চলে, বৃষ্টিও বেশী হয়। তাছাড়া যেখানে গাছ বেশী, সেখানে ধুলোর পরিমাণ অনেক কম হয় বলে বায়ু-দূষণ কম হয়। এইসব কারণে আরও বেশী ক'রে গাছ লাগানো খুবই প্রয়োজন।

আগেই বলা হয়েছে যে, একটি দেশের বনভূমির আয়তন দেশের সমগ্র ভূভাগের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ, ৩৩.৩ শতাংশ) হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানে ভারতে বনভূমির আয়তন মাত্র কুড়ি শতাংশ। সুতরাং, একথা অনুমান করার পক্ষে যুক্তি আছে যে, এখানে বনভূমির আয়তন যথাসত্বর প্রসারিত করা দরকার। তা না করলে, এখানকার বৈষয়িক উন্নতির যাবতীয় প্রয়াসের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকবে। সকলেরই মনে রাখা দরকার যে, উদ্ভিদ শুধু বনের সম্বল নয়, জাতির জীবনের সম্বল।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মানুষের হঠকারিতার ফলে অরণ্যবহুল একটি দেশে অরণ্যের ক্ষয় এতো দ্রুত এবং বৃহৎ আকারে হতে পারে যে, দেশটি দু-তিন শতাব্দীর মধ্যেই মরুদেশে পরিণত হতে পারে। তাঁদের মতে,

অবাধ বনক্ষয় ও তজ্জনিত ভূমিক্ষয়ের কারণে ভারতের বহু শস্য-শ্যামল এবং দ্রুমদলশোভিত অঞ্চল মাত্র একশ' বছরের মধ্যেই অর্ধ-মরুদশা প্রাপ্ত হয়েছে। একটি বাস্তব সত্য এই যে, দেশের কোনো অঞ্চল একবার মরুদশায় অভিভূত হলে, সেখানে নতুন অরণ্য সৃজন এক দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং, অবিলম্বে এবিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার, এবং প্রতিবছরই বন-ভূমির আয়তন প্রশস্ত করার একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা উচিত। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সকলেরই সমবেতভাবে চেষ্টা করা দরকার। নতুবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

অরণ্যে রোদন

আনন্দ বাগচী

"স্বাধীনতার পর আমরা এমন এক বিশাল আন্তঃপ্রাদেশিক কর্মযজ্ঞে লিপ্ত ছিলাম যে দ্রুত উন্নয়নই ছিল আমাদের লক্ষ্য। কৃষি স্বয়ম্ভরতা এবং শিল্পোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের বাইরে তখন দৃষ্টি ছিল না। পণ্য এবং বাণিজ্য আর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের তাগিদে মৌল প্রাকৃতিক সত্যটি আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। প্রাকৃতিক জগতের পারিবেশিক ভারসাম্যের ওপরেই জীব-জগতের সুস্থতা এবং অস্তিত্ব নির্ভর করে আছে। পারস্পরিক সহাবস্থান সমঝোতার ওপর জীবন নামক ব্যাপারটি সামগ্রিকভাবে নির্ভর করে আছে। তাই উন্নত এবং উন্নয়নশীল জীবের সঙ্গে অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বেরও লেনাদেনা বিস্তর। শেয়াল শকুন থেকে শুরু করে একটি ব্যাঙ কিংবা কীট-পতঙ্গের সঙ্গে তাই মানুষের একটা অলিখিত সম্বন্ধ বর্তমান। সজ্ঞানে কিংবা অনবধানতায় সেই সূত্র লঙ্ঘন করলে পরিবেশ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, দূষিত হয়, আপাত পিছল জীবনেরও ছন্দতাল কেটে যায়। এক অলক্ষ্য সর্বনাশ নিঃশব্দে এগিয়ে আসে।

নির্বিচার অরণ্য হননের ফলে গোটা দুনিয়ায়, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, সেই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এখন ঘনিয়ে আসছে দ্রুত গতিতে। এর মূল কারণ অজ্ঞতা এবং জনস্ফীতি। দেশ বিভাগের ফলে অতি অকস্মাৎ এদেশ মনুষ্য ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। দারিদ্র্য এবং নিম্নমানের জীবনের সঙ্গে অশিক্ষা অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে জন্মহারের ওপরে প্রায় অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করেছে। মৃত্যু

সংখ্যাকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে জন্মহার। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিপুল চাপের মুখে বনজঙ্গল পতিত জমি পিছু হঠতে শুরু করেছে। বন কেটে বসত চাষ আবাদ কলকারখানা গড়ে উঠেছে। জ্বালানি আর পশু-খাদ্যের অভাবে মানুষ ক্রমশ অবশিষ্ট সবুজের দিকে হাত বাড়িয়েছে। সেই সঙ্গে স্বাধীন সরকারের নজর শক্ত হয়েছে রাজস্বের দিকে। আপাত প্রয়োজনীয় ধনভাণ্ডারকে সরকার নির্বিচারে শূন্য করে এনেছেন তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে। চিন্তা-শীল বিজ্ঞানীদের সতর্কবাণী তাঁর কানে যায় নি। ফলে শুধু গাছ নয়, পশু-পাখি কীটপতঙ্গও বিলুপ্ত হতে শুরু করল। রোগ ব্যাধি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিতে লাগল। সরকারের যখন টনক নড়ল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। বনভূমি তখন দেশের মোট ভুখণ্ডের শতকরা সাতাশ ভাগে ঠেকেছে। ১৯৫২ সালে সরকার যে নীতি ঘোষণা করলেন তাতে ধার্য হল সমতলে শতকরা ৩৩ ভাগ এবং পাহাড় অঞ্চলে শতকরা ৬০ ভাগ বন রাখতে হবে। রিজার্ভ ফরেস্টের জন্ম হল। বৃক্ষসংহার এবং পশুশিকার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হল কাগজে কলমে। সরকার কারণ খুঁজে দেখলেন না, জনসাধারণের কাজের ওপরে দাওয়াই বসালেন। ফলে এই সময় থেকেই জাতীয় সম্পত্তি জনসাধারণের চোখে সরকারি সম্পত্তি আর মুনাফার লেবেলে চিহ্নিত হয়ে গেল। জনচেতনা ও বোধকে জাগানো হল না, শুধু বিধানকে বিধিবদ্ধ করা হল। পরিণামে দেখা গেল, বনসম্পদ এবং বন্যপ্রাণী রক্ষার দায়িত্ব মুষ্টিমেয় বেতনভুক কর্মচারির ওপরে বর্তালো, জনসাধারণের কোন দায় থাকল না।

১৯৮০ সালের হিসেবে দেখা গেল, ভারতের ৩০৫ মিলিয়ন হেক্টার বন-ভূমির মধ্যে মাত্র ৩৫ মিলিয়ন হেক্টার অবশিষ্ট আছে। অর্থাৎ কিনা, শতকরা ১১·৫ ভাগ। বছরে আনুমানিক শতকরা একভাগ কমে আসছে। বন-সৃজনের স্বপ্ন বিলাসের পর্যায়েই রয়ে গেছে। দশকের পর দশক চলে যাচ্ছে কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট বনভূমি নিজের পায়ে মজবুত হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযত্নের অভাবে শীর্ণ মৃতকল্প দশা। প্রায় সাড়ে তিন দশকে ২০ মিলিয়ন হেক্টার জমি বস্তুত এখন মরুভূমি, সেই বালুস্রোত শনৈ শনৈ গুজরাট হরিয়ানা আর দিল্লীর দিকে এগোচ্ছে। প্রতি বছর ৬ মিলিয়ন টন উর্বর মাটি হারিয়ে যাচ্ছে। পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন আর ফস্‌ফরাস মিলিয়ে তার পরিমাণ ফার্টিলাইজার-গুলির বার্ষিক উৎপাদনের প্রায় দ্বিগুণ।

১৯৪৭ সালের তুলনায় শিলং গুয়াহাটি আসামের বৃষ্টিপাত এখন প্রায় কুড়ি ভাগ কম, অন্যান্য জায়গার কথা বাদ দেওয়াই ভাল।

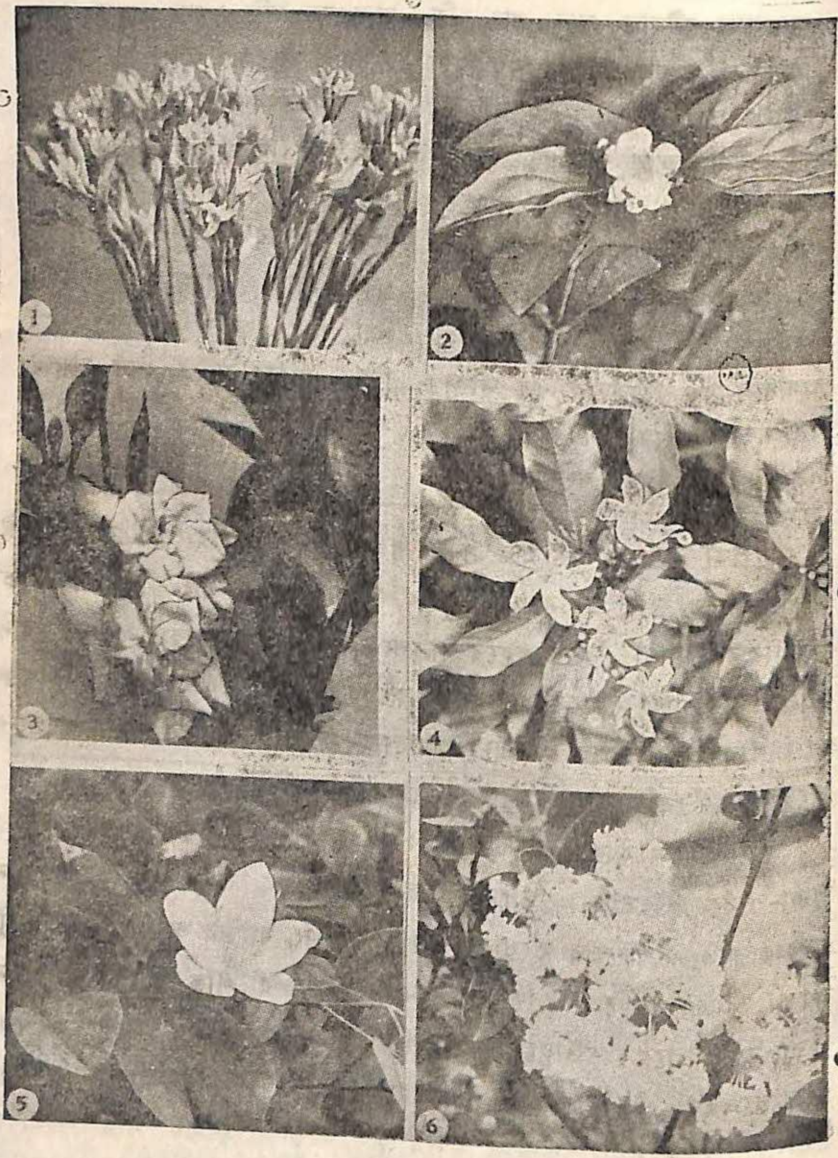
বৃষ্টির অভাবে খরা হয়, সে তো ক্রনিক ব্যাধি, আমাদের আছেই। কিন্তু বৃষ্টি কমে গেলেও বন্যার পরিস্থিতি যে উত্তরোত্তর খারাপ হয়ে চলেছে এ অভিজ্ঞতা আমাদের এই প্রথম। আসলে বৃক্ষ বিরলতাই এর কারণ। মাটিতে জল ধরে রাখার কাজে গাছের জুড়ি নেই। গাছের অভাবে জল এখন মাটিতে বসার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে দ্রুত গতি জলের স্রোত যেমন হঠাৎ প্লাবনী বন্যার সৃষ্টি করছে, তেমনি এই দ্রুত নিকাশের ফলে মাটি শুষ্ক এবং শক্ত হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। মাটির নীচের জলের লেভেল ক্রমশ নীচে নেমে যাওয়ার ফলে নদী, জলাশয়, পুকুর, ইদারা শুকিয়ে আসছে। খরা আর বন্যায় প্রকৃতির এই নির্মম সংহার মূর্তির জন্যে মানুষই দায়ী।"

[**দেশ**—১০ জানুয়ারী, ১৯৮৭]

উল্লেখ্য যে, তথাকথিত সভ্য শহরবাসীরা অপরাহ্নে যে শ্বাসকষ্ট অনুভব করে, তার প্রধান কারণ, শত শত উনুন এবং কল-কারখানা থেকে উৎসারিত ধোঁয়া। আর শহরে গাছপালার একান্ত অভাব। শহরে যদি আরও গাছপালা থাকতো, তাহলে শহরের বাতাস আরও সহজে কলুষমুক্ত হতে পারতো। আর আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে বিশুদ্ধতর বাতাস গ্রহণ করে আরও বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারতাম।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। ফুল কে না ভালবাসে! পূজা-পার্বনে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে, সাজসজ্জায়, এমন কি মৃতের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যও, ফুলের প্রয়োজন হয়। সুতরাং, বাড়ির আশেপাশে একটু ফাঁকা জায়গা থাকলে, সেখানে নানারকম ফুলের গাছ লাগিয়ে বাগান করা যেতে পারে। তাহলে সমগ্র পরিবেশ সুন্দর ও মনোরম হয়ে উঠবে, পরিবেশেরও উন্নতি ঘটবে। যারা সুগন্ধি ফুল ভালবাসেন, তারা গোলাপ, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, বেল, যুঁই প্রভৃতি ফুলের গাছ লাগাতে পারেন। তাছাড়া শীতের মরশুমে লাগাতে পারেন নানারকম মরশুমী ফুলের গাছ, যেমন—গোলাপ, গাঁদা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি।

ভরসার কথা এই যে, মানুষ এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে,



৭৯। নানারকম ফুলের গাছ। [1. রজনীগন্ধা, 2. বেল, 3. গন্ধরাজ, 4. টগর, 5. শ্বেত-কাঞ্চন, 6. ফুরুস।]

[আলোকচিত্র-শিল্পী—ডাঃ প্রদীপকুমার রাহা]

রঙীন চিত্র—V



ভারতের জাতীয় পুষ্প—পদ্মফুল।
[শিল্পী—শ্রীশিবেন গুহ]



কয়েক প্রকার মরসুমী ফুল—
(ক) গোলাপ
(খ) ডালিয়া
(গ) সূর্যমুখী
(ঘ) অ্যাস্‌টার।

বৃক্ষরোপণ মৃত্তিকা-সংরক্ষণে এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে সহায়ক। উদ্ভিদ্ ছাড়া কোনো প্রাণীরই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই



চিত্র ৮০। আমগাছ।

আজকের মানুষ বৃক্ষ-রোপণে এবং বন-সৃজনে আগের চেয়ে অনেক বেশী

মনোযোগী হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, শুধু গাছ লাগালেই চলবে না, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণেরও যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা গরু-বাছুরে অথবা ছাগলে সেগুলি খেয়ে ফেলবে।

আবার, একদিকে বনজ সম্পদ রক্ষা করার দিকে যেমন সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে, অপরদিকে তেমনি নতুন বন সৃজনের দিকেও সমান উদ্যোগী হতে হবে। একটি কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, বনের গাছ কাটলে, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আরও গাছ লাগিয়ে তার স্থান পূর্ণ করতে হবে। তাহলেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না, এবং সেজন্য পরে আমাদের আর অনুশোচনা করার কোনো কারণ থাকবে না।

বনমহোৎসব ঃ

ক্রমাগত অরণ্য ধ্বংস করার পরিণাম যে কীরূপ ভয়াবহ হতে পারে, তা উপলব্ধি করেই কল্যাণকামী মানুষ এখন গুরুত্ব দিয়েছে বৃক্ষ-রোপণ ও বন-সৃজনের উপর। ব্যাপকভাবে বৃক্ষ-রোপণের কার্যক্রমই 'বনমহোৎসব' নামে পরিচিত। ভারতে সরকারীভাবে এর সূচনা হয় ১৯৫০ সালে, এবং প্রতি বছরই বর্ষাকালে (জুলাই মাসে) সপ্তাহকাল ধরে, সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে, লক্ষ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করে এই উৎসব পালন করা হয়। উদ্দেশ্য, এইভাবে একদিন ভারতের মোট আয়তনের শতকরা ৩৩.৩ ভাগকে অরণ্য-অঞ্চলে পরিণত করা সম্ভব হবে, যাতে মৃত্তিকা-সংরক্ষণ এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, এবং যাতে আমরা সকলেই নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকার সুযোগ পাই।

দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রকল্প অনুযায়ী অনেক গাছ লাগানো হয় ঠিকই, কিন্তু সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় না। সুতরাং, এ বিষয়ে আমাদের আরও বেশী ক'রে মনোযোগী হতে হবে। নতুবা এই প্রকল্প কোনদিনই সার্থক হবে না।

সামাজিক বন-সৃজন :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে, সরকারী প্রচেষ্টায় বনভূমি সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন কাঠের চাহিদা মেটাবার জন্য সমাজভিত্তিক বন-সৃজনের একটি নতুন প্রকল্প এখানে চালু করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গত ছয় বছরে প্রায় এক লক্ষ হেক্টার নতুন বন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় জনসাধারণের ভূমিকাই প্রধান।

এই কর্মসূচী অনুযায়ী প্রধানতঃ তিনরকম ভাবে বন সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে—

(১) **সারিবদ্ধ বন**—এই প্রকল্প অনুযায়ী, বড় বড় সড়ক, রেল-লাইন, সেচ-খাল, নদী-বাঁধ, জলাধারের বাঁধ প্রভৃতির ধারে ধারে সারিবদ্ধ-ভাবে গাছ লাগানো হচ্ছে।

(২) **গ্রামীণ বৃক্ষপুঞ্জ**—এই প্রকল্প অনুযায়ী গ্রামের সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ভূমিতে (যেমন—গোচারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমিতে), অথবা গ্রাম-পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণাধীন জমিতে, প্রয়োজনমত গাছ লাগানো হয়। এর ফলে ভবিষ্যতে পশু-খাদ্য অথবা জ্বালানি কাঠ পাওয়া যেতে পারে।

(৩) **ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বৃক্ষপুঞ্জ**—গ্রামের সাধারণ মানুষ, স্থানীয় ক্লাব বা সংগঠন, বিদ্যালয়, গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রভৃতি, নিজ নিজ পতিত জমিতে, বৃক্ষ রোপণ ক'রে একদিকে যেমন দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করতে এবং পরিবেশের উন্নতি করতে সহায়তা করতে পারেন, অন্যদিকে তেমনি নিজেরা কিছু বাড়তি আয়েরও ব্যবস্থা করতে পারেন। কারণ, এভাবে সৃষ্ট বনজ সম্পদ হবে জমির মালিকের নিজস্ব সম্পত্তি, যা তিনি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা ছাড়াও ইচ্ছামত বিক্রয় ক'রে অর্থোপার্জন করতে পারবেন।

এই কাজে জনসাধারণের উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত এবং সার্থক ক'রে তোলার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ গাছের চারা, সার এবং

বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত। যার প্রয়োজন, তিনি অনায়াসে এই সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন। কোথায় কোন্ গাছ লাগানো উচিত, সে বিষয়েও সরকারী কর্মচারীরা মূল্যবান পরামর্শ দিতে পারবেন।

বৃক্ষ-রোপণের ফলে যে শুধু পরিবেশ-দূষণ এবং ভূমিক্ষয় নিবারিত হবে, তা নয়। এর ফলে ফুল-ফল এবং জ্বালানির চাহিদাও অনেকাংশে মিটবে। এজন্য সাধারণভাবে নানারকম ফুল ও ফলের গাছ লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া জ্বালানির জন্য বিশেষভাবে সুবাবুল, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি ; ফলের জন্য আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু নারকেল, পেয়ারা, প্রভৃতি ; ছায়ার জন্য বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি ; আর ছায়া এবং সেইসঙ্গে অলঙ্করণের জন্য কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমূল, পলাশ প্রভৃতি লাগানো যায়।

বর্তমানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে, এবং বিশ্ব-অর্থ-ভাণ্ডারের সহায়তায়, পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক বন-সৃজনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে প্রতি বছর আনুষ্ঠানিকভাবে অরণ্য-সপ্তাহ পালন করা হয়। এই প্রকল্পে ব্যবহৃত স্লোগান হ'ল—

(১) একটি গাছ, একটি প্রাণ।

(২) গাছ লাগান, গাছ বাঁচান।

(৩) আমাদের বাঁচতে হলে উদ্ভিদকেও বাঁচাতে হবে।

(৪) গাছ লাগান, গ্রামের পশু-পাখি ও মানুষের জন্য পরিবেশ আরও সুন্দর ও নির্মল ক'রে তুলুন।

(৫) যারা অরণ্য ধ্বংস করছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ইত্যাদি।

বনজ সম্পদ ধ্বংস হওয়ার প্রধান কারণ, সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও লোলুপতা। কথায় বলে,—অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে, বনজ সম্পদ অপহরণের এই প্রবৃত্তি অনেকাংশে নিবারিত হবে বলে আশা করা যায়।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই প্রকল্পের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে খরাপ্রবণ এলাকায়, চাষের অনুপযুক্ত পতিত জমিতে, বনজসম্পদ সৃষ্টি ক'রে গ্রামীণ

অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। কারণ, জমির মালিকরা এজন্য একটু মমত্ব বোধ করবেন এবং নিজ নিজ এলাকার গাছপালা লালন-পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে অনেক বেশী যত্নবান হবেন, যেহেতু এর ফলে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই লাভবান হবেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলিও এ বিষয়ে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।।

এইসব প্রকল্প খুবই সন্তোষজনক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রকল্প অনুযায়ী যে-সব গাছ লাগানো হয়, সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা এক কঠিন সমস্যা। স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য এবং সহযোগিতা ছাড়া একাজ করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং, সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে আরও সচেতন ক'রে তোলা দরকার।

আশা করি বন-বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের এবং জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সামাজিক বন-সৃজন প্রকল্পটি সার্থক হয়ে উঠবে। সেইসঙ্গে প্রার্থনা করি, পশ্চিমবঙ্গের সব রুক্ষ প্রান্তর আবার অরণ্য-সম্পদে ভরে উঠুক, অবারিত নগ্ন-ভূমি সবুজ উদ্ভিদের আবরণে আচ্ছাদিত হোক, আর বন্ধ্যা মৃত্তিকা আবার হয়ে উঠুক উর্বরা, শস্য-শ্যামলা এবং ফুলে-ফলে ভরা।

এই প্রসঙ্গে ৮ নভেম্বর (১৯৮৫) আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

"**পতিত জমির আবাদে সোনা**—ডাঙ্গা জমিতে বন-সৃজন করে মেদিনীপুর জেলার একজন গ্রামবাসী পাঁচ বছরে ৫৬ হাজার টাকা লাভ করেছেন। ঐ গ্রামবাসীর নাম সাধন পান, বাড়ি নেপুরা গ্রামে। রাজ্য সরকারের বন-বিভাগের সচিব রবীন্দ্রনাথ দে এই তথ্য দিয়ে জানান, এই বন-সৃজনে ঐ গ্রামবাসীর এক পয়সাও খরচ হয়নি। বন-বিভাগ তাঁকে গাছের চারা দিয়েছেন এবং গাছগুলি বাঁচানোর জন্য ব্যবস্থাদি করতে তিন বছর তিনশো টাকা ক'রে দিয়েছেন। নিজের ডাঙ্গা জমিতে বন-সৃজন ক'রে ঐ ভদ্রলোক তিন হাজার ইউক্যালিপটাস গাছ বাঁচিয়েছেন। এই গাছগুলি বিক্রি করে তিনি ৫৬ হাজার টাকা পেয়েছেন।

তিনি জানান, এই বন-সৃজন ব্যবস্থা গ্রাম এলাকায় খুব অর্থকরী হয়ে উঠেছে। ১৯৮০ সাল থেকে রাজ্য সরকার এই কর্মসূচী আরম্ভ করেছেন। এই কর্মসূচীতে রাজ্য সরকার খরচ করেছেন প্রায় ২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১০ কোটি টাকা দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বন-সৃজন কর্মসূচীতে গত পাঁচ বছরে রাজ্য সরকার ৬২ হাজার হেক্টর জমিতে বন-সৃজন করেছেন।"

এরচেয়ে ভাল খবর আর কী হতে পারে! এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে যদি এই প্রকল্পের সামিল হন, তাহলে অচিরেই এই পরিকল্পনা সার্থক হয়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দেশে এখন খুব ঘটা ক'রে বন-সৃজন এবং বন-সংরক্ষণের পালা চলেছে। খুব ভাল কথা। কিন্তু অনেক বনপাল এবং বন-বিভাগের কিছু কিছু কর্তা-ব্যক্তির দুর্নীতিতে দেশে যে হারে বৃক্ষচ্ছেদনের ও চোরা-চালানের পালা চলেছে, তাতে সমগ্র পরিকল্পনাই প্রহসনে পরিণত হতে বসেছে। সরষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে, তাহলে ভূত ছাড়ানো যাবে কি করে! সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে এইসব ভূতের মোকাবিলা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

আর একটা কথা। একলা একজনের পক্ষে এই রকম দুষ্কৃতকারীদের মোকাবিলা করা হয়তো সম্ভব নয়, আর তা উচিতও নয়, বিশেষ ক'রে তারা যদি অস্ত্রধারী হয়। কারণ, সেক্ষেত্রে তা হবে হঠকারিতারই শামিল। আর হয়তো জীবন দিয়েই সেরূপ হঠকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাই এজন্য আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। সকলে মিলে এর প্রতিরোধ করতে হবে। বলা বাহুল্য, গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি এবিষয়ে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আমাদের সকলেরই মনে রাখা দরকার যে, এটা আমাদের এক নৈতিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্য। এ দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না।

সামাজিক বন-সৃজনের সমস্যাটি এখন বিরাট আকারে দেখা দিয়েছে। ভারত সরকারও এ বিষয়ে খুবই সচেতন। তাই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এখন এই সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, এবং কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু ক'রে দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

India likely to witness ecological tragedy.

New Delhi, Oct. 17.

An ecological tragedy that India may witness by 2001 A.D. is the general fear that has been expressed by the participants in their papers presented at the three-day national seminar on wastelands developments organized by Association for Wastelands Development, which concludes here tomorrow.

In fact, was the tone of the inaugural address by the Vice-President, Mr. R. Venkataraman, who warned the authorities, "If we do not succeed, and succeed soon, I am afraid, we shall face the prospect of total ecological disaster by the end of the century."

Rural society :

Yet another observation which the contributors have made is that the wastelands development concerns most of the weaker sections and poor rural society of India, like the women in the plains and hills, who have to trudge for as many as 15 or more kilometres a day in search of fuel and fodder.

Dr. S. S. Yadav (Director, Institute for Wastelands Development), while observing that the Integrated Agricultural and Industrial Development must struggle now against the extensive expansion of Wastelands, India's 53% of the total land was subject to serious environmental degradation. Nearly 80 millions of hectares of the degraded lands were already classified as Wastelands unfit for cultivation.

The extent of Wastelands, according to the Delhi-based Society for Promotion of

Wastelands Development, was now well over 100 million hectares. "It is evident that there is an urgent need to stop farther degradation of our lands into Wastelands. With the increasing demands for foods, fuel, fodder and the growing population, every inch of the Wastelands has to be brought back to productivity, utility either by way of afforestation, social forestry or farm-forestry." Dr. Yadav suggested.

A fear was also expressed about the extinction of forests ; about 35 million hectares of the forest area without tree cover and, therefore, lying waste.

[The Statesman, Oct. 18, 1986]

এ সম্পর্কে প্রকাশিত আর একটি প্রতিবেদন—

Appeal to preserve natural wealth :

New Delhi, Oct. 17

The Vice-President Mr. R. Venkataraman, yesterday warned the nation that if it did not take care of its natural wealth, it would have to face ecological disaster by the end of the century.

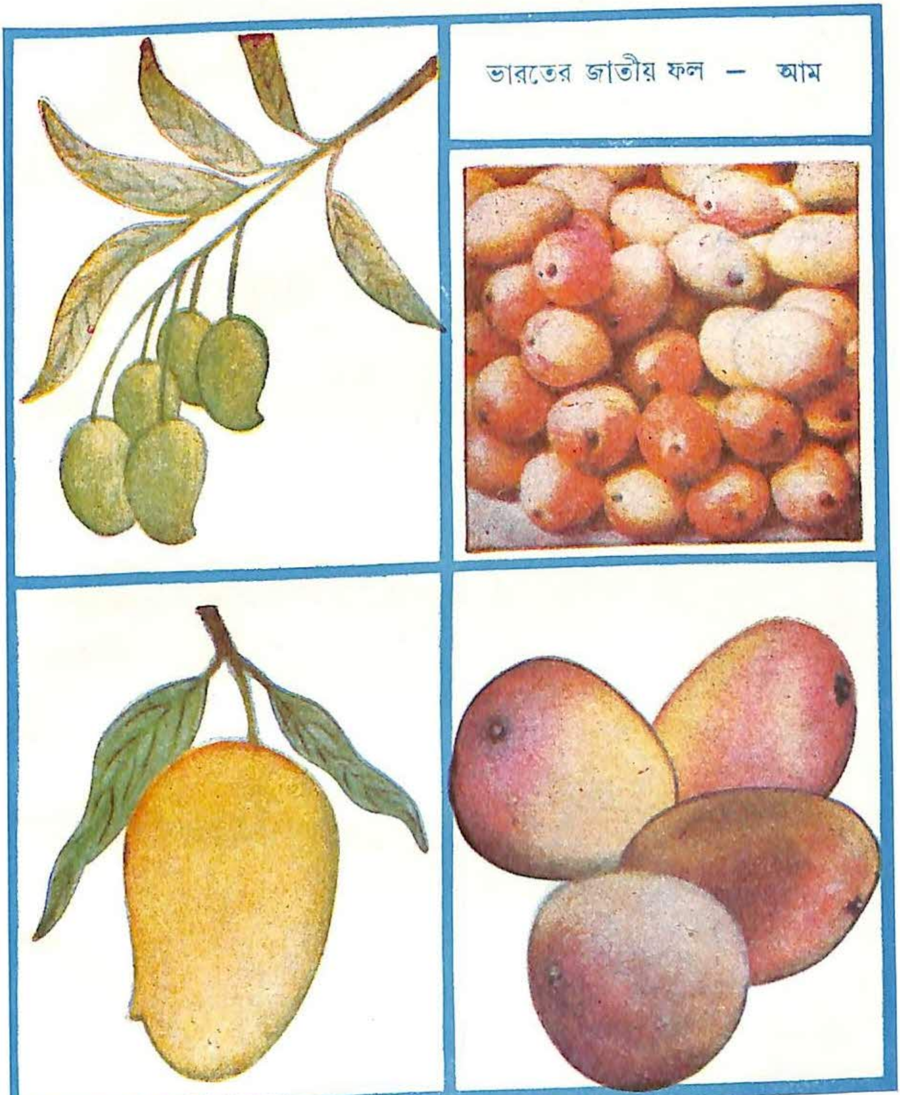
Inaugurating a national seminar on wastelands development, Mr. Venkatraman recalled that from time immemorial man had lived in harmony with nature, but in recent past this relationship had been shattered, causing damage to nature and hardship to man.

Afforestation of the order of five million hectares a year was no mean task and was not possible without the peoples involvement. It would need Rs. 2,500 crores a year for its afforestation, he said.

The Vice-President suggested that one way was to induce the industry to afforest wastelands since in several countries forest lands were leased to the industry with a condition that it would replant 110% of the trees felled every year.

He wanted women to be consulted, since they needed fuel-wood and fodder to run their kitchen ; children, too, played a special role in the afforestation programme.

[The Statesman, Oct. 18, 1986]



ভারতের জাতীয় ফল—আম।
[শিল্পী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ]

Wastelands Development, was now well over 100 million hectares. "It is evident that there is an urgent need to stop farther degradation of our lands into Wastelands. With the increasing demands for foods, fuel, fodder and the growing population, every inch of the Wastelands has to be brought back to productivity, utility either by way of afforestation, social forestry or farm-forestry." Dr. Yadav suggested.

A fear was also expressed about the extinction of forests ; about 35 million hectares of the forest area without tree cover and, therefore, lying waste.

[The Statesman, Oct. 18, 1986]

এ সম্পর্কে প্রকাশিত আর একটি প্রতিবেদন—

Appeal to preserve natural wealth :

New Delhi, Oct. 17

The Vice-President Mr. R. Venkataraman, yesterday warned the nation that if it did not take care of its natural wealth, it would have to face ecological disaster by the end of the century.

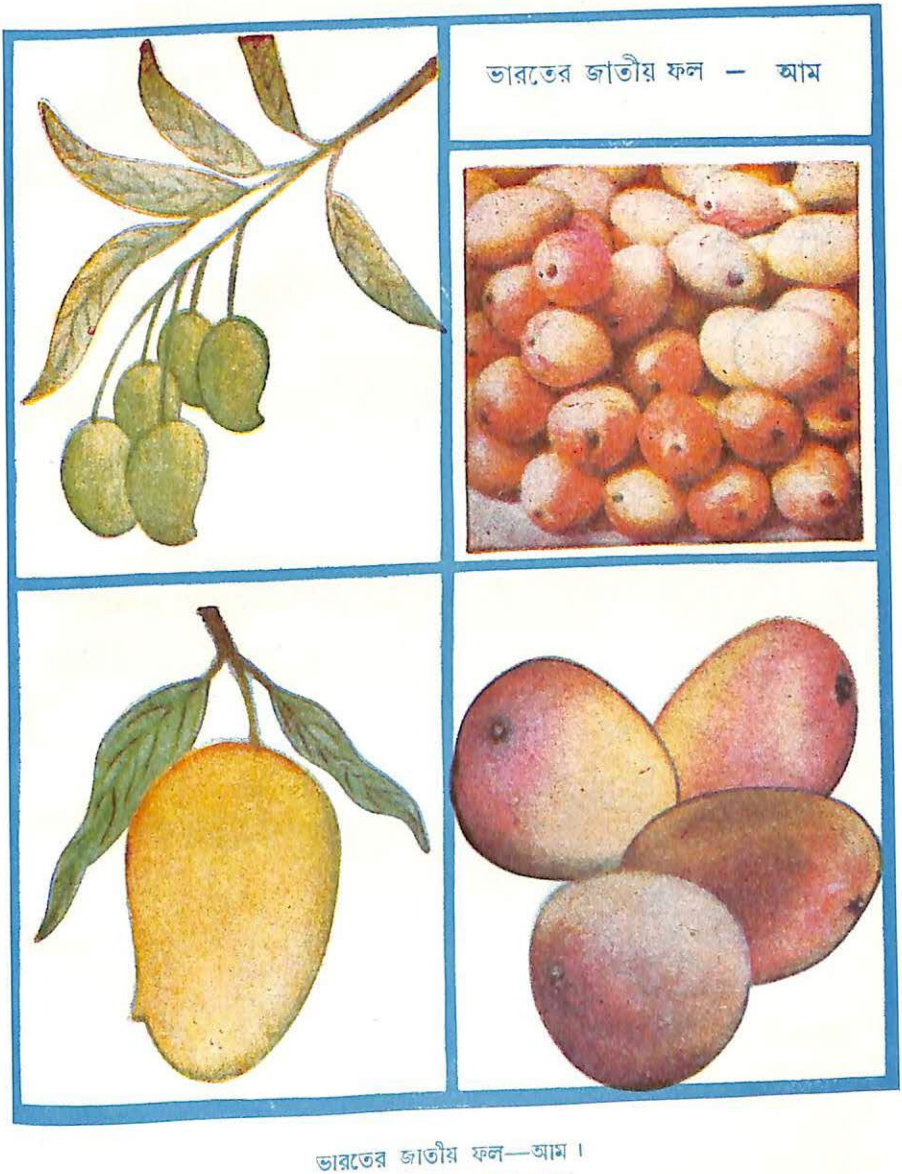
Inaugurating a national seminar on wastelands development, Mr. Venkatraman recalled that from time immemorial man had lived in harmony with nature, but in recent past this relationship had been shattered, causing damage to nature and hardship to man.

Afforestation of the order of five million hectares a year was no mean task and was not possible without the peoples involvement. It would need Rs. 2,500 crores a year for its afforestation, he said.

The Vice-President suggested that one way was to induce the industry to afforest wastelands since in several countries forest lands were leased to the industry with a condition that it would replant 110% of the trees felled every year.

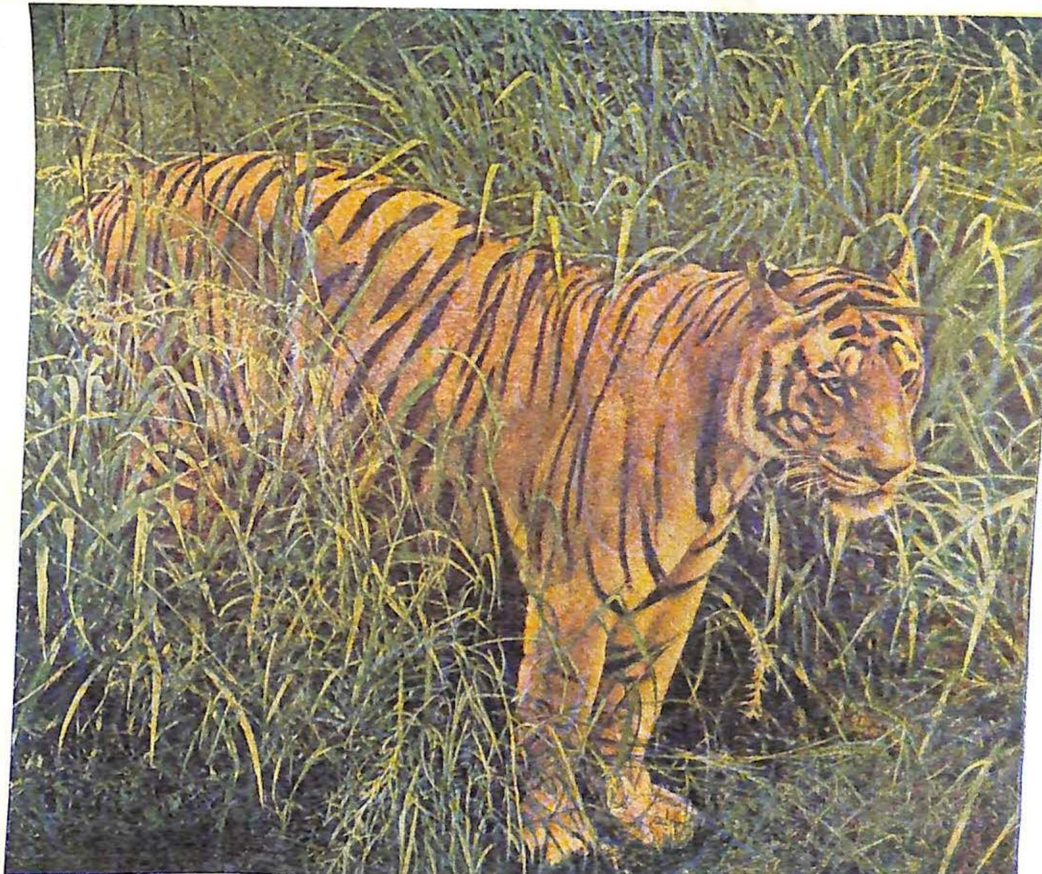
He wanted women to be consulted, since they needed fuel-wood and fodder to run their kitchen ; children, too, played a special role in the afforestation programme.

[The Statesman, Oct. 18, 1986]



ভারতের জাতীয় ফল—আম।
[শিল্পী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ]

রঙীন চিত্র—VIII



ভারতের জাতীয় পশু—বাঘ।

সামাজিক বন-সৃজন কি শুধুই বৃক্ষ-রোপণ?

শ্যামল চক্রবর্তী নামক জনৈক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে এই প্রশ্নটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।† প্রবন্ধটি খুবই মূল্যবান, এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। ওই প্রবন্ধের অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হ'ল।

"ভারতের ৪'২ কোটি উপজাতি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আজ নিজেদের বাসস্থান থেকে অপসারিত হয়েছে, বনোচ্ছেদ এবং কিছু 'উন্নয়নমূলক' প্রকল্পের ফলে। অনেকগুলি বৃহৎ জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য যে-সব জমি-জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার অনেকগুলিই আদিবাসী অধ্যুষিত, যেমন—ত্রিপুরার গোমতি, উড়িষ্যার হীরাকুঁদ, কালিমেলা, ইন্দ্রবলি বা গুজরাটের নর্মদা। নর্মদা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ৭০,০০০ আদিবাসীকে তাঁদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। অথচ, অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও বিদ্যুৎ-প্রকল্প থেকে উদ্ভূত সেচ-প্রকল্প বড় চাষীরই সুবিধার্থে কাজে লাগানো হয়। উচ্ছেদিত অসংখ্য আদিবাসীর কোনো কাজে লাগে না। অন্যদিকে অরণ্যবাসী, বিশেষ ক'রে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির জীবন যে অরণ্যের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত তা কারুরই অজ্ঞাত নয়। বনের ফলমূল, পাতা, বীজ, মধু, বন্য পশুর মাংস, মাছ প্রভৃতি এরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদকে এরা রোগ-চিকিৎসার কাজে লাগায়। বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে নির্মাণ করে ঘর। বন থেকেই সংগৃহীত বহু কাঁচামাল এদের কুটির-শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বনকে কেন্দ্র ক'রেই এদের বহু বিশ্বাস, লোকাচার, মায় সমস্ত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের চিহ্নিত ৩৯৪-টি উপজাতি অধিকাংশেরই অস্তিত্ব এবং অর্থ-সামাজিক উপরিকাঠামো প্রত্যক্ষভাবে অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য আদিবাসী ব্যতীত আরও অনেক অরণ্যবাসীও আজ অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন। অথচ

† 40th Annual Reunion—Souvenir, Dept. of Botany, University of Calcutta.

আজও তথাকথিত সভ্য-জগতের মানুষ এদের সম্বন্ধে হয় অজ্ঞ, উদাসীন কিংবা শত্রুভাবাপন্ন।

* *   * *   * *

ইদানীং 'সোশাল ফরেস্ট্রি' বা সমাজভিত্তিক বন-সৃজন-এর সাফল্যের কথা সরকারী আমলারা খুব ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়ান, এবং তার প্রমাণ স্বরূপ শুনি বিগত আর্থিক বছরে বৃক্ষরোপণের পরিসংখ্যান। তাহলে, সমাজভিত্তিক বন-সৃজন কি শুধুই বৃক্ষরোপণ? ব্যাপারটি একটু খতিয়ে দেখা যাক। ১৯৬৮ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ওয়েস্টবি নামে জনৈক সাহেব 'সোশাল ফরেস্ট্রি' কথাটি এদেশে চালু করেন। তাঁর মতে—'Social forestry aims at producing flow of protection and recreation benefits for the community'.

ভারতের জাতীয় কৃষি কমিশন এক প্রতিবেদনে (১৯৭২-৭৩) ওয়েস্টবির উপরিউক্ত মতামত গ্রহণ করে আরও বলেন যে, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঠ, জ্বালানী কাঠ এবং জাব (fodder=পশুখাদ্য)-এর জন্য প্রয়োজনীয় বনসৃষ্টি সোশাল ফরেস্ট্রি কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। পরবর্তীকালে সুর আবার পালটালো। ১৯৭৬ সালে ঐ জাতীয় কৃষি কমিশনই প্রকারান্তরে বললো—'বনে আদিবাসীরা যথেষ্ট লুঠতরাজ করেছে এবং অনন্তকাল তাঁদের স্বাধীন ভাবে বনের ফলমূল খেতে বা কুড়োতে দেওয়া যায় না। কারণ, পরিবহণ, প্রতিরক্ষা এবং কাঠ শিল্পে কাঁচামাল যোগান এবং রফতানি মারফৎ বিদেশী মুদ্রা অর্জনই বন-সংরক্ষণের একমাত্র উপযোগিতা।'

ক্রমশঃ বন-সৃজন সমাজভিত্তিক না হয়ে শিল্পভিত্তিক হয়ে উঠেছে। অরণ্যবাসীর প্রয়োজন সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে কাগজ ও পলিফাইবার শিল্প এবং কাঠ ব্যবসায়ীর কাঁচামালের উৎসে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কর্ণাটকের গ্রামবাসীদের কথা। বাসস্থান নির্মাণের জন্য এদের বাঁশ আসত মূলত পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত অরণ্য থেকে। ব্যাপক বনোচ্ছেদের ফলে আদিবাসীদের আজ খোলা বাজার থেকে

বাঁশ কিনতে হয়। দাম টন প্রতি ১,২০০ টাকা। অথচ কাগজ-কলের মালিকেরা সুবিধাজনক হারে বাঁশ কেনে টন প্রতি মাত্র ১৫ টাকায়। টি. এল. শঙ্কর, যোজনা কমিশনের শক্তি-সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রাক্তন সদস্য, বলেন—'I have seen programmes in the name of the poor, but soon distorted to benefit the upper classes. But no programme has been diverted further away from objectives than social forestry........the forest-departments never seem to ask the question : wood production for whom ? অতি সম্প্রতি অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বন-বিভাগকে কৃষি-দপ্তরের আওতার বাইরে নিয়ে এসে পরিবেশ-দপ্তরের আয়ত্তাধীনে আনা, সঠিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে, কেননা বন পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আজ ভারতের বহু উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ঘন মিশ্র অরণ্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ইউক্যালিপ্‌টাস, পাইন বা আকাশমনি। ফলে অরণ্যের বাস্তু-সংস্থানগত ভারসাম্য আজ বিপন্ন। আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিয়ে লিজ দেওয়া হয়েছে, হয় কাগজ-কলের মালিককে, কিংবা বিশ্বব্যাঙ্ক বা কোনো বহুজাতিক সংস্থার সাহায্যপুষ্ট শিল্পপতিকে। বন-বিভাগও পুরোদমে এই কাঠের ব্যবসায়ে নেমেছে এবং সদর্পে ইউ-ক্যালিপ্‌টাসের চারা রোপন ক'রে চলেছে। অন্যদিকে এক নতুন অরণ্য-আইন প্রণয়নের চেষ্টা চলেছে, যার দ্বারা কোনো আদিবাসী বা অরণ্যবাসী বনাঞ্চলে এলে, পাতা বা বীজ কুড়োতে গেলে, বনবিভাগের আগাম অনুমতি লাগবে। নিয়ম লঙ্ঘন করলে জরিমানা, হাজতবাস বা উভয়ই। এমনকি সংরক্ষিত বনে কোনো ব্যক্তিকে অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ফরেস্ট-গার্ড দেখামাত্র গুলি করতে পারে। নিজের বাসস্থানে অরণ্যবাসী যখন অনুপ্রবেশকারী প্রতিপন্ন হয়, তখন 'সমাজভিত্তিক বন-সৃজন' প্রভৃতি কথাগুলি নিতান্তই আপ্তবাক্য বা ব্যঙ্গাত্মক মনে হয়না কি ?"

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এই সব প্রকল্প সফল ক'রে তোলা অত সহজ নয়। কারণ, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি নৈতিকতার প্রশ্ন।

যারা এভাবে বাস্তুহারা হয়েছে, সমাজে যারা অবহেলিত, যারা সব সময় দারিদ্র্যসীমার অনেক নীচে রয়েছে, তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের কথা, আহার এবং বাসস্থানের কথাও আমাদের ভাবতে হবে বই কি ! এজন্য তাদেরও সবাইকে এরূপ প্রকল্পের সামিল ক'রে নিতে হবে, এবং তাদের এবিষয়ে আরও সচেতন ক'রে তুলতে হবে। তারাও যদি এরূপ আন্দোলনের অংশীদার হন, তবেই এরূপ প্রকল্প সার্থক হয়ে উঠবে, নতুবা নয়।

শহরে আরও বৃক্ষ-রোপণ অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন :

শহরের কথা বলতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের সবার প্রিয় কলকাতা শহরের কথাই বলা দরকার। কারণ, কলকাতাই হ'ল পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। এর এক বিশেষ মর্যাদা আছে। এই শহরটি ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহর, এবং পৃথিবীর প্রথম দশটি জনবহুল শহরের অন্যতম।

১৬৯০ সালে জোব চার্ণক যখন এই শহরের পত্তন করেন, তখন এই জায়গা সুন্দরবনের সবরকম গাছ-গাছালিতে পূর্ণ ছিল। অর্থাৎ, তখন কলকাতার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল আদিম প্রাকৃতিক পরিবেশ। কিন্তু হায়, আজ তার কী দৈন্য-দশা! সেই সুগভীর অরণ্যের কলেবর ক্ষীণ হতে হতে আজ তা কোথায় হারিয়ে গেছে !

যে-কোন বৃহৎ অট্টালিকার ছাতে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, শুধু ইট, কাঠ, পাথর আর লোহার সমাবেশ। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়। এদিকে-ওদিকে তাকালে, আমাদের পরম সুহৃদ উদ্ভিদ্ বলতে গেলে চোখেই পড়ে না। একমাত্র ময়দান ছাড়া, সন্নিবেশিত সবুজের চিহ্নও নেই কোথাও। যা আছে তাও অতি নগণ্য। দু'একটি জীর্ণ-শীর্ণ অপুষ্টিদুষ্ট বৃক্ষ এখানে-ওখানে কোন প্রকারে দাঁড়িয়ে থেকে যেন ধুঁকছে !

অথচ ইউরোপ বা আমেরিকার যে-কোন আধুনিক শহরে গেলে দেখা যাবে, সমগ্র শহরটি গড়ে উঠেছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, শহরটি যেন আশ্রয় নিয়েছে সবুজ সুন্দর আরণ্যক পরিবেশে !

দু-ফোঁটা চোখের জল

"মজা এই, কলকাতায় যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁরা আধুনিক উন্নত শহরের সুযোগ-সুবিধে পেলেন না, আবার গ্রামের দূষণ-মুক্ত পরিবেশ কি সবুজের ছোঁয়াটাও বরাতে জুটল না। না ঘরকা না ঘাটকা গোছের অবস্থা। ……শহরবাসে আমরা অসুবিধাটাই পেলুম। সুবিধার তালিকায় সবই ঢ্যারা মারা। টাউন প্ল্যানাররা মানুষকে বাঁচাবার জন্যে সুপরিকল্পিত ব্রিদিং স্পেস রেখেছিলেন। তৈরি করেছিলেন গ্রীনবেল্ট। শহর চেপে মেরে ফেলতে চাইলেও দিনান্তে খোলামেলায় এসে একটু আকাশ বাতাসের স্পর্শ পাবার উপায় ছিল। বিদেশের বিশাল বিশাল শহরে এন-ভায়রনমেণ্ট আর্কিটেক্টরা শহরবাসীর কথা ভেবে, 'স্পষ্ট অফ গ্রীন', 'স্প্ল্যাশ অফ গ্রীন',' 'গ্রীন এরিয়া' তৈরি করেছেন। কোনও প্রয়োজন ছিল না। অপ্রয়োজনীয় অংশটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে বেচে দিলে হাজার হাজার ডলার আয় হত। ফুলে ফেঁপে উঠত 'রিয়েল এস্টেট'-এর ব্যবসা। ওঁরা তা পারেন নি, কারণ ওদেশের শাসককুল নিজেদের দেশের সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা ভাবেন না। শহরটাকে সুন্দর করব। মানুষকে সুন্দর পরিবেশে রাখব। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হব। সেইটাই তাঁদের কাছে গৌরবের। আমাদের দেশ দর্শনের দেশ। দার্শনিকের দৃষ্টিতে মানুষের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। গৌরবও নেই, অগৌরবও নেই। বাঁচাও যা মরাও তাই।

কলকাতা চলছে ব্যবসায়ীকুলের নির্দেশে। প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্যই হল বণিককুলের সেবা। ফুটপাথ তাঁদের পদতলে নিবেদিত। পার্ক উৎসর্গীকৃত। খোলা মাঠ চরণের সেবায় লাগে। আকাশ ছোঁয়া ফ্ল্যাট, যেখানে পারছে সেইখানেই ঠেলে উঠছে। ঢাই লাখ, বিশ লাখ, ত্রিশ লাখ। মানুষ পড়ে রইল কূপে। আকাশ দেখতে হলে ঘাড় এরপর এতটাই উঁচু করতে হবে যে আকাশ দেখার ব্যাপারটা একটা কোশিস হয়ে দাঁড়াবে। এ বছরেই দেখা গেল কলকাতার উত্তাপ দিল্লিকে হার মানাচ্ছে। বিলীয়মান সবুজের জন্যে দু-ফোঁটা চোখের জল কে ফেলবে!

আর আমাদের গ্রাম? সেখানে আর এক উৎপাত। বন কেটে সাফ সুতরো করার কাজ ঠেকানো অসম্ভব। কারণ কাঠ হল জ্বালানি। কাঠ হল ক্যাপিটাল। আবহাওয়া মরুক। কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ুক। বেঁচে থাক লোভ। বেঁচে থাক কামাই। বেঁচে থাক মহান দার্শনিক।*

[দেশ—সম্পাদকীয় (৫ জুলাই ১৯৮৫)]

আমাদের এই ভারতবর্ষেই সম্প্রতি যে-সব শহর গড়ে উঠেছে, যেমন—নতুন দিল্লী, চণ্ডীগড়, জামসেদপুর প্রভৃতি, সেখানে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রাচীন বৃক্ষরাজি রক্ষা করা হয়েছে, আর সেইসঙ্গে অনেক নতুন গাছপালাও লাগানো হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, কলকাতার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কারণ, কলকাতা একটি প্রাচীন শহর। এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে ধীরে ধীরে, প্রায় তিনশ' বছর ধরে, এবং অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে। এর জন্মকাল থেকেই যত রাজ্যের ভাগ্যান্বেষী মানুষ এখানে এসে ভিড় করেছে, জীবিকার সন্ধানে। কলকাতা যেন তাদের কাছে কামধেনুর মতো। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ এখানে এসে নিজেদের ইচ্ছামত দোহন করছে, তারপর আবার ফিরে যাচ্ছে আপন ঠিকানায়। এরা বহিরাগত। কলকাতার প্রতি এদের দরদ নেই! শুধু তাই নয়, লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রী (Daily Passenger) প্রতিদিন জীবিকার জন্য ছুটে আসে নগর কলকাতায়। এরা কলকাতাকে শোষণ করে, লুণ্ঠন করে, কিন্তু দেয় না কিছুই। উপরন্তু সারাদিন ধরে মলমূত্র ত্যাগ করে, কলকাতাকে আবর্জনায় ভরিয়ে দিয়ে, দিন-শেষে নির্বিকার চিত্তে ফিরে যায় আপন ঘরে।

এছাড়া ভারত-বিভাগের ফলে বাস্তুহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের চাপে কলকাতা যেন ধুঁকছে। এইসব কারণে, কোনরকম পরিকল্পনার অবকাশও এখানে নেই। বোধহয় কোনদিন ছিলও না। যে যেখানে পেরেছে, যেমন-তেমন ক'রে, একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিয়েছে। তাইতো কলকাতার এমন দুর্দশা!

কলকাতার মতো একটি বিরাট শহরে বিনা পরিকল্পনায় গাছ লাগানো চলে না, লাগানো উচিতও নয়। বিদেশের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে প্রতিটি শহরে গাছ-গাছালি লাগাবার এবং তদারকী করবার জন্য একটি ক'রে পৃথক্ সংস্থা আছে। আমাদের দেশেও নাকি দিল্লীতে এবং চণ্ডীগড়ে এরূপ সংস্থা আছে। এতদিনে কলকাতায় এরূপ কোনো সংস্থা গঠন করা হয়েছে কিনা জানি না। হয়ে থাকলে ভাল, আর না থাকলে, অবিলম্বে তা গঠন করা উচিত। এই সংস্থার বিশেষজ্ঞরা শহরের নক্সা বিচার ক'রে, এবং

রাস্তা-ঘাট-পার্ক প্রভৃতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ক'রে, অন্ততঃ পাঁচ বছরের জন্য পরিকল্পনা রচনা করবেন। কোথায় কোন গাছ কয়টি লাগাতে হবে, তা এঁরাই ঠিক ক'রে দেবেন। তারপর এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বছর বছর গাছ লাগাতে হবে। আর এই সময়ের মধ্যে, এঁদের অনুমোদন ছাড়া, কোনো গাছ কাটা চলবে না।

উল্লেখ্য যে, গ্রামের পরিবেশ এবং শহরের পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গ্রামের পরিবেশে যে গাছ মানায়, শহরের পরিবেশে অনেক সময় তা একেবারেই মানায় না। যেমন, সুবাবুল লাগানো হয় জ্বালানি কাঠের জন্য, সুতরাং শহরে এই গাছ লাগানোর কোনো অর্থ হয় না। তেমনি শহরের পরিবেশে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি গাছ লাগিয়ে ফল ফলাবার আশা বৃথা। আবার বটগাছ ডালপালা ছড়িয়ে একদিন বিরাট এক মহীরুহে পরিণত হয়। সুতরাং, কলকাতার রাস্তা-ঘাটে যেখানে-সেখানে এই গাছ লাগানো চলে না, উচিতও নয়। লাগালে, বরং ভবিষ্যতে একটি সমস্যারই সৃষ্টি হবে। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া প্রভৃতি গাছ বেশ ছায়া দেয়, আর বসন্ত সমাগমে এগুলি ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় এবং অপূর্ব শোভা ধারণ করে। তাই শহরের পরিবেশে এদের সুন্দর মানায়। শহরের পরিবেশে কদম্ব গাছও একেবারে মন্দ নয়। শহরের রাস্তা-ঘাটে বা পার্কে গাছ লাগাবার আগে এসব কথা ভেবে দেখা দরকার।

আর একটি কথা। একটি রাস্তার বিস্তৃতি, ভবিষ্যতে তা আরও প্রশস্ত করা হবে কিনা, মাটির নীচে বিদ্যুতের বা টেলিফোনের তার আছে কিনা, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির সঠিক অবস্থান কীরূপ, প্রভৃতি জেনে নিয়ে তারপর বৃক্ষ রোপণের পরিকল্পনা করা উচিত। নতুবা দীর্ঘকাল ধরে সযত্নে পালিত বৃক্ষ একদিন এক নিষ্ঠুর আততায়ীর কুঠারাঘাতে ধরাশায়ী হবে। সাধারণভাবে কোনো নাগরিকের কাছেই এটা কাম্য নয়।

A tree is a pole of liberty
and every leaf a flag of honour.

অর্থাৎ, একটি বৃক্ষ যেন
মুক্তির একটি স্তম্ভ, আর প্রতিটি
পাতা সম্মানের পতাকা।

—বাবা আমতে

একাদশ পরিচ্ছেদ

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

একদা মরিশাস দ্বীপে প্রচুর ডোডো-পাখি বিচরণ ক'রত। নিরীহ এই পাখি ছিল পায়রার স্বগোত্র। ইউরোপের নাবিকরা সেখানে পদার্পণ ক'রে দেখল, এই পাখির মাংস খুব সুস্বাদু। এরা উড়তে পারত না, তাই সহজেই ধরা পড়তো। এমনি ক'রে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই শেষ পাখিটিও নিহত হ'ল। সেই থেকে ইংরেজীতে একটি ফ্রেজ (phrase) বা শব্দসমষ্টি প্রচলিত হ'ল,—"Dead as the dodo". আধুনিক সভ্যতা নিয়ে যতই গর্ব করি না কেন, আমরা কি একটি ডোডো-পাখি সৃষ্টি করতে পারবো ?

এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর উত্তর আমেরিকার অগুন্তি "জংলি বাইসন" হত্যার কথাও বলতে হয়। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী, তিন কোটি থেকে, গত শতাব্দীর শেষে, তাদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় এক হাজারের নীচে। তখন স্থির করা হয়, এদের সংরক্ষণ করতে হবে। বর্তমানে এই অঞ্চলে বিভিন্ন চিড়িয়াখানা ও প্রাইভেট পার্ক মিলিয়ে প্রায় ৩৫,০০০ জংলি বাইসন রয়েছে। সকলের সমবেত চেষ্টায় এইভাবে জংলি বাইসনদের সমুহ বিনাশ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানীর হিসেবে, সারা ভারতে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। ১৯৪০ সালেও বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার, কিন্তু ১৯৬৯ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে মাত্র আড়াই হাজারে। আর ১৯৭২-এর বাঘ-সুমারীতে তার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ১৮২৭টিতে। বাঘের সংখ্যার এই ব্যাপক হ্রাস যে শুধু বাঘের বিলুপ্তিরই ইঙ্গিত দেয়, তা নয়, বনভূমির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাও সূচিত করে।

প্রাচীনকালে ভারতের অনেক অরণ্যেই সিংহ বাস ক'রত, কিন্তু এখন গুটিকয়েক কোন প্রকারে টিকে আছে শুধু গুজরাটের গির অরণ্যে। তেমনি সামান্য কয়েকটি গণ্ডারের দেখা মেলে শুধু আসামের কাজিরাঙ্গা এবং পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে। প্রাচীন সাহিত্যে এমন অনেক পাখির বর্ণনা আছে, যেগুলি এখন আর চোখেই পড়ে না।



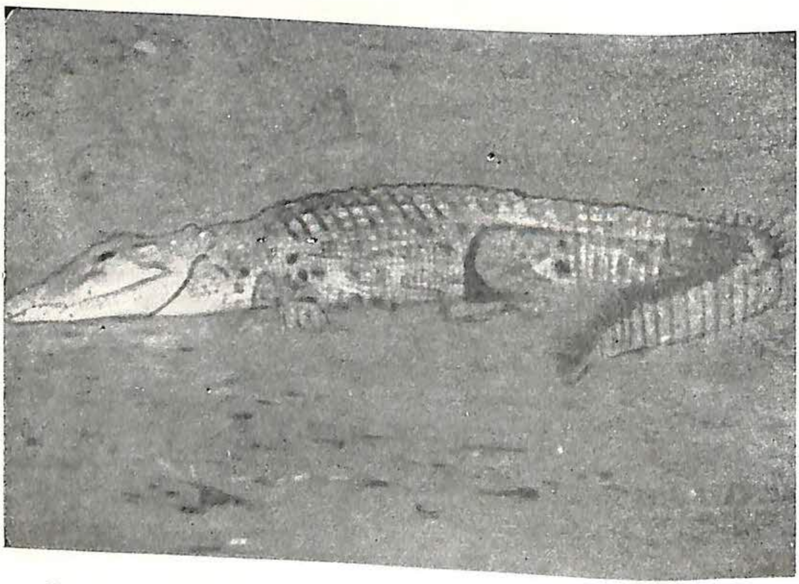
চিত্র ৮১। পশুরাজ—গির অরণ্যের সিংহ।
[ইউ. এস্. আই. এস.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]



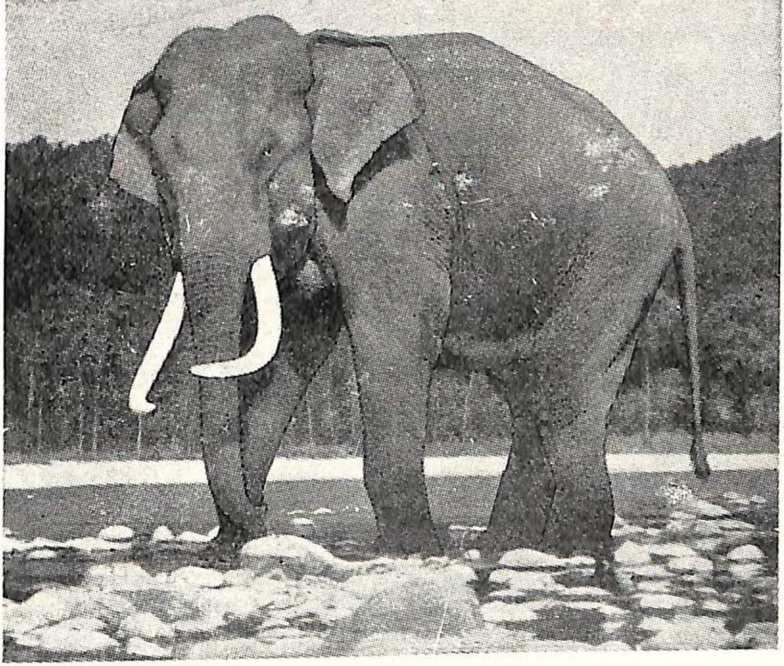
চিত্র ৮২। গির অরণ্যের সিংহী—একটি মহিষ শিকার ক'রে অনায়াসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।
[ইউ. এস্. আই. এস -এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]



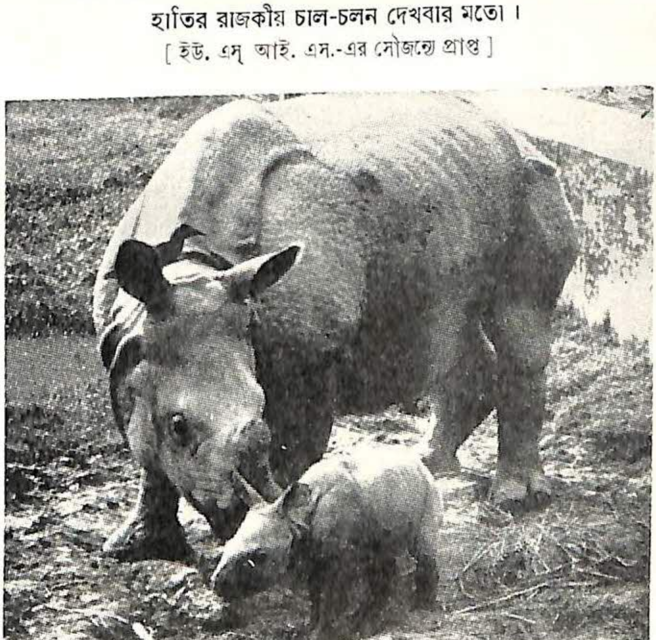
চিত্র ৮৩। সুন্দরবনের ডোরা-কাটা বাঘ (Royal Bengal Tiger)—ভারতের জাতীয় পশু।
[আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীপ্রণবেশ সান্যাল]



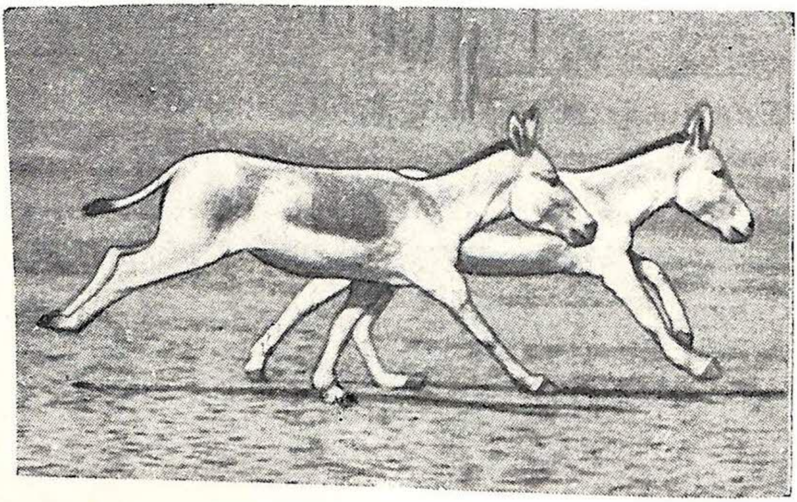
চিত্র ৮৪। সুন্দরবনের কুমীর—শীতের সকালে ডাঙ্গায় উঠে রোদ পোহাচ্ছে।
[আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীপ্রণবেশ সান্যাল]



চিত্র ৮৫। ভারতীয় হাতি—অরণ্যের পটভূমিতে একটি মুক্ত হাতির রাজকীয় চাল-চলন দেখবার মতো।
[ইউ. এস্ আই. এস.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]



চিত্র ৮৬। ভারতীয় গণ্ডার—মা তার বাচ্চাকে আদর করছে। এদের দেখা যায় জলদাপাড়া এবং কাজিরাঙ্গার অভয়ারণ্যে।
['দি স্টেট্সম্যান' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত]



চিত্র ৯০। কচ্ছের রান অঞ্চলের বুনো-গাধা—বিরল ও বিলীয়মান পশু।

[শারদীয় দেশ (১৩৯১) থেকে পুনর্মুদ্রিত]

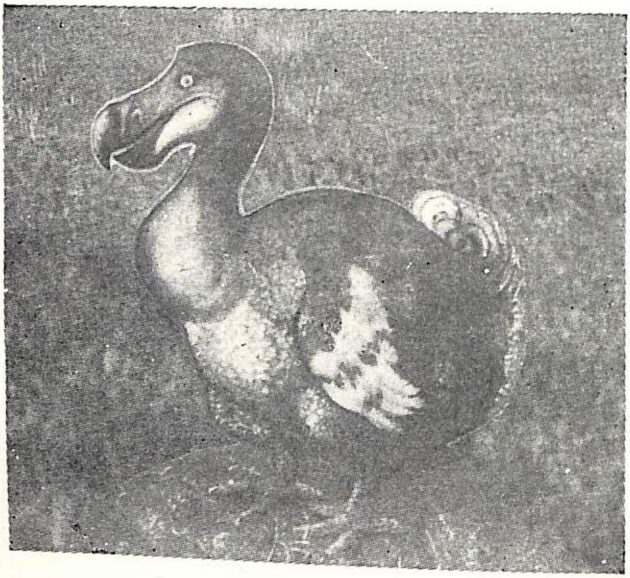


চিত্র ৯১। মার্শ ডিয়ার (Marsh Deer) বা জলাভূমির হরিণ—বিরল ও বিলীয়মান পশু। অল্প কিছু এখনও দেখা যায় কাজিরাঙ্গার অভয়ারণ্যে।

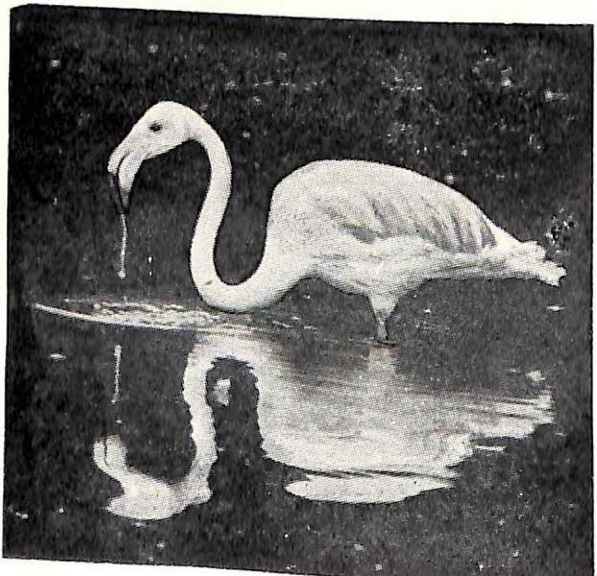
[ইউ. এস্. আই. এস.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]



চিত্র ৯২। উত্তর আমেরিকার বাইসন—আগে হাজার হাজার বাইসন দলবেঁধে অবাধে বিচরণ ক'রত উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। কিন্তু মানুষের হঠকারিতার ফলে এরা প্রায় নির্মূল হতে বসেছে। সংরক্ষণের ফলে এখনও অল্প কিছু কোন প্রকারে টিকে আছে সেখানকার অভয়ারণ্যে।



চিত্র ৯৩। ডোডো-পাখি—একদা মরিশাস দ্বীপে প্রচুর ডোডো-পাখি বিচরণ ক'রত। এই পাখির মাংস ছিল সুস্বাদু। এরা উড়তে পারত না, তাই সহজেই ধরা পড়তো। এমনি ক'রে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই শেষ পাখিটিও নিহত হয়।



চিত্র ৯৪। ফ্লেমিঙ্গো বা কানঠুঁটিয়া পাখি—এখনও প্রতি বছর হাজার হাজার ফ্লেমিঙ্গো পাখি সমবেত হয় দক্ষিণ ভারতের চিল্কা হ্রদে।

তাই অনেকেরই জিজ্ঞাসা,—বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতি, তিমি, বাইসন প্রভৃতি প্রাণীগুলিও কি একে একে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? বাস্তবিক, এইসব প্রাণী এবং এইরকম আরও শত শত প্রাণী একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রহর গুণছে।

বর্তমানে এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী কিন্তু মানুষ নিজেই। সত্যি, প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিকতায় কি নিদারুণ হস্তক্ষেপ করছে মানুষ, প্রতিনিয়ত! সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমাগত বন কেটে বসত গড়ে তুলছে, যেখানে-সেখানে ড্যাম বা জালাধার নির্মাণ করছে, গজদন্ত, শিং, মাংস, ব্লাবার (Blubber=তিমির চর্বি), চামড়া, ফার (Fur=পশুলোম) প্রভৃতির লোভে নির্বিচারে প্রাণী হত্যা করছে, চাষবাসের জন্যে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার ক'রে কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করছে, আর যেখানে-সেখানে কল-কারখানা স্থাপন ক'রে মাটি, জল ও বাতাসকে ক্রমাগত কলুষিত করছে। এসবের কুফল হয়তো তখনই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এর ফল হচ্ছে সুদূরপ্রসারী।

প্রকৃতির ভারসাম্য যেন এক সূক্ষ্ম সূতোয় ঝুলছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ! তখন এমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যাতে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রকৃতির ভৌত পরিবেশ, উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সেজন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী সংরক্ষণে আমাদের আরও বেশী ক'রে উদ্যোগী হওয়া দরকার।

কয়েক বছর আগে, কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে, বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ডঃ সলিম আলি সাবধানবাণী উচ্চারণ ক'রে বলেছেন,—কেরলের জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে, বিখ্যাত 'সায়ল্যাণ্ট ভ্যালি' বা নীরব উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল চিরকালের মতো প্লাবিত হয়ে যাবে। এর ফলে সেখানে একটি বিরাট এলাকার গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। কী সাংঘাতিক কথা!

সলিম আলির বিখ্যাত পাখির বইয়ে আছে—কচ্ছের রান-অঞ্চলে

ফ্লেমিংগো বা কানঠুটিয়া পাখি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, ডিম পাড়তে। কী অপূর্ব রূপের ঝলক! দুঃখের বিষয়, গুজরাটের কান্দলা বন্দরের নির্মাণ-

গুজরাটের অন্তর্গত কচ্ছের রান্-অঞ্চল বুনো গাধার জন্য বিখ্যাত। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "কচ্ছ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন,—"লালকার রিপোর্টে বুনো গাধার সংখ্যা পাই, ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত :

১৯৪৬ সলিম আলির অনুমান—৩,০০০—৫,০০০

১৯৬৯ গুজরাট বন বিভাগের আকাশ-যান সার্ভে—৩৬২

১৯৭৬ গুজরাট বন বিভাগের সরেজমিন গণনা—৭২০

১৯৮৩ গুজরাট বন বিভাগের সরেজমিন গণনা—১৯৮৯

লালকাকে প্রশ্ন করি,—মাঝে কয়েক বছর অতো কমে গেল কী ক'রে?

তিনি বলেন,—প্রধান কারণ, ১৯৫৮ ও ১৯৬১ সালের Surra রোগের মড়ক। এককালে এই শ্রেণীর বুনো গাধা ছড়িয়ে ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে—এখন যার অধিকাংশ পাকিস্তানে,—এবং ইরাণের, আগে যার নাম ছিল পারস্য, তার দক্ষিণ-পশ্চিমে। দেড়শ' বছর আগেও ঐসব অঞ্চলে হাজার হাজার এই জাতের গাধা ছিল। তারপর ক্রমশ লোপ পেয়ে অবশিষ্ট কিছু এখনও যা টিকে রয়েছে—শুধু এই আমাদের লিট্‌ল রান্-এ। সেই কারণেই এই বুনো গাধা এখন বিলীয়মান বিরল বন্যপশু পর্যায়ে গণ্য হয়েছে। লিট্‌ল-রান্-অঞ্চলও অভয়ারণ্য (Sanctuary) বলে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেছেন।"

* * *

"গিয়ে দেখবেন। রান্-এর মাঝে কয়েকটা দ্বীপ আছে। এমনকি, কোন কোন দ্বীপে পাহাড়ও আছে। দ্বীপগুলোকে বলা হয়—বেট্ (Bet)। রান্-এ গাছপালা, এমনকি ঘাসও নেই। জল ত' নয়ই। ঐ বেট্‌গুলোই হ'ল মরূদ্যান। সেখানে কিছু গাছ আছে, ঘাস ত আছেই, জলও থাকে। গাধাগুলো সারারাত ঐ বেট্-এ চরে। দরকার হলে এক বেট্ থেকে আর এক বেট্-এও যায়। রান্-এর কিনারায় গ্রাম বা চাষের ক্ষেত থাকলে, সেদিকেও চলে যায়, গোচারণ ভূমিতে ঢুকেও খেয়ে আসে। গ্রামবাসীরা স্বভাবতই তাদের ওসব জায়গায় দেখতে পেলেই তাড়া করে বার করে দেয়, কিন্তু কখনো তাদের প্রাণে মারে না।"

[শারদীয়া "দেশ", ১৩৯১]

প্রকল্পের ফলশ্রুতি-রূপে ভীত ও সন্ত্রস্ত ফ্লেমিংগো পাখির বিরাট উপনিবেশ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে,

সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশও এজন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ, রান-এ জলাভূমি কমে যাওয়ার ফলে লবণস্তর ক্রমশ উপরে উঠে পড়ছে। তাছাড়া ঐ সীমান্ত অঞ্চলে মিলিটারী প্লেনের বা জঙ্গী হাওয়াই জাহাজের আনাগোনা এখন অনেক বেড়ে গেছে। এটাও একটা কারণ হতে পারে।

আরও একটি সমস্যার দিকে ডঃ আলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত কয়েক বছরে ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, খরগোস প্রভৃতি রোডেন্টদের (Rodents=তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণীদের) সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। এরা মাটি খুঁড়ে, গাছপালা নষ্ট ক'রে, মরুভূমিকে বাড়িয়ে তোলায় সাহায্য করছে। হাজার হাজার মন ধান, গম এবং আরও নানারকম ফসল খেয়ে নষ্ট করছে। এদের সংখ্যা এতো বাড়লো কেন? আগে প্রিডেটররা (Predators), অর্থাৎ শিকারী প্রাণীরা (যেমন— প্যাঁচা, শিকারী বাজপাখি, ঈগল প্রভৃতি), এদের অনেক খেয়ে ফেলতো। কিন্তু এখন ঐসব পাখির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। কারণ, ওরা তো গৃহস্থের শত্রু, হাঁস-মুরগি ধরে নিয়ে যায়। তাই ওদের অনেককে গুলি ক'রে মারা হয়েছে। শুধু তাই নয়, লোকালয়ের কাছাকাছি যেসব অরণ্যে ওরা বাস করত, সেগুলি আমরা কেটে সাফ ক'রে দিয়েছি। ওরা থাকবে কোথায়?

সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—একজোড়া মেঠো ইঁদুরের সকল সন্তান-সন্ততি যদি অবাধে বংশ-বিস্তার করার সুযোগ পেত, তাহলে এক বছরের মধ্যেই তাদের সংখ্যা দাঁড়াত প্রায় দশ লক্ষ। আর এই বিরাট ইঁদুর-বাহিনীর জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন হ'ত প্রায় বারো লক্ষ টন! এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে ঐসব শিকারী পাখিরও কত প্রয়োজন!

এই প্রসঙ্গে 'Sportsmen's Organizations'-এর একটি বুলেটিনে বলা হয়েছে,—"There is more in the predator-prey relationship than meets the eye. Dame Nature fitted them for their role and she is a wise old Dame and knows what she is doing. Don't forget that you, Mr. Man, are the

greatest predator of them all, and a wanton destroyer, if ever there was one."

বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি শিকারী প্রাণীর (Predator) বেলায়ও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

ভারতে যে বাঘের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে তার একটি বড় কারণ হ'ল, বাঘের চামড়া বিদেশের বাজারে অনেক বেশী দামে বিকোয়। আর একটি কারণ, অরণ্যে বাঘের খাদ্য-প্রাণীর একান্ত অভাব। নিতান্ত ক্ষুধার তাড়নায়ই বাঘ লোকালয়ে এসে হানা দেয়, গরু-বাছুর নিয়ে পালায়। আর এজন্যই তারা অনেক সময় মানুষের শিকার হয়।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিরেক্টার শ্রীপ্রণবেশ সান্যাল সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,—

"বাঘকে বাঁচাতে হলে তার খাবারের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। তাই হরিণ, শুয়োর, বাঁদর এবং সুন্দরবনের ক্ষেত্রে মাছ, কাঁকড়া, তারখেল (Salvador Lizard), শামুকদেরও রক্ষা করা প্রয়োজন। তখনই প্রশ্ন জাগবে যে, বাঘের এই ব্যাপক খাদ্য-উপাদানগুলো কিভাবে বাড়ান যায়। এ ব্যাপারে উত্তর একটিই, সেটা হল এদেরও যথাযথ খাবারের ব্যবস্থা করা। সেই প্রচেষ্টাই হল মোক্ষম কাজ, অর্থাৎ গাছ, ঘাস, বাঁশ ইত্যাদির ব্যাপক সংরক্ষণ করা। এবার যদি পুরো ব্যাপারটা একসঙ্গে চিন্তা করা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে, শুধুমাত্র বাঘের নাম করে পুরো জঙ্গল, আবাসস্থল সংরক্ষণ, এমনকি বন্য-প্রাণীর পানীয় জলের ব্যবস্থা করার নাম করে জল ও মৃত্তিকা সংরক্ষণও হয়ে যাচ্ছে। এমন মানবকল্যাণকারী বহুমুখী প্রকল্প শুধু সংরক্ষণের মাধ্যমে এর আগে ভাবাই হয়নি, করা তো পরের কথা। অনেকের যে ধারণা, চল্লিশ হাজার বাঘ মাত্র সত্তর বছরে আঠার শ'তে এসে দাঁড়াল শুধু বাঁধনছাড়া শিকারের ফলশ্রুতি হিসাবে, তা বোধহয় সম্পূর্ণ সত্যি নয়। সত্তর বছরে বাঘের আবাসস্থলের যে ক্ষতি হয়েছিল, বনভূমির যে বিপুল সংকোচন হয়েছিল, তার মূল্যও দিতে হয়েছে শেষে খাদ্য শৃঙ্খলের উপরওয়ালা বাঘকে।"

[**দেশ**, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩ (২৪মে, ১৯৮৬)]

একজন প্রখ্যাত শিকারী তাঁর শিকারী জীবনের স্মৃতিকথায় সুন্দরবনের কুমীরের কথাও লিখেছেন। শীতকালে সুন্দরবনের চড়ায়

অনেক কুমীরের রোদ পোহাবার দৃশ্য তিনি দেখেছেন। প্রাণিজীবনের একটি চমৎকার উপভোগের দৃশ্য! কুমীরের চামড়াও খুব চড়া দামে বিক্রি হয়। তাই তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। ফলে, সুন্দরবনের কুমীরের সংখ্যা এতো হ্রাস পেয়েছে যে, কুমীরের রোদ পোহাবার দৃশ্য এখন আর চোখে পড়ে না বললেই চলে।

সম্প্রতি আর একটি প্রবন্ধে শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী লিখেছেন,—"আজ কুমীর প্রজাতি প্রায় ধ্বংসের মুখে চলে এসেছে। তাই প্রকৃত সংরক্ষণমূলক প্রকল্প 'কুমীর প্রকল্প' গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার তাগিদে। কুমীরের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণ বহুবিধ—কুমীরের চামড়া দেশী ও বিদেশী বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। কুমীরের বাসস্থানের সঙ্কোচন, মাছ ধরার জন্য নতুন নতুন নাইলন জালের ফাঁসে পড়ে কুমীরের মৃত্যু, ভূমিকম্প ও বন্যার প্রকোপে কুমীর মায়ের তৈরি ডিম সংরক্ষণের জন্য সাময়িক বাসস্থানের ক্ষয়ক্ষতি।......

স্থলের প্রাণিকুলের মধ্যে বৃহত্তম যে ডাইনোসর, তা আজ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষিত। কুমীর প্রজাতি হচ্ছে উক্ত প্রাচীন বৃহত্তম স্থলের প্রাণিকুল ডাইনোসরের নিকটতম বংশধর। তাই উক্ত প্রাচীন বৃহত্তম প্রাণিকুলকে ভালভাবে বুঝতে হলে কুমীর প্রজাতিকে জানা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে গবেষণা-মূলক পঠন-পাঠনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কুমীর প্রজাতির এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ প্রকৃতির শৃঙ্খলার একটি প্রাণী অন্যটির উপরে অঙ্গাঙ্গিভাবে নির্ভরশীল। বাণিজ্যিক মৎস্য ব্যবসায়ে কুমীর প্রজাতির এক অনন্যসাধারণ অবদান রয়েছে। কারণ এ প্রজাতি অন্যান্য খাদক মাছের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে মূল্যবান মাছের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাছাড়া মৃত প্রাণীদের আহার করে এ প্রজাতি নদীনালার জলের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে। ...

প্রকৃতির খেয়ালে, মানুষের অবহেলায়, টোরোডাক্টাইল ও ডাইনোসরের যুগ শেষ হয়েছে, কিন্তু আজ যারা বেঁচে আছে তারাও কি মানুষের নিদারুণ অবহেলা ও হঠকারিতার নিষ্ঠুর বলি হবে?"

[**রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা**—৩০ চৈত্র, ১৩৯২ (১৩ এপ্রিল, ১৯৮৬)]

হাতির সংখ্যাও এখন অনেক কমে গেছে। হাতির বাসস্থান হ'ল নিবিড় অরণ্য। বিজ্ঞানীরা বলেন, অরণ্যে হাতি থাকলে বুঝতে হবে যে, সেই অরণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। দুঃখের বিষয়, নির্বিচারে বন-জঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে। হাতিরা আর আগের মতো খাবার পাচ্ছে না। তাছাড়া তাদের শান্তিও বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই তারা মাঝে মাঝে লোকালয়ে এসে হানা দিচ্ছে, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে তছনছ করছে, খেতের ফসল খেয়ে ফেলছে। ক্ষতির পরিমাণ তো নিতান্ত কম নয়! তাই হিংসায় উন্মত্ত মানুষ ঐসব হাতিকে হত্যার সঙ্কল্প নিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এর ফলে হাতির সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। হয়তো আরও কমবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। সংরক্ষকের প্রধান চিন্তার বিষয়, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা, এবং বনের বিশেষ বিশেষ গাছপালা এবং পশু-পাখিকে সমূহ বিলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা।

কিন্তু অনেকেই হয়তো বলবেন, হিংস্র শিকারী প্রাণীদের, অর্থাৎ প্রিডেটরদের, রক্ষা করার দরকার কি? এরা তো মানুষের চির-শত্রু। এদের তো মেরে ফেলাই উচিত। তাদের সব সময় মনে রাখা দরকার যে, বন্য প্রাণী সংরক্ষণের পরিকল্পনা নিম্নলিখিত চারটি স্তম্ভের (বা, নীতির) উপরে দাঁড়িয়ে আছে :—

১। নৈতিক (**Ethical**)—আমাদের সামনে দু'টি পথই খোলা আছে—একটি প্রজাতি (Species)-কে আমরা সমূলে বিনাশ করতে পারি, নয়তো সমূহ বিনাশ থেকে তাদের রক্ষা করতে পারি। কোন্ পথ আমরা বেছে নেব? যা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তা বিনাশ করার কোনো অধিকার আমাদের আছে কি?

২। সৌন্দর্য-বিজ্ঞান সম্মত (**Aesthetic**)—প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য প্রাণী দেখে অপার আনন্দ উপভোগ করা যায়। বাস্তবিক, অরণ্যের পটভূমিতে একটি মুক্ত স্বাধীন বাঘ, সিংহ, হাতি বা গণ্ডার দেখার যে

আনন্দ তার কোনো তুলনা নেই। এরূপ দৃশ্য যেমন সুন্দর, তেমনি রোমাঞ্চকর!

এমন একটি দৃশ্যের ভারি সুন্দর এক বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন,—"আরও একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে। আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার খোঁজে হাতির পিঠে চড়ে। আখের খেত থেকে পট পট করে আখ উপড়িয়ে চিবোতে চিবোতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি, ভারিক্কি চালে। সামনে এসে পড়ল বন।......ঢুকে পড়ল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল।......হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল-দেখা নজর, এযে ঘাড়ে-গর্দানে একটা একরাশ মুরদ, অথচ তার ভার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুর বেলার রৌদ্রে চলল সে দৌড়ে। কী সুন্দর সহজ চলনের বেগ! মাঠে ফসল ছিল না। ছুটন্ত বাঘকে ভরপুর করে দেখবার জায়গা এই বটে, সেই রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।"

বাস্তবিক, এমন দৃশ্য যিনি একবার দেখেছেন, তিনি কি তা কখনও ভুলতে পারেন! রবীন্দ্রনাথও ভুলতে পারেন নি, ছেলেবেলার সেই স্মৃতি। এ বিষয়ে কারো মনে কোন রকম সন্দেহ থাকলে, তিনি একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, বন্য-প্রাণী সংক্রান্ত টেলিভিসনের বা সিনেমার প্রোগ্রাম ছোট-বড় সকলের কাছেই কত জনপ্রিয়! আর সেগুলি কত দর্শক আকর্ষণ করে! বাস্তবিক, বন ও বন্য-প্রাণী না থাকলে, আমাদের জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন এবং নিরানন্দ হয়ে পড়বে।

৩। **বৈজ্ঞানিক (Scientific)**—জীববিদ্যা অনুশীলনে, বন ও বন্য-প্রাণীই হল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। ব্যাপক অনুসন্ধানের আগেই এদের বিনষ্ট হতে দেওয়ার মতো মূর্খতা আর কিছুই নেই।

৪। **অর্থ নৈতিক (Economical)**—প্রতিটি অভয়ারণ্যেরই এক বিশেষ আকর্ষণ আছে, যেমন—সুন্দরবনে আছে বাঘ, গির অরণ্যে সিংহ,

শ্রীপ্রণবেশ সান্যাল আরও লিখেছেন,—

"এখন সারা ভারতে পনেরোটি ব্যাঘ্রপ্রকল্প রয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাক্সা ও সুন্দরবনে দুটি প্রকল্প রয়েছে। ১৯৮৪ সালের সারা ভারত বাঘসুমারীতে বাঘের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪০০৫টি। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালের ১৩৫টি বাঘ ১৯৮৪ সালে বেড়ে ২৬৪-তে দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঘের আবাসভূমি ম্যানগ্রোভ (Mangrove) জঙ্গলেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সুন্দরবনের বাঘকে উভচরও বলা যায়। বাদাবনের শতকরা ৩৫ ভাগই জল, তাই বাঘের অবস্থিতি অনেকটা সময়ই জলের মধ্যে হয়ে থাকে। আট কিলোমিটার চওড়া নদীকেও এখানে সাঁতরে পার হতে দেখা গিয়েছে। এপ্রিল আর মে মাসে বনের গাছেরা ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। প্রথম খলসী ফুলের মধু তৈরী করে বড় বড় পাহাড়ী মৌমাছি (Rock Bees)। তারপর আস্তে আস্তে গরান, কেওড়া এবং সবশেষে গেঁওয়ার ফুল ফোটে। বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পসমন্বিত গাছের সংখ্যা এবং ফুলে মধু সৃষ্টিকারী নেক্টারের (nectar) বৃদ্ধি হয়। আগে গড়ে যেখানে চারশ কুইণ্টাল মধু হত, সেখান থেকে ১৯৮৫ সালে ৭৭৭ কুইণ্টাল মধু বেরিয়েছে।

কাজিরাঙ্গা কিংবা জলদাপাড়ায় গণ্ডার, চিল্কা হ্রদে কিংবা সজনেখালিতে নানারকম পাখি, ইত্যাদি। একটু সচেষ্ট হলেই সে সব জায়গায় অনেক পর্যটক আকর্ষণ করা যায়, এবং তাতে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশে-বিদেশে গড়ে উঠেছে নানা রকম 'ন্যাশন্যাল পার্ক' বা অভয়ারণ্য এবং 'বার্ড স্যাংচুয়ারি' বা পক্ষিনিবাস।

শুধু তাই নয়, মাংস, চামড়া বা ফার আহরণের উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পশুপাখিগুলিকে অনায়াসে ছাঁটাই ক'রে ফেলা যায়। তবে সে সময় লক্ষ্য রাখা দরকার, যাতে প্রকৃতির ভারসাম্য কোন প্রকারে বিনষ্ট না হয়। সবকিছু সুপরিকল্পিতভাবে করতে পারলে, চাহিদা অনুযায়ী, মাংস, চামড়া কিংবা ফার সরবরাহ করার কোন সমস্যাই আর থাকবে না। উপরন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি লাভজনক হয়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় সিল্ভারফক্সের ফার (Fur) অত্যন্ত মূল্যবান। শিকারীরা সাইবেরিয়ার জঙ্গলে গিয়ে তাদের শিকার করে নিয়ে



চিত্র ৯৫ । সারস—ইউরোপে অনেকের ধারণা, সারস সৌভাগ্যের বার্তা বহন ক'রে আনে ।



চিত্র ৯৬ । মা-পেলিক্যান তার ঠোঁটের থলির মধ্যে ক'রে মাছ নিয়ে বাসায় ফিরছে, ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের খাওয়াবে বলে ।



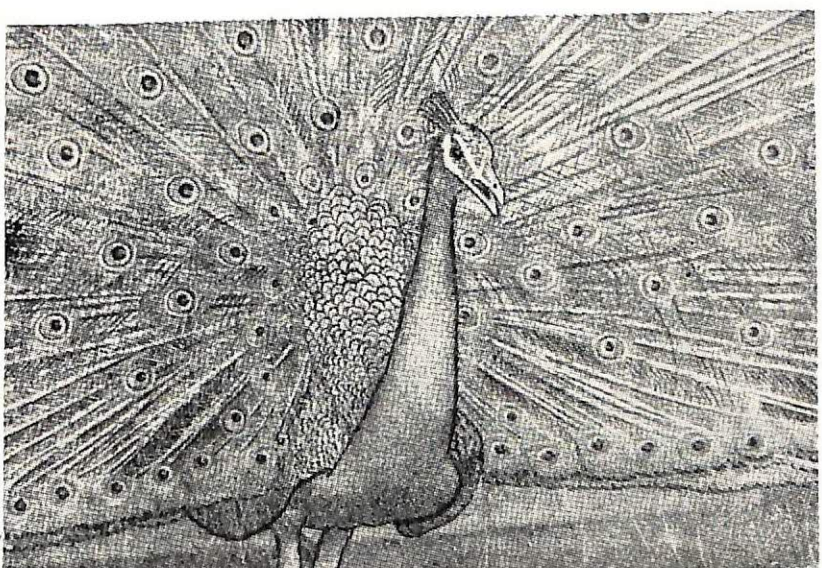
চিত্র ৯৭। তোতা-পাখি—মানুষের মতো কথা বলতে পারে।



চিত্র ৯৮। পেঁচা—ইঁদুরের যম।



চিত্র ৯৯। গায়ক-পাখি নাইটিংগেল।



চিত্র ১০০। ময়ূর—ভারতের জাতীয় পাখি। পেখম-তোলা ময়ূর বনভূমির সৌন্দর্য।

['দি স্টেট্সম্যান' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত]



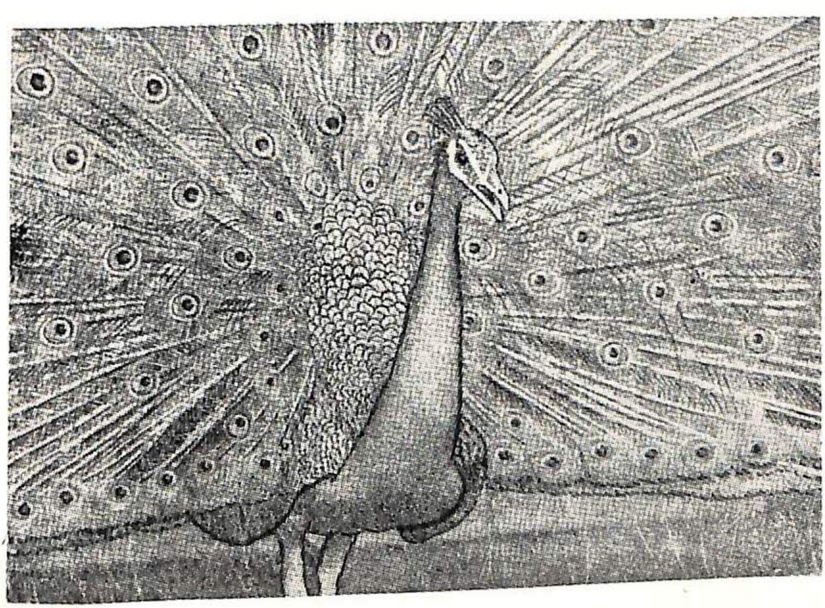
চিত্র ৯৭ । তোতা-পাখি—মানুষের মতো কথা বলতে পারে ।



চিত্র ৯৮ । পেঁচা—ইঁদুরের যম ।



চিত্র ৯৯। গায়ক-পাখি নাইটিংগেল।

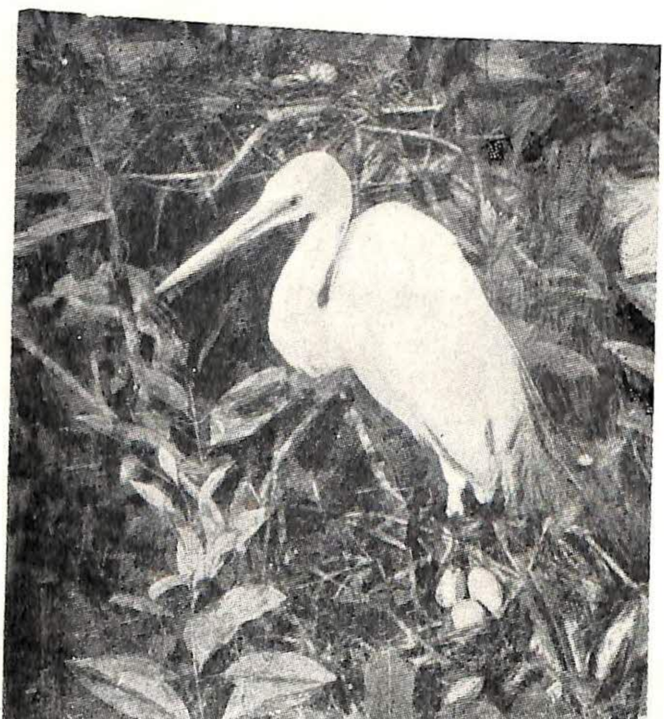


চিত্র ১০০। ময়ূর—ভারতের জাতীয় পাখি। পেখম-তোলা ময়ূর বনভূমির সৌন্দর্য।

['দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত]



চিত্র ১০১। সজনেখালির পক্ষিনিবাস।
[আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীকল্যাণ দে]



চিত্র ১০২। পক্ষিনিবাসে পাখির নিরাপদ আশ্রয়।

আসত। এমনি করে তাদের বংশ লোপ পেতে বসেছিল। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নানারকম গবেষণা করে মানুষের পরিবেশে তাদের পোষ মানালেন। খামারে তাদের বংশ-বিস্তারের ব্যবস্থা হ'ল। ফলে, ফারের ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠল। সিল্ভার ফক্সের বেলায় যা সম্ভব হয়েছে, অন্য প্রাণীর বেলায় তা সম্ভব হবে না কেন ?

তবে এখানে আর একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। অভয়ারণ্যে সংরক্ষিত হিংস্র প্রাণীরা যাতে নিরীহ গ্রামবাসীদের জীবন বিপন্ন করতে না পারে, সেদিকেও সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি প্রাণীর হিংস্রাচার নিরস্ত্র অসহায় গ্রাম-বাসীদের যথেচ্ছ নিধন করবে, এরূপ কোন অবস্থার কথা ভাবাও যায় না। ইকোলজি (Ecology) বা বাস্তব্য-বিদ্যার তাত্ত্বিক স্নেহ শুধু বাঘ, সিংহ কুমীর প্রভৃতি প্রাণী সম্পর্কে প্রযুক্ত হলেই চলবে না। এরূপ পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী

আবার সুন্দরবনের মাছের ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখলে ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অবদান প্রতিফলিত হবে। বাদাবনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে গাছের পাতা পড়া প্রচুর বেড়ে গিয়েছে। এখানকার গাছের পাতা পুরু মোমে ঢাকা থাকে। এর কারণ হল নোনা এলাকার গাছের জল টানতে খুব কষ্ট হয় তাই নদীভরা জল থাকলেও সবই প্রধানত সমুদ্রের নোনা জল হওয়ায় ম্যানগ্রোভ গাছকে বেশ জলসংকটের মধ্যেই চলতে হয়। পাতার ফুটো দিয়ে বাইরে যাতে বেশী জল ছাড়তে না হয় সেইজন্য প্রকৃতি-দেবী এই মোমের আস্তরণের ব্যবস্থা করেছেন। মোমে ঢাকা পাতা দিনের পর দিন জোয়ার-ভাঁটার দোলায় দুলে দুলে ভেসে বেড়ায়। ফলে ছাতা পড়তে খুব সুবিধা হয়। এই ছাতা, আর কিছু বাদাবনের জীবাণুরা, পাতাকে পচিয়ে মাছের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারে পরিণত করে। এছাড়াও কেওড়া জাতীয় গাছের পাতায় জিবারালিক অ্যাসিড নামক হরমোন থাকায় সোনায় সোহাগা হয়েছে। সমুদ্র থেকে দলে দলে বাগ্দা চিংড়ি ডিম পাড়তে এই হরমোনযুক্ত উপাদেয় খাদ্যভাণ্ডারের দিকে আকৃষ্ট হয়, যাতে বাচ্চারা অনায়াসে প্রচুর খাবার পায়। আবার হরমোনের প্রভাবে মাস চারেকের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠে।

চিংড়ি পোনা খাবার আশায় পেছন পেছন পার্শে জাতীয় mullet মাছ ভীড় করতে থাকে। তাদের খেয়ে ক্যাটফিশ বা রাক্ষুসে মাছরাও (যেমন কানমাগুর, মেদট্যাংরা ইত্যাদি) দল বাড়ায়। এই জন্যই ১৯৭৩ সালে ব্যাঘ্র-প্রকল্প শুরু হওয়ার পর যখন ১৯৮৩ সালে সুন্দরবনের খাঁড়িতে মাছ ধরার পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হল, দেখা গেল, শতকরা ৬৫ ভাগ বেড়ে গেছে। এ ছাড়া বাগ্‌দার পোনা ধরতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে শুরু করে বাড়ির বউরা পর্যন্ত সবাই এক ফসলা দেশের বাদা অঞ্চলের খাঁড়িতে জীবিকার উদ্দেশ্যে নেমেছে।

ভারতীয় সুন্দরবনের আয়তন ছিল ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু বন কেটে বসত করতে গিয়ে এখন বনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪২৬৪ বর্গ কিলোমিটার। ...এই নতুন বন কেটে বসত করা শুরু হয়েছে প্রধানত অষ্টাদশ শতক থেকে। নোনা জমি চাষের উপযুক্ত করা হয়েছে বাঁধ দিয়ে জোয়ারের জলকে আটকে। এতে করে বর্ষাকালে না হয় আমনের আবাদ হল, কিন্তু শীতকালে সেচ ছাড়া তো চাষের উপায় নেই। লম্বা লম্বা সরকারী খাল করা আছে সাতজেলিয়া দ্বীপে। কিন্তু ৮ থেকে ১০ ফুটের বেশী গভীর করলেই খালে ধরা বৃষ্টির জল নোনা হয়ে যাবে।

গ্রামবাসীদের এবং গৃহপালিত পশু-পাখিদের প্রাণও সৃষ্টির পারিবেশিক সম্বন্ধের যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন প্রাণ নয়। সুতরাং, তাদের জীবনের নিরাপত্তার কথাও সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এ বিষয়ে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা তা অবশ্যই দেখতে হবে। নতুবা এরূপ পরিকল্পনা জনসাধারণের সমর্থন কখনই পাবে না।

ভরসার কথা এই যে, বন্য-প্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে এখন অনেকেই অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এইটুকুই তো যথেষ্ট নয়। এজন্য সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন। প্রথমেই একটি বিরাট এলাকা নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে গাছপালা, ঝোপঝাড়, লতা-গুল্ম লাগিয়ে এমন কৃত্রিম অরণ্যের সৃষ্টি করতে হবে, যা হুবহু প্রাকৃতিক অরণ্যের মতো না হলেও তার কাছাকাছি যেন হয়। তাহলে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকবে, এবং পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সব পরস্পরের উপর নির্ভর ক'রে সেখানে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে। খাদ্য-খাদক সম্পর্কের

কথা বিবেচনা করে দেখতে হবে। কারও যাতে খাদ্যাভাব না হয়। তারপর দেখতে হবে, কোন্ প্রাণীর উপরে পরিবেশের প্রভাব কি রকম হচ্ছে। তাদের সংখ্যা বাড়ছে, না কমছে, না অপরিবর্তিত থাকছে। আশেপাশের জনজীবনের উপরে তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সে-সব দেখার জন্যে অবিরাম গবেষণা চালাতে হবে। আর তারই উপর নির্ভর করে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অবশ্যই করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। স্বল্প বেতনভুক অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীদের উপরে এইসব অভয়ারণ্য পাহারা দেওয়ার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলে না। কারণ, একটি বন্য-প্রাণীর বিনিময়ে কয়েক হাজার টাকা পাওয়ার প্রলোভন জয় করা যার-তার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যে দরকার হবে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত এমন সব কর্মী, যারা বন্য প্রাণী সংরক্ষণের গুরু দায়িত্বকে গ্রহণ করবেন জীবনের এক মহান ব্রত হিসেবে, —যাদের কখনও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করা যাবে না, আর

তাই চৈত্র-বৈশাখে খাল যায় শুকিয়ে, কেবল আলু, বিট এবং লঙ্কার চাষ করা হয়, যাতে অন্তত মজুরিটা পোষায় এবং অল্প সেচেই কাজ হয়। বেলে মাটিতে তরমুজও ভালই ফলন দেয়, তবে পুরো চাষ না করলে তো আর পেট চলে না। তাই অনেকেই বেরিয়ে যায় মাছ ধরতে, মধু ভাঙতে, কাঠ কাটতে, এই সুন্দর-বনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের মধ্যে।

জঙ্গলের রাজ্যে ঢুকতে সকলেরই ভয় বাঘের। মৌলেরা হেঁতালের ঝাড় তৈরী করে ডাঙ্গায় (মালে) নেমে পড়ে হেঁতালের ঝাড়ু জ্বালিয়ে মৌমাছি তাড়ায়। মালে তখন বাঘিনী বাচ্চাদের নিয়ে বসে আছে। সুন্দরবনের বাঘের মিলনের সময় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, অন্যান্য জায়গায় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। মিলনের ১১০ দিন পরে বাচ্চা হয়, কাজেই মধু আহরণের সময় বাচ্চার বয়স মাত্র তিন মাস। বাঘিনীকে সতর্ক প্রহরায় থাকতে হয়। অসাবধানী মৌলকে সে হয় আক্রমণ করে, না হলে তখনকার মতো পালিয়ে নদীর ধারের জেলের ওপর ঝাঁপ দেয়।……

ব্যাঘ্র-প্রকল্প শুরু হওয়া থেকেই ভাবনা চিন্তা করা হতে লাগল, কিভাবে মানুষ বিধাতার সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব হিসাবে ব্যাঘ্রকুলকে ধ্বংস না করেও নরখাদকের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, এ

ব্যাপারে মিষ্টি জলের পুকুর খোঁড়া শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সাল থেকে। তারপর ১৯৭৯ সালে দেখা গেল, হেঁতালের ঝোঁপ কাটা বন্ধ করতে পারলে কিছু হয় কিনা। এ জন্য ঘেরের অবশিষ্ট শুকনো জ্বালানীর পারমিট চালু হল এবং হেঁতাল কাটা বন্ধ করা হল। হেঁতাল বন সাধারণত একটু উঁচু জায়গাতেই হয়, যেখানে ভরা কোটাল ছাড়া জল ওঠে না। পাতার রঙও বাঘের গায়ের রঙের সঙ্গে মেলে। কাজেই বাঘিনীর বাচ্চাদের নিয়ে লুকিয়ে থাকার পক্ষে প্রকৃষ্ট বাসস্থান। এর ফল পাওয়া গেল ১৯৮১ সালে, যখন বাৎসরিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেল যে, নরখাদকের বলি ২৮ টিতে নেমে এসেছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যার বাৎসরিক গড় ছিল ৪৫ জন করে।..

নরখাদকের সঙ্গে ব্যাঘ্র প্রকল্পের বুদ্ধির লড়াই ১৯৭৪ সালেই শুরু হয়েছিল বলা যায়। মুন্সী বয়নুদ্দিনের লেখা 'বনবিবির জহুরনামা' (বাংলা হরফে লেখা হলেও, ডান থেকে বাঁয়ে পড়া হয়) বইটি পড়ে বনবিবির পূজো করেই এতকাল বউলেরা বনে ঢুকতো। জানুয়ারির শেষ দিকে বা ফেব্রুয়ারির প্রথমে সর্বত্র বনবিবির থানে ধুমধাম করে পূজো হয়। বাঘের ভয়ে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই মূর্তি পূজো করে মালে নামতো। ১৯৭৪ সালে প্রথম

যাদের জ্ঞাতসারে কখনই বন্য-প্রাণী সংহার করা সম্ভবপর হবে না।

চোরা শিকারী অবৈধ সংহার ক্রিয়া গোপনে সেরে যাতে পালাতে না পারে, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আর অপরাধী ধরা পড়লে, তার যাতে কঠোর সাজা হয়, তাও সকলকে দেখতে হবে। এমন সাজা দিতে হবে, যাতে সে পুনরায় এই অপরাধ করতে সাহস না করে। এজন্যে প্রয়োজন হলে আইনের শাসন আরও কঠোর করতে হবে। তবেই এই পরিকল্পনা সাফল্য মণ্ডিত হবে, নতুবা নয়।

এমন একটা সময় এসেছিল যখন, মানুষের অবহেলার ফলে, সারা বিশ্বের অনেক বন্য-প্রাণীই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু সেই পরিণতিতে পৌঁছবার আগেই বিশ্বের চিন্তাশীল অনেক বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে সাবধান হওয়ার জন্যে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে এখন পৃথিবী জুড়ে আন্দোলন চলছে, ভারতও সেই আন্দোলনের সামিল হয়েছে।

১৯৮২ সালের ১লা অক্টোবর

একটি মিটিংয়ে ভাষণ দেওয়ার সময় তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১২-টি বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের এক কর্মসূচীর কথা প্রথম বলেন। ইতিপূর্বে, ১৯৭২ সালে, ভারতে বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ আইন বলবৎ করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তালিকাভুক্ত কতক-গুলি বন্য-প্রাণী শিকার এবং সেই সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিরোধ করা। তখন প্রায় ২৫০ রকম বন্য-প্রাণী এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর ১৯৮০ সালে বন-সংরক্ষণ আইনও বলবৎ করা হয়েছে। আর ১৯৮০ সালে ডিসেম্বর মাসেই ১৯-টি জাতীয় পার্ক বা অভয়ারণ্য (National Park) এবং ২০৫-টি পক্ষিনিবাস (Bird Sanctuary) সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে এখন ব্যাঘ্র-প্রকল্প, কুমীর-প্রকল্প, কচ্ছপ-প্রকল্প প্রভৃতির কাজ বিপুল উদ্যমে এগিয়ে চলেছে। এছাড়া ১৬-টি রাজ্যে আছে মোট ৪৮-টি উদ্ভিদ্-উদ্যান এবং ১৯-টি রাজ্যে আছে মোট ৪৪-টি চিড়িয়াখানা। বিলীয়মান বিরল গাছপালা এবং পশু-পাখি সংরক্ষণে এগুলিও বিশেষ অবদান যুগিয়ে যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা চালু হল। বলা হল সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩ টের মধ্যে বনের কাজ সারতে। কারণ বেশী ভোরে বা বিকেলের দিকেই বেশীর ভাগ সময় বাঘ মানুষের ওপর ঝাঁপ দেয়। কিন্তু ফল বিশেষ সুবিধের হল না, কারণ বিকেলের ভাঁটার সময় জেলেরা জাল ঝাড়তে মাটিতে নামে। বাঘের কবলে সবচেয়ে বেশী লোক প্রাণ দেয় মে মাসে। আর ঐ সময়ই সুন্দরবনের খাঁড়ির জল সবচেয়ে নোনা থাকে। তাই অনেকের ধারণা যে, বাঘের লিভার এবং কিডনি এই নোনা জল খেয়ে খারাপ হয়ে যাবার ফলে মেজাজও খিঁচড়ে থাকে। তাই মিষ্টি জলের পুকুর খোঁড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয় ১৯৭৪ সাল থেকেই। কিন্তু ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের বাৎসরিক বাঘের কবলে মৃত্যুর হার হল গড়ে ৪৮টি করে। ১৯৭৯ সালে হেঁতালের পাশ বন্ধ করে অন্য শুকনো জ্বালানীর ব্যবস্থা করা হল। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ বাৎসরিক গড় মৃত্যুর হার কমে গিয়ে দাঁড়াল ৩০ টিতে। আর ১৯৮৩ সালে প্রথম বৈদ্যুতিক নকল মানুষ ব্যবহার শুরু করা হয়। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫-র বাৎসরিক বাঘের কবলে মৃত্যুর গড় হার নেমে দাঁড়িয়েছে ২১টিতে। এক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত মনে হয় যে, শেষের পদ্ধতিটিই সবচেয়ে ফলপ্রসূ। সুন্দরবনের চতুর নরখাদক বাঘকে নকল মানুষ দিয়ে শিক্ষা দেওয়ায়, আজ

মৌলদের ভয় কমে গিয়েছে। বছরে যেখানে গড়ে ৪০০ কুইন্টাল মধু আহরিত হয়, সেটা এখন ৭৭৭-এ এসে দাঁড়িয়েছে। আগে যেখানে ৪০০ লোক গড়ে মধু ভাঙ্গতে যেত, সেখানে এখন ১৯৮৫ সালে ৯৭৭ জন মৌলে ঢুকেছিল বাদাবনের ভেতরে।.........

মানুষ তাহলে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধিমান জীবের নাম রেখে বাদাবনের নরখাদককে উচিত শিক্ষা দিয়ে, তার রাজত্ব থেকেই মধু, মাছ আহরণ করে আনছে। বজায় রেখে যাচ্ছে হিংসার সঙ্গে অহিংসার ভারসাম্য।

[**দেশ**, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩
(২৪ মে, ১৯৮৬)]

অভয়ারণ্যগুলি এবং পক্ষি-নিবাসগুলি যে শুধু পশু-পাখিদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠবে, তা নয়, সাধারণ মানুষের কৌতূহল মেটাবার ব্যাপারেও এগুলি অনেক সাহায্য করবে। নানা রকম দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ্ ও পশু-পাখি স্বচক্ষে দেখার এবং তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানবার সুযোগ এখানে পাওয়া যাবে।

একটি কথা এখন সকলেরই মনে রাখতে হবে যে, পরিবেশের সুস্থতা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার সংগ্রাম, প্রকৃতপক্ষে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষারই সংগ্রাম।

"সুন্দরবনের বাদাবন এখন কাঠচোর ও চোরা শিকারীদের স্বর্গরাজ্য। হরিণ শিকার করতে ওদের এখন আর বন্দুক ব্যবহার করতে হয় না। তারের ফাঁসে ওরা এখন ডজন ডজন হরিণ মারে ও গ্রামের হাটে-বাজারে তার মাংস বিক্রি করে। বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী কলকাতার মস্তানরা ভটভটি নৌকো নিয়ে টাইগার রিজার্ভের আন্দরমহল পর্যন্ত টহল দিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে সে কথা প্রচার করে। সরু খাল, খাড়ির ভেতর গণ্ডা গণ্ডা চোরাই কাঠের নৌকো লুকিয়ে থেকে রাতারাতি জোয়ারের গোণ ধরে ভেড়ি অঞ্চলের গোপন ঘাটে এসে ভরা-নৌকো খালাস করে ফিরে যায়। পরে সেই কাঠ লরিবাহিত হয়ে উল্টাডাঙ্গার ব্যবসায়ীর আড়তে চলে আসে।...এই অবস্থা চলতে দিলে ৪০/৫০ বছরের মধ্যে সুন্দরবনের জঙ্গল শেষ হয়ে যাবে। যাচ্ছেও।"

—বিশ্বনাথ বসু, পূর্ব-ভারত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতি, কলকাতা-১৬

[দেশ—চিঠিপত্র, ৯ আগস্ট, ১৯৮৬]

সজনেখালির পক্ষিনিবাস পাখিদের তীর্থভূমি। জুনের শেষ সপ্তাহে শত শত শামুকখোল, পানকৌড়ী, বাজকা (Night heron), লাল বক (Purple heron) ইত্যাদি পাখি এখানে বাসা বাঁধার জন্যে আসে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর—এই তিন মাসে এই বনাঞ্চল পাখির কলরবে মুখরিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রতি বছর ১৫—১৬ হাজার পাখি এখানে আসে। তারা ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয়। তারপর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তারা বাচ্চা নিয়ে চলে যায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সহাবস্থান একান্ত প্রয়োজন

প্রকৃতি দু'হাত উজাড় ক'রে সব রকম সম্পদ ঢেলে দিয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে। এর একদিকে সুদূর বিস্তৃত তুষারাবৃত হিমালয়, অন্যদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত অতল সমুদ্র। সারাদেশে এখানে-ওখানে প্রবাহিত হচ্ছে কত স্রোতস্বিনী নদী! এর একদিকে আছে শুষ্ক মরুভূমি, কিন্তু অধিকাংশ স্থান জুড়েই আছে শস্য-শ্যামলা সুজলা-সুফলা খেত-খামার, কিংবা স্নিগ্ধ সুন্দর সবুজ বনানী। সেখানে কতরকম পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গের আনাগোনা! এই সম্পদ সযত্নে রক্ষা করা, তাদের সদ্ব্যবহার করা, আমাদের সকলেরই একান্ত কর্তব্য।

আমরা প্রকৃতির সন্তান। এই পৃথিবীতে, প্রকৃতির এই বিশাল সাম্রাজ্যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সহাবস্থান একান্ত প্রয়োজন। কারণ, একের অভাবে অন্যের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

একথা এখন সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে, এই পৃথিবীটা শুধু মানুষের জন্য নয়; গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি সকলেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

আমরা জানি, প্রকৃতি পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। এজন্য কোনো জীবই সংখ্যায় খুব বেশী বাড়তে পারে না, আবার খুব কমেও যায় না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। একেই বলা হয় প্রকৃতির ভারসাম্য। প্রকৃতি এই পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে একটা ভারসাম্য স্থির ক'রে দিয়েছে। এই ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই বিপদ।

মানুষ তার অব্যবহিত লাভের জন্য, কিংবা কেবল শখ মেটাবার জন্য, যদি নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলে, কিংবা প্রাণী হত্যা করে, তাহলে সেই ভারসাম্য বিনষ্ট হতে বাধ্য। আর জীব-জগতের ভারসাম্য নষ্ট হলে, মানুষকেও তার ফল ভোগ করতেই হবে। এমন কি, তার নিজের অস্তিত্বই একদিন বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই কারণে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, গাছপালা পশু-পাখি সবাইকে সাধ্যমত রক্ষা করে, এবং তাদের

রঙীন চিত্র—IX



চিতল হরিণ—অরণ্যের শোভা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সহাবস্থান একান্ত প্রয়োজন

প্রকৃতি দু'হাত উজাড় ক'রে সব রকম সম্পদ ঢেলে দিয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে। এর একদিকে সুদূর বিস্তৃত তুষারাবৃত হিমালয়, অন্যদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত অতল সমুদ্র। সারাদেশে এখানে-ওখানে প্রবাহিত হচ্ছে কত স্রোতস্বিনী নদী! এর একদিকে আছে শুষ্ক মরুভূমি, কিন্তু অধিকাংশ স্থান জুড়েই আছে শস্য-শ্যামলা সুজলা-সুফলা খেত-খামার, কিংবা স্নিগ্ধ সুন্দর সবুজ বনানী। সেখানে কতরকম পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গের আনাগোনা! এই সম্পদ সযত্নে রক্ষা করা, তাদের সদ্ব্যবহার করা, আমাদের সকলেরই একান্ত কর্তব্য।

আমরা প্রকৃতির সন্তান। এই পৃথিবীতে, প্রকৃতির এই বিশাল সাম্রাজ্যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সহাবস্থান একান্ত প্রয়োজন। কারণ, একের অভাবে অন্যের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

একথা এখন সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে, এই পৃথিবীটা শুধু মানুষের জন্য নয়; গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি সকলেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

আমরা জানি, প্রকৃতি পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। এজন্য কোনো জীবই সংখ্যায় খুব বেশী বাড়তে পারে না, আবার খুব কমেও যায় না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। একেই বলা হয় প্রকৃতির ভারসাম্য। প্রকৃতি এই পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে একটা ভারসাম্য স্থির ক'রে দিয়েছে। এই ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই বিপদ।

মানুষ তার অব্যবহিত লাভের জন্য, কিংবা কেবল শখ মেটাবার জন্য, যদি নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলে, কিংবা প্রাণী হত্যা করে, তাহলে সেই ভারসাম্য বিনষ্ট হতে বাধ্য। আর জীব-জগতের ভারসাম্য নষ্ট হলে, মানুষকেও তার ফল ভোগ করতেই হবে। এমন কি, তার নিজের অস্তিত্বই একদিন বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই কারণে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, গাছপালা পশু-পাখি সবাইকে সাধ্যমত রক্ষা করে, এবং তাদের

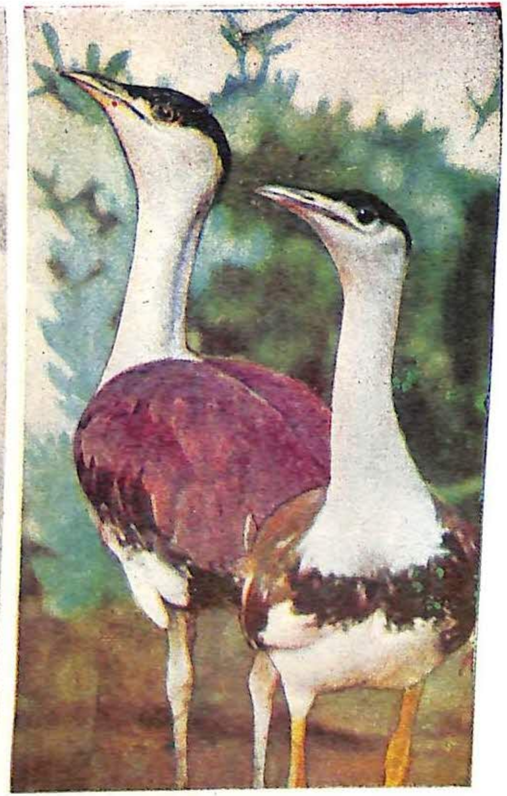
রঙীন চিত্র—IX



চিতল হরিণ—অরণ্যের শোভা।



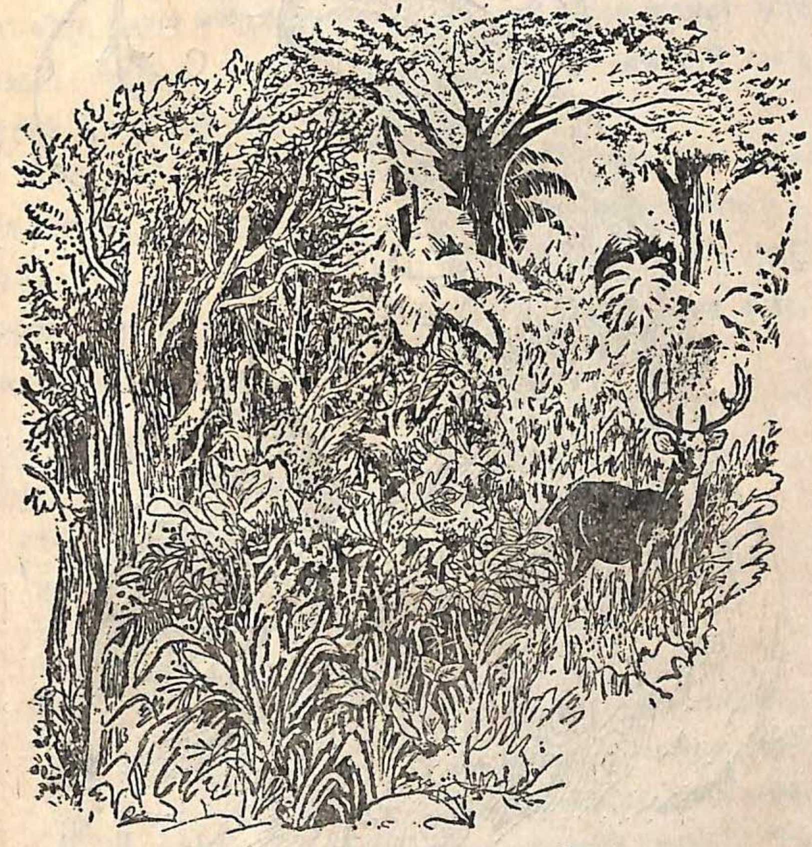
বিলীয়মান বিরল পাখি—স্বর্ণ-ঈগল (The Golden Eagle)। মানুষের হঠকারিতার ফলে প্রায় লুপ্ত হতে ব



বিলীয়মান বিরল পাখি—গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড (Great Indian Bustard)। একপ্রকার দৌড়বাজ পাখি। এও প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে।

সঙ্গে সহাবস্থান করে, তারপর নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে অত্যধিক স্বার্থপরতার ফল হবে আত্মঘাতী হওয়ার সামিল।

সুতরাং, এবিষয়ে আমাদের অবিলম্বে সচেতন ও সাবধান হওয়া দরকার। আর সেজন্যই আমাদের আরও বেশী ক'রে বৃক্ষ-রোপণে, বন-সৃজনে এবং নানাপ্রকার প্রাণী-সংরক্ষণে—এক কথায় পরিবেশ-সংরক্ষণে, উদ্যোগী হতে



চিত্র ১০৩। বন ও বন্য-প্রাণী সংরক্ষণে সকলেই উদ্যোগী হোন।

হবে। শুধু আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই নয়, মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য এবং বহু দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ্ ও প্রাণীকে সমূহ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও এরূপ করা আমাদের এক নৈতিক দায়িত্ব এবং জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। এই দায়িত্ব



চিত্র ১০৪। ময়ূর ও ময়ূরী—ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি। বন্য ময়ূর বনভূমির সৌন্দর্য। এদের সযত্নে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগী হোন।

পালন না করা গুরুতর অপরাধ। এই কর্তব্যে অবহেলা করা কখনও উচিত নয়। আর শুধু নিজে কর্তব্য পালন করলেই চলবে না। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে সবরকম দুর্লভ উদ্ভিদ্ এবং পশু-পাখির জীবন রক্ষার ব্যাপারে সতত সচেতন থাকেন, এবিষয়ে যত্নবান হন, এবং এটাকে তাদের এক নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। এর একমাত্র উপায় হ'ল, খুব অল্প বয়স থেকেই এ বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া, এবং জীবন-বিজ্ঞান সম্পর্কে সকলকে আরও বেশী ক'রে আগ্রহী ক'রে তোলা। সবাইকে একবাক্যে বলতে হবে—বন ও বন্য-প্রাণী রক্ষায় সকলেই আরও বেশী ক'রে উদ্যোগী হোন।

আশা করি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবেন, আর সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও এবিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন ক'রে তুলবেন। তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবেন উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে ভালবাসা ও মমত্ববোধ, যাতে বড় হয়ে তারাও তাদের কর্তব্য পালন করতে উদ্বুদ্ধ হয়।



একটি গাছ পোঁতার অর্থ, জীবন্ত কিছু একটা রেখে যাওয়া। কোনও মানুষ যদি তা করেন, আরও একটা জীবন যদি তিনি পিছনে রেখে যান, তাহলে তাঁর বেঁচে থাকা সার্থক।

[একটি রুশ প্রবাদ]



চিত্র ১০৪। ময়ূর ও ময়ূরী—ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি। বন্য ময়ূর বনভূমির সৌন্দর্য। এদের সযত্নে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগী হোন।

পালন না করা গুরুতর অপরাধ। এই কর্তব্যে অবহেলা করা কখনও উচিত নয়। আর শুধু নিজে কর্তব্য পালন করলেই চলবে না। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে সবরকম দুর্লভ উদ্ভিদ্ এবং পশু-পাখির জীবন রক্ষার ব্যাপারে সতত সচেতন থাকেন, এবিষয়ে যত্নবান হন, এবং এটাকে তাদের এক নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। এর একমাত্র উপায় হ'ল, খুব অল্প বয়স থেকেই এ বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া, এবং জীবন-বিজ্ঞান সম্পর্কে সকলকে আরও বেশী ক'রে আগ্রহী ক'রে তোলা। সবাইকে একবাক্যে বলতে হবে—বন ও বন্য-প্রাণী রক্ষায় সকলেই আরও বেশী ক'রে উদ্যোগী হোন।

আশা করি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবেন, আর সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও এবিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন ক'রে তুলবেন। তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবেন উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে ভালবাসা ও মমত্ববোধ, যাতে বড় হয়ে তারাও তাদের কর্তব্য পালন করতে উদ্বুদ্ধ হয়।



একটি গাছ পোঁতার অর্থ, জীবন্ত কিছু একটা রেখে যাওয়া। কোনও মানুষ যদি তা করেন, আরও একটা জীবন যদি তিনি পিছনে রেখে যান, তাহলে তাঁর বেঁচে থাকা সার্থক।

[একটি রুশ প্রবাদ]

পরিশিষ্ট

[এক]

সম্পদ এবং মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ভূমিকা।

"চুয়াত্তরতম বিজ্ঞান কংগ্রেসের 'ফোকাল থিম' বা মূল আলোচ্য বিষয় ছিল: সম্পদ এবং মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ভূমিকা।† ...

অধ্যাপিকা শর্মা বিভিন্ন সম্পদ এবং তাদের চাহিদার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করেন জমি সংক্রান্ত সমস্যাবলীর কথা। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাঁর আশঙ্কা, বর্তমান শতাব্দীর শেষে পৃথিবীময় খাদ্য, বাস্তু, জ্বালানি এবং আবাসন যোগাতে খরচ পড়বে অনেক। তিনি বলেন, ভারতের কথাই ধরা যাক। ভারতে স্থলভাগের পরিমাণ সারা পৃথিবীর স্থল ভাগের ২·৪ শতাংশ মাত্র। অথচ সীমায়িত এই স্থলভাগে বাস করে পৃথিবীর ১৫ শতাংশ মানুষ। ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৮২-৮৩-র মধ্যে এদেশে কর্ষণ উপযোগী এবং স্থায়ী চাষের জমি বেড়েছে ৫৫ শতাংশ। তুলনায় তৃণভূমি এবং উৎকৃষ্ট পশুচারণ ক্ষেত্র কমেছে ৫ থেকে ৪ শতাংশ। এদেশে বেশীর ভাগ মানুষের বাস সমতল অধ্যুষিত কৃষি এলাকায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন এ ধরণের এলাকায় চাপ পড়েছে প্রচুর। ১৯৫১ সালে এদেশে মাথা পিছু কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ০·৩৩ হেক্টর; ১৯৭১-এ এই পরিমাণ এসে দাঁড়ায় মাথা পিছু ০·২৯ হেক্টরে। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে গিয়ে দাঁড়াবে ০·১৮ হেক্টরের মত। মাটির উপরের স্তরের ভূমিকা কৃষি উৎপাদনের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ ভারতে শুধু নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির কৃষিক্ষেত্র থেকেই প্রতি বছর ১৩২·৫ মিলিয়ন টনের মত এই মাটি অবক্ষয়ের মাধ্যমে নষ্ট হচ্ছে। বনাঞ্চলে অবক্ষয়ের পরিমাণ ১·৪ মিলিয়ন টন। অতিরিক্ত পশুচারণ, অতিরিক্ত সেচ, অবিজ্ঞান সম্মত চাষবাস, অতিরিক্ত চাষ প্রভৃতির দরুণ অনুর্বর হয়ে উঠেছে প্রচুর চাষের জমি। বাড়ছে পতিত জমির পরিমাণ। ভারতে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন, পৃথিবীর ১৩ শতাংশ মাত্র। পশুচারণ ক্ষেত্রের পরিমাণ তুলনায় খুবই কম—মাত্র ১৩ মিলিয়ন হেক্টর।

অধ্যাপিকা শর্মা বলেন, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে দরকার অতিরিক্ত ১০ মিলিয়ন হেক্টর চাষের জমি, জ্বালানি কাঠের জন্যে ৪০ মিলিয়ন হেক্টর এবং পশুখাদ্যের জন্যে ১০ মিলিয়ন হেক্টর। অবক্ষয় প্রাপ্ত জমির উদ্ধার, জমির অপচয় রোধ প্রভৃতির জন্যে সুষ্ঠু নীতি রচনা করা গেলে তবেই এই অতিরিক্ত চাহিদা মেটান সম্ভব।......

† অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট উদ্ভিদবিজ্ঞানী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতী অর্চনা শর্মা।

ভারতে বৃষ্টির পরিমাণ বছরে ১০৫ সেন্টিমিটারের মত। বৃষ্টি এবং ভূপৃষ্ঠের জল-সম্পদের দিক থেকে এ দেশের স্থান শীর্ষে। অথচ, অধ্যাপিকা শর্মা বলেন, 'মাথা পিছু গড় পানীয় জলের পরিমাণ খুবই কম। ৩১২১-টি শহরে বাস করছে ১০৯ মিলিয়ন মানুষ। যাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের জন্যে যথাযথ জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই। ভারতে ৩৯০০০-এর মত গ্রামে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই গড়ে ওঠেনি। এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং রাজস্থান শীর্ষে। ব্যতিক্রম একমাত্র তামিলনাড়ু। একমাত্র এই প্রদেশটিতেই প্রতিটি গ্রামে পাণীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে।' তিনি চাষ, গৃহস্থালী এবং কলকারখানার জন্যে সুসমন্বিত জল সরবরাহ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।"

—**সমরজিৎ কর।**

[**দেশ**—৩১ জানুয়ারি, ১৯৮৭]

[দুই]

পরিবেশ যখন আন্তর্জাতিক সমস্যা*

"গত দেড়শ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কলকারখানা বসেছে বিস্তর। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে যে দেশ যত বেশি আত্মনির্ভর সে দেশে কলকারখানার সম্প্রসারণ ঘটেছেও বেশী। শিল্পোৎপাদন থেকে শুরু করে যানবাহন এবং জীবনের মান উন্নত করতে দরকার শক্তি। শক্তি বলতে মুখ্যত তাপ এবং বিদ্যুৎ। এতকাল জীবাশ্ম অর্থাৎ কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম পুড়িয়েই শক্তির চাহিদা মেটানো হয়েছে। আর তা মেটাতে গিয়ে বাতাসে ঢেলে দেওয়া হয়েছে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, গন্ধকের অক্সাইড থেকে শুরু করে নানা রকম গ্যাস। বায়ুপ্রবাহ রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ফলে ওই সব গ্যাসীয় উপাদান ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। গত একশ বছরে নদী এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে তৈরি হয়েছে প্রচুর বন্দর এবং শিল্পাঞ্চল। এই সব বন্দর এবং শিল্পাঞ্চল থেকে জ্বালানি তেল, রাসায়নিক জঞ্জাল বিমুক্ত হয়ে দূষিত করে নদী এবং সমুদ্রের জল। সমুদ্রের গভীর ভূস্তর থেকে আহরণ করা হচ্ছে খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। বড় বড় জাহাজে বহণ করা হচ্ছে তেল। এই তেল বহনের সময় চুঁইয়ে অথবা পরিবহনের ত্রুটির দরুণ সমুদ্রের জলে পড়ে। পড়ে কলুষিত করে সমুদ্রের জল। আটলান্টিক মহাসাগর

* সমরজিৎ কর – দেশ (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৫) থেকে সঙ্কলিত।

এবং উত্তর সাগরের বহু অঞ্চলে এর জন্যে মাছের ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। যে মাছের উপর নির্ভর করে বহু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। এটাও একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা।

ক্রমবর্ধমান জনতার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে চাষের জমি সম্প্রসারিত হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই। এই সম্প্রসারণের দরুণ বহু অঞ্চলের অরণ্য এখন নির্মূল। গাছপালা কমে এলে জমির মাটি শুকিয়ে যায়। হয় মরুভূমির মত উষর। অরণ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে আবহাওয়ার। গত কয়েক দশক হল আমাজন অধ্যুষিত এলাকায় বন নির্মূল করে চাষের জমি বাড়ানো হচ্ছে, পত্তন করা হচ্ছে নতুন শহর। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এইভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে শুধু দক্ষিণ আমেরিকাই নয়, সারা পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলে আসবে পরিবর্তন। সবুজ প্রান্তর কোথাও রূপান্তরিত হবে মরুভূমিতে। বর্ষণ অধ্যুষিত অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে নামবে খরা। এক দেশের কর্মফলে ভাগীদার হবে বহুদেশের মানুষ।

অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ অথবা পরিবেশের ভারসাম্যতা বহু ক্ষেত্রেই এখন আন্তর্জাতিক সমস্যা। পৃথিবীর কোন অঞ্চল বিশেষের নয়, সব মানুষেরই সমস্যা। এবং যেহেতু সব মানুষের সমস্যা, এই সমস্যার সমাধান বা নিয়ন্ত্রণের জন্যে সমস্ত দেশেরই সমবেতভাবে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হবে : **এক,** বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে সেটা খতিয়ে দেখা। **দুই,** বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সে সব সমস্যার মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে তার উপায় উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ। দুটি কাজেই দরকার বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রয়োগের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কর্মসূচী প্রণয়ন। এ ধরণের কাজ যাতে সুসংহত ভাবে করা যায় তার জন্য আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা একটি প্রকল্পও রচনা করেছেন। প্রকল্পটির নাম 'গ্লোবাল এনভায়রনমেণ্টাল মনিটারিং সিস্টেম' বা সংক্ষেপে 'জেমস' (GEMS)। এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে পরিবেশগত সমস্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন মত বিভিন্ন দেশে পরিবেশন করা। এতে লাভ হয়েছে অনেক। বহু দেশ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অক্ষমতার দরুণ পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে সক্ষম নয়। 'জেমস' তাদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করছে। আবার এমনও দেখা যায়, কোন একটি দেশের বৈজ্ঞানিক পারঙ্গমতা যথেষ্ট, কিন্তু যে সমস্যাটির উপর অনুসন্ধান দরকার সেই সমস্যাটি হয়ত রয়েছে অনুন্নত কোন দেশে। সেক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি যাতে অনুন্নত দেশে গিয়ে সেখানকার সমস্যা সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে সে ব্যাপারেও মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে 'জেমস'।"

[তিন]

গঙ্গার উন্নয়নে জাতীয় প্রকল্প ও বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনা*

ডঃ তারক মোহন দাস

“খুব বেশীদিন আগেকার কথা নয়, পুরাণ কলকাতার অধিকাংশ মানুষ গঙ্গার জলই পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করত। গঙ্গার ধারে বসবাসকারী ধনী ব্যক্তিরা গঙ্গা থেকে নহর (সরু খাল) কেটে নিজেদের বাড়ীতে গঙ্গাজল আনবার পাকাপোক্ত ব্যব্যস্থা করত, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী তার মধ্যে অন্যতম। আমি ছোটবেলায় দেখেছি বাড়ীতে বিধবারা গঙ্গাজল ছাড়া অন্য কোন জল পান করত না। এখন আর করে না। এর জন্য ভগবানের ওপর আস্থা হ্রাসের থেকে গঙ্গাজলের দূষণ বৃদ্ধিই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

গঙ্গানদীর দুই তীরে ৪৮টি প্রথম শ্রেণীর শহর, ৬৬টি দ্বিতীয় শ্রেণীর শহর গড়ে উঠেছে। এই ১১৪টি শহরের কোনটিতেই ড্রেনের জল অথবা শিল্পে ব্যবহৃত জল শোধণের কোন আধুনিক ব্যবস্থা নেই। এইসব অঞ্চল থেকে অতি মারাত্মক দূষিত পদার্থ ও ড্রেনের ময়লা, মল, মূত্র অতি বিপুল পরিমাণে প্রতিদিন গঙ্গা নদীতে এসে মিশছে। এই সব অঞ্চলে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ আবর্জনার পরিমাণও ভয়াবহ হারে বাড়ছে এবং গঙ্গাজলের মানও দ্রুতহারে নীচে নামছে। বাস্তবিক পক্ষে গঙ্গা আজ ড্রেনের বিকল্প হিসাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। একমাত্র দিল্লী শহর থেকেই যমুনা নদীতে প্রতিদিন কুড়ি কোটি লিটার কাঁচা নর্দমার জল, দু-কোটি লিটার কলকারখানার মারাত্মক দূষিত পদার্থ, তার মধ্যে পাঁচ লিটার DDT অন্যতম, এসে মিশছে। কলকাতা শহরের আশেপাশে হুগলী নদীর দুই তীরে ১৫০টি বড় ধরণের ফ্যাক্টরী আছে—তার মধ্যে ৮৭টি পাটকল, ১২টি কাপড়ের কল, ৭টি ট্যানারী, পাঁচটি কাগজের কল, চারটি মদচোলাইয়ের কারখানা ; এছাড়া রেয়ন, এসিড ও নানারকম রাসায়নিক পদার্থ তৈরীর কারখানাও আছে অনেকগুলি। এইসব কলকারখানা থেকে, মোট ৩৬১টি ছোট বড় খাল বয়ে, অতি বিপুল পরিমাণ আবর্জনা প্রতিদিন গঙ্গায় এসে মিশছে।

গঙ্গার স্বয়ংক্রিয় পরিশোধন ব্যবস্থা—প্রত্যেক নদীরই এক স্বয়ংক্রিয় পরিশোধন ব্যবস্থা আছে। গঙ্গার এই স্বয়ংক্রিয় পরিশোধন ব্যবস্থা মনে করা হয় সর্বোত্তম। এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা মূলতঃ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জলে দূষিত পদার্থের dilution ও removal-এর ওপর নির্ভরশীল। হিমালয়ের কোলে গঙ্গার বরফগলা জলে দূষিত পদার্থের পরিমাণ সামান্যই থাকে। সেই জল তাই পবিত্র। এই পরিষ্কার

* **Beta** [June, 1985—Special Issue on environment] থেকে সঙ্কলিত।

জল বিভিন্ন জনপদ থেকে কলুষরাশি ধুয়ে নিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশছে, এই কলুষরাশির পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট মাত্রা না ছাড়িয়ে যায় তাহলে গঙ্গাজলের নির্দিষ্ট মানের কোন অবনতি ঘটে না। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, এই মাত্রা আজ বহুল পরিমাণে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে D. D. T, ডেলড্রিন, B. H. C., আর্সেনিক, ক্যাডসিয়াম প্রভৃতি অতি বিষাক্ত পদার্থ গঙ্গাজলে এসে মিশছে। গঙ্গাজল যেভাবে ফিলটার করা হয় তাতে এই পদার্থগুলি আলাদা করা সম্ভব নয়। সুতরাং কলের জলের সাথে এই বিষাক্ত পদার্থগুলি আমাদের শরীরের মধ্যে এবং খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যেও প্রবেশ করছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভূমিক্ষয়জাত পলিমাটি যা প্রচুর পরিমাণে নদীবক্ষে জমছে। গঙ্গানদীর দুইপাশের অববাহিকায় ও হিমালয়ের বুকে যে গভীর অরণ্য ছিল তা আজ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। তার ফলে প্রতি বছর ভূমিক্ষয়জাত মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীর বুকে এসে জমছে অস্বাভাবিক পরিমাণে, নদীর বুকে চড়া জমাচ্ছে গ্রীষ্মকালে, বর্ষায় সৃষ্টি হচ্ছে বন্যার। গঙ্গা কালক্রমে এক মরা নদীতে পরিণত হতে চলেছে।

গঙ্গার উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনা—গঙ্গার এই অবস্থা নিয়ে কিন্তু বহুদিন আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন। ১৯৬০ সালেই গঙ্গার দূষণ প্রতিরোধের জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু বাস্তবে কাজ হয়েছে সামান্যই। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক ডঃ এম. এস. স্বামীনাথন, যিনি সবুজ বিপ্লবের অন্যতম হোতা ছিলেন, প্ল্যানিং কমিশনে আসবার পর তারই আনুকূল্যে Sky to ocean পরিকল্পনাটি গতিশীলতা লাভ করে এবং এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া পর্যন্ত গঙ্গানদীর অংশটি একটি জাতীয় জলপথ হিসাবে উন্নত করবার চেষ্টা শুরু হয়। গঙ্গানদীর ধারে ধারে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাদের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঙ্গার সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি বিরাট পরিকল্পনার রূপ দেন। এটিই বর্তমানে Integrated Ecodevelopment Project on River Ganga Basin নামে খ্যাত। এই প্রোজেক্টে গঙ্গানদীকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করে তেরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। উত্তর ভাগে আছে গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুকুল কাংগেরী বিশ্ববিদ্যালয় ও রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয়। মধ্যভাগে আছে আই. আই. টি. কানপুর, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, রাজেন্দ্রপ্রসাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিহার বিশ্ববিদ্যালয়। দক্ষিণভাগে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে গঙ্গার নির্দিষ্ট অঞ্চল বেছে নিয়ে নির্দিষ্ট কতকগুলি সমস্যা সমাধানের ভার দেওয়া হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভার দেওয়া হয়েছে বালী থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত এই হুগলী নদীর অংশে যে রাসায়নিক সার (ফস্‌ফরাস)

ও কীটনাশক মারাত্মক দূষিত পদার্থ এসে মিলছে, তার পরিমাপ ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ। সেই সঙ্গে গঙ্গা নদীতে যে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ্ তাদের সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করা, তাদের ব্যাপক উন্নয়নের উপায় নির্ধারণ করা এবং এই নদীর ওপর নির্ভরশীল জনজীবনের সমাজ ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি বোঝা ও তার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করা। গঙ্গাকে যারা রক্ষা করবে তারা সাধারণ মানুষ, সুতরাং এই বিষয়ে তাদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সাধারণ মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করবার জন্য আর একটি শাখা প্রকল্প 'পরিবেশ সচেতনতা' স্বতন্ত্রভাবে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছরই পরিবেশ সম্পর্কে প্রচুর প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত একটি পুস্তক 'ENVIRONS' প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অত্যন্ত উন্নত এর ছাপা ও বাঁধাই এবং পরিবেশ নিয়ে যারা ভাবনা চিন্তা করছেন তাদের কাজের সুবিধার জন্য এই পুস্তকটি বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

[চার]

ভূপাল : এক বছর পরে*

"ঠিক এক বছর আগে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালের জনসাধারণের কাছে এই দিনটি বহিয়া আনিয়াছিল মৃত্যুর মহামারী। ইউনিয়ান কার্বাইডের কীটনাশক প্রকল্পে সংরক্ষিত বিষাক্ত গ্যাস ছিদ্রপথে বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া নিমেষে শ্বাসরুদ্ধ করিয়াছিল হাজার হাজার ঘুমন্ত মানুষকে। মধ্যরাত্রির সেই বিভীষিকা সরকারী খতিয়ানেই ১৭৫৫ টি তাজা প্রাণ নষ্ট করিয়া দেয়, আহত বা পঙ্গু করিয়া ফেলে শহরের দুই লক্ষাধিক মানুষকে। বেসরকারি হিসাবে মৃত্যুর খতিয়ান, বলা বাহুল্য, অনেক বেশি। তবে শুধু মারণগ্যাসে নিহত বা ক্ষতিগ্রস্তদের খতিয়ান লইয়াই নয়, ওই বিপর্যয়ের এক বছর পরেও, সংশ্লিষ্ট কোনও বিষয়েই সঠিক কোনও তথ্য এখনও জানা যায় নাই। এমন কি মারণগ্যাসটি নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করার কাজও এখনও অসম্পূর্ণ। এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত, এক এক বিশেষজ্ঞের এক এক রায়, ইউনিয়ান কার্বাইড কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকারও স্বতন্ত্র ধারণা পোষণ করেন। বিষাক্ত গ্যাসটি কেমন করিয়া বাহিরের বায়ুমণ্ডলে মিশিতে পারিল, তাহাও এখনও ফয়সলা হয় নাই। ভারত সরকার বলিতেছেন, কীটনাশক প্রকল্পের নকশা ও তাহার রূপায়ণগত ত্রুটি এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা

* সম্পাদকীয়—আনন্দবাজার পত্রিকা (৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫)।

ব্যবস্থার অভাবের কথা। আর কার্বাইড কর্তৃপক্ষ নিজের সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া শিখ সন্ত্রাসবাদীদের অন্তর্ঘাতের গল্প ফাঁদিতেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে কার্বাইড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হইয়াছে। ভারত যেমন মামলা করিয়াছেন, তেমনই ক্ষতিগ্রস্তদের তরফে পেশাদার মার্কিন আইনজীবীরাও কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিয়াছেন। মামলা ক্ষতিপূরণের। হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের। কবে মামলার নিষ্পত্তি হইবে এবং হইলে এই বিপুল অর্থের কতটুকু ভগ্নাংশ শেষপর্যন্ত প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে পৌছাইবে, সে প্রশ্ন না হয় বাদই দেওয়া গেল। আপাতত এইটুকু জানা গিয়াছে যে, সহজে মামলার নিষ্পত্তি হইবার নয়, এবং কার্বাইড কর্তৃপক্ষ আমেরিকার ফেডারেল আদালতে মামলা স্থানান্তরিত করার চেষ্টায় আছেন, কেননা তাহাতে দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নাকি অনেক কমিয়া যাইবে। আবার এমন কথাও শোনা যাইতেছে যে, ভারত সরকার নাকি আদালতের বাহিরে কোম্পানির সঙ্গে আপসে মামলা মিটাইয়া ফেলার চেষ্টায় আছেন। সত্য কী, কে জানে!

গ্যাস-বিপর্যয়ে যাঁহারা স্বজন-পরিবার হারাইয়াছেন, কিংবা নিজেরা আহত পঙ্গু ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, আশা করা গিয়াছিল, তাঁহাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের প্রশ্নটিই সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার পাইবে। শুধু নিহতদের পরিবারবর্গের হাতে কিছু টাকা গুঁজিয়া দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যাঁহারা এই ধরণের বিপর্যয়ে জীবিত থাকেন, মারণগ্যাসের বিষক্রিয়া তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশধরদের শরীরে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার জন্ম দেয়। গত এক বছরে গ্যাসে আক্রান্ত প্রসূতিরা সাতশ'র বেশি মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছেন। যে জাতকরা জীবিত, তাহাদেরও অধিকাংশই দুরারোগ্য নানা ব্যাধির শিকার। অসংখ্য বয়স্ক কর্মঠ পুরুষ কাজ করার ক্ষমতা হারাইয়া অথর্বে পরিণত। তাঁহাদের নির্ভরশীল পরিবারগুলি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে। এইসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ত্রাণের জন্য সরকার কিছুই করেন নাই, এমন নহে। যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য কিছু ভাগ্যবানের হাতে আসিয়াছে। সুবিধাজনক শর্তে ব্যাংক হইতে ঋণ লাভের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। বিকল্প কর্মসংস্থানের নানা প্রকল্পও রূপায়ণের পথে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, ভূপালের দুর্গতদের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমলা-তান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতি ত্রাণ বিতরণের প্রক্রিয়াকে পদে পদে ব্যাহত করিয়াছে। ফলে ত্রাণবাবদ বরাদ্দ কেন্দ্রীয় অর্থের দশ শতাংশও নাকি এখনও বণ্টন করিয়া ওঠা সম্ভব হয় নাই। আবার প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত নহে, এমন কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত সাজিয়া বণ্টিত ত্রাণ সাহায্য হস্তগত করিয়াছে। বিপর্যয়ের এক বছর পরেও ভূপালে তাই এখনও দুর্গতদের হাহাকার, ত্রাণের জন্য প্রতীক্ষার দীর্ঘ লাইন, সরকারি অফিসারদের দুয়ারে ব্যাকুল ধর্ণা।

দুর্গত জনসাধারণের প্রতি নিজের কর্তব্যে যে সরকার অবহেলা করিতেছেন, তাহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ—গ্যাস বিপর্যয়ের তদন্তের জন্য গঠিত এন কে সিংহ কমিশনের দুরবস্থা। সি এস আই আর-এর বিজ্ঞানীরা যে তদন্ত করিয়াছিলেন তাহার ফলও এখনও অপ্রকাশিত। কথা ছিল সিংহ কমিশন তদন্ত শেষ করিবে তিন মাসের মধ্যে; বছর ঘুরিয়া গেলেও তাহার কাজে বিশেষ অগ্রগতি হয় নাই। কারণ, কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা। শুধু ইউনিয়ন কার্বাইড কর্তৃপক্ষের নহে, মধ্যপ্রদেশ সরকারেরও। বারংবার তাড়া লাগাইয়াও কমিশন রাজ্য সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য পান নাই। কার্বাইড কর্তৃপক্ষ যে কমিশনের তলব এড়াইয়া চলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কী? বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান এবং দুর্গতদের আশু ত্রাণের ব্যবস্থা—উভয়ক্ষেত্রেই সরকারকে বর্তমান দীর্ঘসূত্রতা বর্জন করিয়া অনেক বেশি তৎপর হইতে হইবে। সরকারই ইউনিয়ান কার্বাইডকে ভূপালে ওই অভিশপ্ত প্রকল্পটি নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। সুতরাং সেই প্রকল্প হইতে নির্গত মারণগ্যাসে আক্রান্ত জনসাধারণের প্রতি শেষ বিচারে সরকারের দায়িত্বই সমধিক। সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা অমার্জনীয় অপরাধের সামিল। তাছাড়া ভূপালের বিপর্যয় দেখাইয়া দিয়াছে, ইউনিয়ান কার্বাইডের মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলি কীভাবে সমস্ত অবশ্য-পালনীয় আচরণবিধি লঙ্ঘন করিয়া পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি লইয়া এদেশে ব্যবসা চালাইতেছে, বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ। এই অপরাধে কিন্তু শুধু বিদেশী কোম্পানি নহে. অনেক স্বদেশী কোম্পানিও সমান দায়ী। দেশের প্রধান শহরগুলির পরিবেশ আজ প্রধানত তাহাদের উদাসীনতার ফলেই বিষাক্ত। এই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ দূষণের সম্ভাবনা রোধ করিতে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। ভূপালেই হোক এদেশের গ্যাস বিপর্যয়ের সর্বশেষ ঘটনা। মৃত্যুর এমন মর্মান্তিক বিভীষিকা যেন আর কখনও পুনরাবৃত্ত না হয়। সেটাই হইবে ভূপালের বিপর্যয়ে নিহত মানুষদের প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।”

[পাঁচ]

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরাজি*

কনকলাল শীল

“ইদানিং একটা জিনিস দেখে যা ভাল লাগছে ও মনের মধ্যে একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠছে তা হলো জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সর্বত্র গাছ লাগানোর চেতনা। তাই

* [বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্র—আনন্দবাজার পত্রিকা ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩ (৫ জুন, ১৯৮৬)]

দেখা যাচ্ছে জনগণ যেমন শহরের ফুটপাতের মধ্যে নিজেরা গাছ লাগাচ্ছেন এবং সরকারকে গাছ লাগাতে ও তার রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করছেন তেমনি সেই উৎসাহ গ্রামে গঞ্জেও পরিলক্ষিত হয়। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামাজিক বন সৃজন প্রকল্পে রাস্তার দুধারে, রেল লাইন ও বাঁধের ধারে যে গাছ লাগানো হয়েছে সেই গাছও দ্রুত বেড়ে উঠছে। জনগণ এগিয়ে এসেছেন ঐসব গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে—বিশেষ করে ছোটবেলায় গরু, ছাগলের আক্রমণে অপমৃত্যুর হাত থেকে। কারণ জনগণ এটা বুঝেছেন পরিবেশ রক্ষায় গাছের কোন বিকল্প নেই।

আজ শহরে বিশেষ করে বাস, মিনিবাস, ট্রাক প্রভৃতির কালো ধোঁয়ায় পরিবেশ ক্রমাগত বিষিয়ে উঠছে। এছাড়া শহরের যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা কারখানার ধোঁয়াও পরিবেশকে আরও দূষিত করে তুলছে। তার ফলে আবহ-পরিমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনক্সাইড প্রভৃতির মত দূষিত গ্যাস বেড়ে যাচ্ছে ও বিশুদ্ধ অক্সিজেন যা আমাদের বুক ভরে নিতে হয় তা কমে যাচ্ছে। পরিণামে শহরে বিভিন্ন শ্বাস রোগ যথা—হাঁপানি, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি বেড়ে যাচ্ছে। অনেকের মতে পরিবেশ দূষণের জন্য দুরারোগ্য ক্যানসার বেড়ে যাচ্ছে। গরম ও বর্ষাকালে পরিবেশ দূষণের প্রতিক্রিয়া হাতে-নাতে বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু শীতকালে সেটা খুবই অনুভূত। তখন শহরে সন্ধ্যার দিকে গাড়ীর ধোঁয়া, কারখানার ধোঁয়া ও বিভিন্ন বসতির জ্বালানো উনুনের ধোঁয়া উপরের বায়ুমণ্ডলে আস্তে আস্তে মেশে। ফলে চারদিকে একটা ধোঁয়ার চাদর তৈরি হয়। এবং আপনারা লক্ষ করবেন সেই সময় চোখ জ্বালা করবে ও নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে। এ সবই পরিবেশ দূষণের কু-ফল।

আরও একটা সুদূর প্রসারী ও ভয়াবহ কু-ফল হতে পারে যা ভাবতে গেলেও আপনারা আঁতকে উঠবেন, তা হলো বিশ্বব্যাপী ক্রমাগত নির্বিচারে বৃক্ষ ছেদনের ফলে আবহ-পরিমণ্ডলে আগের তুলনায় কিছুটা উত্তাপ বেড়ে যাচ্ছে। আপনারা হয়তো ভাবছেন আবহ-পরিমণ্ডলে কিছুটা উত্তাপ মানে আধ ডিগ্রি উত্তাপের হেরফের হলে এমন আর কি হয়েছে—কি বা ক্ষতি হবে? সামান্য যা একটু গরম বেশি লাগবে। কিন্তু এর পরিণাম ভয়াবহ—আর তা হলো পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে যে বরফ জমে আছে তা উপরোক্ত উত্তাপের ধাক্কায় গলতে শুরু করবে। আর ঐ অতিরিক্ত জলরাশি পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে গিয়ে পড়বে—পরিণামে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির মত ঘটনা ঘটতে পারে। এবং মানবজাতির অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠবে।

ক্রমাগত গাছ কাটার ফলে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ—আফ্রিকার ইথিওপিয়া। সেখানে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে বহুলোক মারা গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলি, অনেকের মনে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে, আর তা হলো বন উন্নয়ন নিগম তার আয় বাড়ানোর জন্য নির্বিচারে গাছ কাটছে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তার কারণ, বন নিগম যে যে গাছ কাটে তা খুবই পরিণত ও বৃদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ঐ গাছ কেটে ফেলাই দরকার। আর সেটা না হলে যখন ঐ গাছ মরে যাবে তখন ঐ এলাকায় ভূমিক্ষয় প্রভৃতি হতে পারে। তাই নিগম যে গাছ কাটে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য এবং সরকারী প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী তা করা হয়ে থাকে।

এখন বন নিগম যেখানে গাছ কাটে বছরে ৪৫০ হেক্টর মত জমিতে সেখানে নতুন বনসৃজন করে ১১৯০ হেক্টর জমিতে। এই যে আড়াই গুণের উপর জমিতে বনসৃজন করা হচ্ছে, তার কারণ, বন নিগম প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশ রক্ষায় অত্যন্ত সচেতন। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় বনমন্ত্রী ও বন নিগমের চেয়ারম্যান শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ রায় মহাশয়ও খুব তৎপর। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বন নিগমকে বেশি করে নতুন বন সৃজন করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বন নিগম এমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বৃক্ষ আহরণ করে থাকেন সেখানে ভূমিক্ষয় জনিত পরিবেশ দূষণ এতটুকু হয় না। প্রথমত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে গাছ কাটা হয় তাতে বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটিত করতে হয় না। ফলে গাছের মূল মাটিতে থেকে গিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকে। ইতিমধ্যে বর্ষাকালে ঐ জায়গায় নতুন বন সৃজন হয়ে যায়। দু-তিন বছরের মধ্যে ঐ অঞ্চলের গাছগুলি বড় হয়ে ওঠে। তখন মাটির ভিতর লুকিয়ে থাকা পুরানো গাছের শিকড়গুলি আস্তে আস্তে পচে গিয়ে জমিতে সারের কাজ করে। ফলে পরিবেশের উপর এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। এই যা কিছুদিন ঐ জায়গাটাকে দূর থেকে ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হয়। কারণ বড় গাছগুলি নেই বলে। তবে তিন-চার বছর পরে জায়গাটি যখন নতুন ছোট ছোট গাছে ভরে উঠবে তখন দূর থেকে দেখলে তার নয়ন মনোহর সবুজ আভায় দুচোখ জুড়িয়ে যায়।

বন নিগম এইভাবে যে কাষ্ঠ সম্পদ আহরণ করে থাকে তা থেকে দরজা, জানালা ও অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরি করে। তার আগে ঐ কাঠ বন নিগমের নিজস্ব করাত কলে চেরাই করা হয়। আর ঐ চেরাই কাঠ থেকে জলীয় অংশ বের করার জন্য বন নিগম উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সৌরশক্তি চালিত সিজনিং ঘর বা কিলন্ তৈরী করেছে। পূর্বে এইসব কাজে বয়লার ব্যবহার করা হত। এই সৌরশক্তি চালিত সিজনিং কিলন্ও পরিবেশ দূষণ রোধে স্থানীয়ভাবে অনেকটা সহায়তা করছে।

দার্জিলিং জেলায় কোথাও গাছ কাটা হচ্ছে দেখলেই সাধারণ লোক মনে করেন বোধহয় বন নিগম তা করছে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ দার্জিলিং

শহরাঞ্চলে বন নিগম গাছ কাটে না। রাস্তার ধারে ধারে মাঝে মাঝে দেখা যায় বেশ কয়েকটি বড় গাছ বিক্ষিপ্তভাবে কাটা হয়ে গেছে। এসব কোনটাই বন নিগমের কাজ নয়। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর প্ররোচনায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে কিছু অভাবি লোক এ কাজ করে থাকতে পারে। এই অবৈধ উপায়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

পাহাড়ী এলাকায় ভূমিক্ষয় রোধে বন নিগম নানা জায়গায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গাছ লাগানো শুরু করেছে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে বন নিগম পরিবেশ দূষণ থেকে দেশকে বাঁচাতে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত তৎপর। সেজন্য পাহাড়ী এলাকায় মাত্র ২০ শতাংশ কনিফেরাস জাতের ও বাকী ৮০ শতাংশ চওড়া পাতা বা ব্রডলিফ প্রজাতির গাছ লাগানো হচ্ছে। বায়স্‌ফিয়ার রিজার্ভ গড়ে তোলার জন্য অরণ্যের কিছু কিছু এলাকার গাছ যদিও বৃদ্ধ ও পরিণত তবুও কাটা হচ্ছে না।"

[ছয়]

পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্য*

কল্যাণ চক্রবর্তী

"সমগ্র রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তন ৮৮·৭৫২ বর্গ কিলোমিটার ও তার মধ্যে সরকারী বনভূমির আয়তন হচ্ছে ১১·৮৭৯ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ বনভূমির আয়তন ভৌগোলিক আয়তনের মাত্র ১৩·৪ শতাংশ। ......বনাঞ্চলের বৈসাদৃশ্য বনের বিচিত্রতা এনেছে ও তার সঙ্গে এনেছে বন্য প্রাণীর বৈচিত্র্যেরও বৈসাদৃশ্য।

এ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ল্যাটারাইট বনভূমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায়। ......পশ্চিমবঙ্গের মোট চোদ্দটি অভয়ারণ্যের মধ্যে কেবলমাত্র দুটি রয়েছে এ অঞ্চলে—একটি অভয়ারণ্য হচ্ছে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত রমনা বাগান ও অন্যটি বীরভূম জেলার বল্লভপুর অভয়ারণ্য। রমনা বাগান অভয়ারণ্যটি আয়তনে খুবই ছোট, মাত্র ১৪ হেক্টর। এ অভয়ারণ্যটিতে রয়েছে ১৫টি চিতল হরিণ ও ১০টি বার্কিং ডিয়ার। ......আনুমানিক ২০২ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে বল্লভপুর অভয়ারণ্যটি তিনটি ভাগে আপাতত বিভক্ত হয়ে আছে।

১৯৫৪/৫৫ সালের শাল, আকাশমনি, শিশু, কাজুবাদাম প্রভৃতি কৃত্রিম বনাঞ্চলকে ঘিরে রয়েছে এ অভয়ারণ্যের প্রথম অংশটি (৪০ হেক্টর) যেটি এখন চিতল হরিণ ও

* [১৮ আগস্ট (১৯৮৫) তারিখের রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সঙ্কলিত।]

কৃষ্ণসারের আবাসস্থল। দ্বিতীয় অংশটিতে চিতল হরিণ ও কৃষ্ণসারের খাদ্য উপযোগী বিভিন্ন কৃত্রিম বনাঞ্চল তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে—যথা বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, বট, পিয়াশাল, সুবাবুল প্রভৃতি। বিভিন্ন পাখির একটি কৃত্রিম পক্ষীনিবাস তৈরি করা হয়েছে এখনে—যথা ময়ূর, সারস, টিয়া, লালমুনিয়া, বদরিকা প্রভৃতি পাখির।

বল্লভপুর অভয়ারণ্যে তিনটি সুন্দর জলাশয় রয়েছে—যা শীতের আবির্ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার স্থানীয় ও যাযাবর পাখির আবাসস্থল হয়ে উঠেছে। ……১৯৬৮ সালে ৪টি পুরুষ ও ৪টি স্ত্রী মোট ৮টি চিতল হরিণ ও ১৯৬৭ সালের ৪টি পুরুষ ও ৭টি স্ত্রী অর্থাৎ মোট ১১টি কৃষ্ণসার বা ১৯টি প্রাণী (চিতল ও কৃষ্ণসার একত্রে) নিয়ে যে মৃগদাবটি শুরু হয়েছিল সেখানে আজ প্রায় দেড়শত চিতল হরিণ ও কৃষ্ণসার প্রাণীর সমাবেশ ঘটেছে প্রাকৃতিক নিয়মেই। অবশ্য এরই মধ্যে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩ কৃষ্ণসার (৫টি পুরুষ, ৭টি স্ত্রী ও ১টি বাচ্চা) ও ১১টি চিতল (২টি পুরুষ ও ৯টি স্ত্রী) অন্যত্র পাঠানো হয়েছিল। কৃষ্ণসার প্রাণীটি বন্যপ্রাণীর বিরল শ্রেণীভুক্ত হয়েও এ বল্লভপুর অভয়ারণ্যে যে সুন্দরভাবে বেড়ে চলেছে সেটা আজ প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে একটা আনন্দের খবর।”

“গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে অবশ্য কৃষির পক্ষে উপযুক্ত জমি বেশি থাকায় বনাঞ্চলের পরিমাণ অত্যন্ত কম। এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে তিনটি অভয়ারণ্য—নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী ও ২৪ পরগণা জেলায় পারমাদন অভয়ারণ্য ও নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্য। পূর্ব রেলওয়ের বেথুয়াডহরী রেলস্টেশন থেকে মাত্র দু কিলোমিটার দূরে ৫৪ হেক্টর বনভূমি নিয়ে গড়ে উঠেছে বেথুয়াডহরী অভয়ারণ্য। ১৯৮০ সালে সরকারীভাবে অভয়ারণ্য হিসেবে এর স্বীকৃতি। ১৯৮৪ সালের সুমারী অনুযায়ী এ অভয়ারণ্যে রয়েছে ২৪০টি চিতল হরিণ, ৪টি বার্কিং ডিয়ার ও ৩টি সম্বর। ……‘পারমাদন’ অভয়ারণ্যটির আয়তন হচ্ছে প্রায় ৬৫ হেক্টর। ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁও থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে এ অভয়ারণ্যটি অবস্থিত। এ অভয়ারণ্যে ১২৪টি চিতল হরিণ (১৯৮৪ সালের সুমারী অনুযায়ী) ছাড়া রয়েছে মাউস ডিয়ার ও বিভিন্নপ্রকার পাখি। ……১৯৮০ সালে অভয়ারণ্য হিসেবে সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে। এ অঞ্চলের অপর অভয়ারণ্যটির নাম নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্য। মাত্র ১০ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে এ অভয়ারণ্যটি সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে ১৯৮২ সালে। পূর্ব রেলপথের সোনারপুর রেল স্টেশন থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থিতি।”

“এবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অভয়ারণ্যের প্রসঙ্গে আসা যাক। এ অভয়ারণ্যগুলির মধ্য উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপরামারি

ও দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত মহানন্দা, সেঞ্চল প্রভৃতি। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যটির আয়তন প্রায় ১১৬ বর্গ কিলোমিটার—মাদারিহাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ অভয়ারণ্যটি একশৃঙ্গী গণ্ডারের জন্য খ্যাত। তাছাড়াও এখানে রয়েছে বাইসন, হাতি, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, হগ ডিয়ার, বাঘ, লেপার্ড, বন্যবরাহ, বানর প্রভৃতি। ……আয়তনে ছোট হলেও গরুমারা অভয়ারণ্যও পর্যটকদের কাছে কম আকর্ষণীয় নয়। জলপাইগুড়ি জেলায় এ অভয়ারণ্যটির আয়তন প্রায় নয় বর্গ কিলোমিটার। এ অভয়ারণ্যটি চাল্‌সা রেল স্টেশন থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ও চাল্‌সা শিলিগুড়ি রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে। বিভিন্ন ধরণের বৃক্ষ প্রজাতির ও বন্যপ্রাণীর সমাবেশে এ অভয়ারণ্যটি পর্যটকদের কাছে এক অতি মনোরম ও আকর্ষণীয় বস্তু। ……জলপাইগুড়ি জেলার তৃতীয় অভয়ারণ্যের নাম হচ্ছে চাপরামারি অভয়ারণ্য। এর আয়তন প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার মত ও চাল্‌সা রেল স্টেশন থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থিতি। হাতি, বাঘ, বাইসন, সম্বর, বন্যবরাহ ও বার্কিং ডিয়ার এ অভয়ারণ্যটির উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী।

দার্জিলিং জিলাতে রয়েছে দুটি অভয়ারণ্য। এগুলি হচ্ছে মহানন্দা ও সেঞ্চল। মহানন্দা অভয়ারণ্যটির আয়তন প্রায় ১২৭ বর্গ কিলোমিটার। বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি রেল স্টেশনগুলি থেকে যথাক্রমে ২৪ কিলোমিটার ও ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ অভয়ারণ্যটিতে বাঘ, হাতি, বাইসন, সম্বর, হগ ডিয়ার, বন্যবরাহ ও বিভিন্ন প্রকার বিহঙ্গকুল পর্যটকদের কাছে সত্যিই দর্শণীয়। দার্জিলিং জেলায় অপর অভয়ারণ্যটি হচ্ছে সেঞ্চল অভয়ারণ্য। ঘুম রেল স্টেশন থেকে ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ও দার্জিলিং শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে এ অভয়ারণ্যটির অবস্থিতি। এপ্রিল, মে, অক্টোবর হচ্ছে এ অভয়ারণ্য পরিদর্শনের উপযুক্ত সময়।"

"এ সকল ব্যতিরেকে পশ্চিমবঙ্গে যে সকল অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে সেগুলি সুন্দরবনে অবস্থিত। যথা সজনেখালি, হলিডে ও লোথিয়ান অভয়ারণ্য। সজনেখালি অভয়ারণ্যটির আয়তন প্রায় ৩৬২ বর্গ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে রেলপথে ক্যানিং হয়ে মোটর লঞ্চে চড়ে এ অভয়ারণ্যটিতে পৌছতে হয়। ক্যানিং থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার জলপথে, প্রায় ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। জুন, জুলাই মাস থেকে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-এ তিন চার মাসে শামুকখোল, পানকৌড়ি ও সাদা বকের আগমনে ও কলকাকলিতে পরিপূর্ণ এ অভয়ারণ্য তখন তীর্থের রূপ গ্রহণ করে। অন্য দুটি অভয়ারণ্য হচ্ছে হলিডে ও লোথিয়ান। হলিডে অভয়ারণ্যটি আয়তনে অতি ছোট—মাত্র ৩½ বর্গ কিলোমিটার। ডায়মণ্ডহারবার রেল স্টেশন থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ অভয়ারণ্যটিতে বাঘ, বন্যবরাহ, চিতল ও বিভিন্ন প্রকার জলজ ও অন্যান্য পাখির সমাবেশ লক্ষণীয়। লোথিয়ান অভয়ারণ্যটির আয়তন হচ্ছে প্রায় ৩৮ বর্গ কিলোমিটার।

বিচিত্র ধরণের বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল এ পশ্চিমবঙ্গ। পাহাড়-তরাইয়ের বনভূমি, সুন্দরবনের নোনাজল ভেজা বনভূমি এবং রুক্ষ রাঙামাটি—এই পরিবেশে বসবাসে অভ্যস্ত বিচিত্র বন্য পশুপাখির সমন্বয় এখানে।"

[সাত]

ব্যাঘ্র অভয়ারণ্য*

কল্যাণ চক্রবর্তী

"চোদ্দটি অভয়ারণ্য, সুন্দরবন ও বাকসা ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যসহ, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বনভূমির আয়তনের শতকরা প্রায় ৩৪ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। বন্যপ্রাণীর জন্য সংরক্ষিত অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৪০৪৮ বর্গ কিলোমিটার।"

রাজ্য ভিত্তিক ব্যাঘ্র-অভয়ারণ্য ও তাদের বনাঞ্চলের পরিমাণ

ব্যাঘ্র-অভয়ারণ্য	মোট বনাঞ্চলের পরিমাণ (বর্গ কি.মি.)	কোর অঞ্চল (বর্গ কি.মি.)	বাফার অঞ্চল (বর্গ কি.মি.)	বাঘের সংখ্যা (১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল)
১। মানস (আসাম)	২৮৪০	৩৬০	২৪৮০	৬৯
২। পালামৌ (বিহার)	৯৩০	২০০	৭৩০	৩৩
৩। সিমলিপাল (উড়িষ্যা)	২৭৫০	৩০০	২৪৫০	৬৫
৪। করবেট (উত্তরপ্রদেশ)	৫২০	৩২০	২০০	৮৪
৫। রণথম্বোর (রাজস্থান)	৩৯২	১৬৭	২২৫	২৫
৬। কান্‌হা (মধ্যপ্রদেশ)	১৯৪৫	৯৪০	১০০৫	৭১
৭। মেলঘাট (মহারাষ্ট্র)	১৫৭১	৩১১	১২৬০	৬৩
৮। বন্দীপুর (কর্ণাটক)	৬৯০	৩৩৫	৩৫৫	৩৬
৯। সুন্দরবন (পঃ বঃ)	২৫৮৫	১৩৩০	১২৫৫	২০৫
১০। পেরিয়ার (কেরল)	৭৭৭	৩৫০	৪২৭	৩৪
১১। মরিস্‌কা (রাজস্থান)	৮০০	৩৫০	৪৫০	১৯
মোট	= ১৫,৮০০	৪,৯৬৩	১০,৬৩৭	৭০৪

"এ ছাড়া আরও চারটি ব্যাঘ্র-অভয়ারণ্য ১৯৭৯ সালের পর স্থাপিত হয়েছে। এগুলি হল—(১) নাগার্জুন (অন্ধ্রপ্রদেশ), (২) ইন্দ্রাবতী (মধ্যপ্রদেশ), (৩) বাক্‌সা (পশ্চিমবঙ্গ), (৪) নামধাপা (অরুণাচল প্রদেশ)।"

* [রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১০ নভেম্বর, ১৯৮৫): প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সঙ্কলিত।]

সংযোজন [রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৮৫] :

ব্যাঘ্র-অভয়ারণ্য—আমার লিখিত প্রবন্ধ "ব্যাঘ্র অভয়ারণ্য" সম্পর্কে শ্রীসম্বুদ্ধ ভট্টাচার্যের রবিবাসরীয়তে ১ ডিসেম্বর প্রকাশিত চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

পত্র লেখক ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বাঘের সংখ্যাহ্রাসের কারণগুলো জানতে চেয়েছেন। প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক। বাঘের সংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসার, বাঘের স্বাভাবিক বিচরণ ভূমির সঙ্কোচন অর্থাৎ বনের আয়তন ও ঘনত্ব হ্রাস, বাঘের স্বাভাবিক শিকার-প্রাণীর অভাব ও সঙ্কোচন ও ব্যাঘ্র হত্যা। উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল নিয়ে গঠিত যে ইকো-সিস্টেম, তার শীর্ষ বিন্দুতেই রয়েছে বাঘের উপস্থিতি। তাই বাঘ যে সকল প্রাণীর উপরে নির্ভরশীল তাদের সংখ্যা হ্রাস জনিত ঘটনা বাঘের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করতে বাধ্য করে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য এর ফলে বিঘ্নিত হয়। বাঘের স্বাভাবিক শিকার-প্রাণী যথা বন্যবরাহ, চিতল হরিণ প্রভৃতি, আবার উদ্ভিদগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল। তাই বনের আয়তন ও ঘনত্ব হ্রাস বাঘের সংখ্যা হ্রাসের পরোক্ষ কারণ। খাদ্য ও খাদকের মধ্যে পরিমিত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যার অভাবও প্রাকৃতিক ভারসাম্যে তারতম্য ঘটাতে সাহায্য করে। বহু বনে বাঘ ছাড়াও অন্যান্য শিকারী বা খাদক প্রাণীর অবস্থিতি রয়েছে, যথা—লেপার্ড, চিতা, বন্য কুকুর প্রভৃতি। খাদ্যের প্রতিযোগিতা যে সমস্ত বনে প্রবলভাবে খাদক প্রাণীকুলের মধ্যেও রয়েছে। তাই খাদক-খাদ্য প্রাণীর প্রয়োজনীয় সংখ্যার অভাব প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিজনিত ঘটনা ঘটাতে সাহায্য করে, যার প্রভাব সমস্ত প্রাণীকুলের উপরেই বর্তায়। আর একটা কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ্য যে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষক আইন, ১৯৭২-এর পূর্বে বহু বনেই ব্যাঘ্র শিকার স্বীকৃত ছিল, যার ফলে বহু শিকারী গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল, যার ফল বাঘের সংখ্যা হ্রাসের মধ্যে প্রতিফলিত। এছাড়া বাঘের মানুষ খেকো প্রবৃত্তি বাঘ-মানুষ সম্পর্কে চিড় ধরিয়েছে, এবং এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হচ্ছে ব্যাঘ্রনিধন। তবে এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাঘ যে তার স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রেখেছে তার কারণ এ প্রাণীটির জটিল ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার অবিশ্বাস্যরকম ক্ষমতা।

[আট]

Pesticides and the reproduction of birds*

David B. Peakall

"The birds of prey are particularly vulnerable to the effeets of a persistent pesticide such as DDT because they are the top of a food chain. As George M. Woodwell of the Brookhaven National Laboratory has shown, DDT accumulates to an increasingly high concentration in passing up a chain from predator to predator, and at the top of the chain it may be concentrated a thousandfold or more over the content in the original source. The predatory birds, as carnivores, feed on birds that have fed in turn on insects and plants. Hence the birds of prey accumalate a higher dose of the persistent pesticides and are more likely to suffer the toxic effects than other birds.

The idea that the predatory birds decline is due to an internal toxic effect, rather than to a change in their behaviour or their habitat, has been verified by many experiments."

"Experiments were started in several laboratories. At the Patuxent Wildlife Research centre, Richard D. Porter and Stanley N. Winreger, working with kestrels, found that a mixture of DDT and dieldrin in doses measured in a few parts per million brought about a significant decrease in the shell thickness of the bird's eggs. Robert G. Heath of the Patuxent centre tested the effects of DDE, the principal metabolic product of DDT, on mallard ducks. DDE is now a ubiquitous feature of the earth's environment; it is estimated that there are a billion pounds of the substance in the world ecosystem, and traces of it have been found in animals every where, from polar bears in the Arctic to seals in the Antarctic.

Heath found that DDE caused the failure of mallard eggs in two ways: by increasing the fragility of the eggs, leading to increased breakage soon after laying, and by the death of the embryos in intact eggs toward the end of the period of in-

---

* [*Scientific American*—April, 1970 Vol. 222, No. 4, pp. 72-78 (Off-print 1174)]



প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণ —মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ